ভারতকন্যা কেরালা

সুদীন চট্টোপাধ্যায়

জ্ঞানতীর্থ :: প্রকাশক
:: ১নং [illegible] সরণী, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ : রথযাত্রা ১৩৫৭

প্রকাশিকা : ববিতা দাশ, দাশনগর, হাওড়া।

মুদ্রাকর : সুজিত কুমার রুদ্র, নিপুণ মুদ্রণ, ৩২ মদন মিত্র লেন, কলিকাতা-ছয়।

ছোট্ট বোন

নীলি কে

● পূর্বাভাষ ●

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানের উপযোগী কিছু লেখার আগ্রহটা নিছকই আকস্মিক। সেই আকস্মিক ইচ্ছা পূরণের আংশিক প্রয়াস 'ভারতকন্যা কেরালা'। রচনাটিতে আপন দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী বিভিন্ন সম্ভাব্য জিজ্ঞাস্যের উত্তর দিতে সাধ্যানুসারী চেষ্টা করেছি। সাফল্য অসাফল্য নির্ধারিত হবে পাঠক পাঠিকাদের কেরল সম্পর্কে আরো বেশী জানবার আগ্রহ অনাগ্রহেব গভীরতা দ্বারা। আর এই রচনা যদি একজন পাঠক বা পাঠিকাকেও ঐতিহ্যসমৃদ্ধ ভারতের অন্যান্য প্রদেশ সম্পর্কে জ্ঞানলাভে আগ্রহী করে তুলতে সক্ষম হয় তবে বর্তমান লেখকের শ্রম সার্থক এবং প্রয়াস সাফল্যমণ্ডিত বলে বিবেচিত হবে।

অশোকের সময় কেরলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটে। তারও পরে সেখানে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রবেশ করে—কোন কোন ইতিহাসকার এই মতই ব্যক্ত করেছেন। কোনও পরস্পর বিরোধী মতের ধারকাছ দিয়েও যাতে না হাঁটতে হয় সেজন্য অলিখিত ইতিহাসের উপকরণ লোককথা, পৌরাণিক উপাখ্যান, বিভিন্ন ধর্মের বিকাশধারা প্রভৃতির সূত্র ধরে প্রাচীন কেরলের এক রেখাচিত্র আঁকবার চেষ্টা করেছি। এ সম্পর্কে সব ধরণের মতামত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে পরবর্তি সংস্করণে বিবেচিত হবে।

কেরলের ইতিহাসেব প্রামাণিক উপকরণ পাওয়া যায় বৌদ্ধযুগ এবং তৎপরবর্তি কালের। সুতরাং তৎপূর্ববর্তি আমলের কেরল সম্পর্কে জানতে হলে অনুসন্ধান করতে হবে তার ধর্ম, তার শিল্প, তার সংস্কৃতি, তার লোকগাথা উপকথা প্রভৃতির গভীরে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। কেরলের বৈষ্ণবধর্মের প্রাচীন রূপ, শৈব শাক্ত এবং তান্ত্রিক ধ্যান ধারণার মধ্যেই প্রাচীন কেরলের ইতিহাসের অনেকখানি আছে। তাকে খুঁজে বার করতে না পারা পর্যন্ত কেরল আত্মার স্পন্দন ও উন্মেষকে জানা সম্পূর্ণ হতে পারে না। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে ধারণা এবং বিশ্বাস গড়ে তোলা হয়েছে তারই পটভূমিতে দাঁড়িয়ে এই অনুসন্ধান চালাতে হবে বলেই সতর্ক থাকতে হবে আরো বেশী।

কেরল পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্মমত এবং সংস্কৃতিসমূহের সংগমস্থল যে, সংগমস্থল সর্বকালের সর্বপ্রকার প্রগতিশীল চিন্তাধারাসমূহের, তত্ত্বাবলীর।

প্রাচীন যুগ থেকেই কেরল পূর্ব এবং পশ্চিম দুনিয়ার মধ্যে সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক এবং বৌদ্ধিক মিলনভূমিরূপে চিহ্নিত। পাশ্চাত্যের তদানীন্তন সভ্যজাতি সমূহের বাণিজ্যপোতসমূহ দূর প্রাচ্য এবং মহাচীনের পথে কেরলে কদিন বিশ্রাম করে নিত। কেরলের বন্দরসমূহ সদাব্যস্ত থাকত পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির নাবিক এবং ব্যবসাদারদের কলকোলাহল আর কর্মব্যস্ততায়। কল্লোম (কুইলন), মুজিরিস প্রভৃতি বন্দরে রোম, পারস্য, চীন প্রভৃতি দেশের জাহাজ আসতো ব্যবসা করতে। উপরি লাভ ছিল পারস্পরিক ভাবের আদান প্রদান। কোল্লমের রাজদূত ছিলেন চীনের রাজদরবারে।

কেরলের নৈসর্গিক শোভা, অনায়াস জীবন যাপনের সুযোগ সুবিধা সর্বোপরি এখানকার মানুষের শান্তিপ্রিয়তা বৈদিক ব্রাহ্মণদের এখানে উপনিবেশ স্থাপনে আনুকূল্য প্রদান করেছিল। আর্যাবর্তে ক্ষত্রিয় প্রাধান্যের উদ্ভবে হৃতগৌরব ব্রাহ্মণরা আরো কিছুদিন নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখার মত একটু ঠাঁই খুঁজে পেয়েছিল। শ্রীরামচন্দ্র এখানেই পম্পাসরের নিকটে কেরলের প্রাচীন সংস্কৃতির ইমারতে আর্যসংস্কৃতির বিজয় নিশান উড়িয়েছিলেন।

বৃটিশ আমলে কেরলের বৃহত্তর অংশ সামন্ত রাজাদের অধিকারে থাকায় শিল্পের ক্ষেত্রে সেখানে বিশেষ কোনও উন্নতিই হয় নি। বৃটিশের উত্তরাধিকারীদের আমলেও সেই একই ট্রাডিশন চলেছে। আজও জমিই সেখানে মূল সম্পদ উৎপাদন মাধ্যম। ফলে ভূমিহীন কৃষক, ভাগচাষী, ঠিকা শ্রমিক, কৃষিশ্রমিক প্রভৃতির সমস্যাই সেখানকার রাজনীতির আকাশকে প্রদীপ্ত এবং ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ করে রেখেছে। আজকের কেরলকে জানতে হলে কেরলের এই সব বাগিচা শ্রমিক, ক্ষেতমজুর, ভাগচাষী, মৎস্যজীবি প্রভৃতিদের জীবন ও জীবিকার সমস্যাকে জানতে হবে। বুঝতে হবে তাদের সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টায় সংগ্রামের ধারাবাহিকতাকে।

স্বাধীনতোত্তর ভারতের রাজ্য পুনর্গঠনের প্রাক্কালেই কেরল যে প্রচণ্ড ঝাঁকুনী দিয়ে চলতে সুরু করেছে তার সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে যাওয়ার জন্যই আ য কেরলকে বেশী করে জানা প্রত্যেকটি ভারতীয়ের জাতীয় কর্তব্য হওয়া উচিত। বাংলার আরো বেশী করে জানা দরকার তার সহযাত্রীকে।

এই রচনায় যে সব গ্রন্থকারের গবেষণালব্ধ জ্ঞানের সাহায্য নিয়েছি তাঁদের জানাই শ্রদ্ধা। কৃতজ্ঞতা জানাই বন্ধুদ্বয়—শ্রীউণ্ণি এবং শ্রীসুব্রহ্মণীয়মকে বহু মূল্যবান তথ্য এবং পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করার জন্য।

আমার মালয়ালম ভাষাশিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ের গুরুবাহিনী শ্রীমান কে. কে. চন্দ্রশেখরণ, শ্রীমান জয়ানন্দন নায়ার, শ্রীমান কৃষ্ণণ কুট্টি, কুমারী কে. কে. সরস্বতী, কুমারী লীলামণি, কুমারী শান্তা প্রভৃতি মালয়ালী ছাত্র-ছাত্রীদের জানাই সশ্রদ্ধ আশীর্বাদ। এদের সংস্পর্শে না এলে হয়ত কোন দিনই এই রচনা লেখার অনুপ্রেরণা লাভ করতাম না বা সম্ভব হত না।

জ্ঞানতীর্থের কর্ণধার বন্ধুবর কানাইলাল দাশ পুস্তকটি প্রকাশ করার দায়িত্ব নিয়ে আমাকে বাধিত করেছেন।

পুস্তকের নামকরণ করেছেন বন্ধুবর অজিত কুমার বসুমল্লিক। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁকে ছোট করব না।

সুদীন চট্টোপাধ্যায়

॥ ডিগলীপুর ॥

॥ উত্তর আন্দামান ॥

ভারতের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তের ছোট্ট প্রদেশটির নাম কেরল। আকারে ছোট হলেও, বয়সে তরুণ হলেও, আপন মহিমায় ভাস্বর, বৈশিষ্ট্যে দীপ্ত। জীবন অনুসন্ধিৎসার ক্ষেত্রে কেরল চিরকালই বিপ্লব-পথের পথিক। কেরল ভারতরূপী প্রদীপের প্রদীপ্ত শিখা।

তিনটি সাগরের মহামিলনবিন্দু থেকে উঠেছে প্রকৃত কেরলভূমি। মাথা তুলেছে কেরলের নারিকেল বীথি, এলাচকুঞ্জ, দারুচিনি বাগিচা। সুপারী বনে আধোআলো আধোছায়ার লুকোচুরী, আম কাঁঠালের শাখায় পাতায়, গ্রাম পথের বাঁকে বাঁকে অস্তগামী সূর্যের সান্ধ্য অভিসার। প্রকৃতির ছন্দোবদ্ধ লীলাসুষমা লাস্যময়ীর দেহহিল্লোলে। সিঁথিমৌর পর্বতশ্রেণী, বিস্রস্ত অঞ্চল শস্যশ্যামল উপত্যকা, সাগরবেলায় নূপুর নিক্কণ। কণ্ঠে স্রোতস্বিনীর কুলু কুলু তান। ঝর্ণার দেহভঙ্গে কংকণকিংকিণী।

ভারতের দক্ষিণ পশ্চিম তটরেখা কেরলের অস্তাচল সীমা। শিথিল হরিতবাস যেখানে কুটিল রেখায় পদপ্রান্তে এসে লুটিয়ে পড়েছে সেখানেই চলেছে সাগরের আরতিনৃত্য। নৃত্যচটুল তরঙ্গমালার শ্রমশ্বাসভরা হাসি খলখলিয়ে ওঠে তার বনে বনান্তরে। কোথাও স্থিরগম্ভীর গগনচুম্বী পর্বতশ্রেণী, কোথাও 'ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায় চখাচখীর মেলা'। আবার এখানে ওখানে বয়ে চলেছে কেরলের ধমণী নদীগুলি পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙ্গিয়ে, দুপাশের সমতলে উপত্যকায় গান এবং প্রাণ ছড়িয়ে।

পৃথিবীর রূপে নিত্যনূতন পালাবদল। সে পালাবদলের বিচিত্ররূপ কেরলের ইতিহাসে, সমাজ জীবনের বিবর্তনে বিধৃত। বাংলার সারি, জারী, যাত্রা, পালাকীর্তনের মত কেরলের পল্লীতে, প্রান্তরে, নদীতে, রাতের বাতাসে পট্টুকল, কথাকল্লি, থুল্ললের সুরসুরভি। বাংলার

অন্তরের সুর যদি ভাটিয়ালী, কেরলের তবে বঞ্চিপাট্টু (বঞ্চি = নৌকা। পাট্টু = কবিতা = গান)। বাংলার মত কেরলও নদীমেখলা। বাংলার মত কেরলের জন-জীবনও নদীর তালে সুরে বাঁধা। জীবন সেখানেও বঙ্কিম রেখা সুষমায় বাঙ্ময়। নদী সেখানে পূজ্যা, প্রিয়া। মনের কথা উজাড় করে ঢেলে দেয় পল্লীকবি নদীস্রোতের কানে কানে। নদীর মাতন দেখে বাংলার মত কেরলের মানুষও তাই ভয়ে কাঁপেনি। হাল ভেঙ্গেছে কতবার, পাল ছিঁড়েছে মাঝদরিয়ায় তবু দক্ষ নাবিক তরী তীরেই ভিড়িয়েছে। উত্তাল সাগর তরঙ্গে দোল খেতে খেতেই কেরলের প্রেমিক মাঝি গায়—

'সহেলী গো—তোর বিরহে ভোমরা হয়ে যাই উড়ে'—

আর প্রেমিকা কূলে দাঁড়িয়ে গায়—

'উত্তর সাগরে ঢেউ দেখে, মোর, প্রিয়তমে মনে পড়ে
প্রিয়তম বীর আমার—আমার প্রাণের প্রাণ।'

জীবনের পথযাত্রায় অক্লান্ত কেরল পেয়েছে মহাজীবনের সন্ধান!

সর্বকালের সর্বস্তরের প্রগতির জলসায় তার বিশিষ্ট আসন। ভারত আত্মার উন্মেষের প্রথম স্পন্দন বাংলার মত তারও বক্ষে ঝংকার তুলেছে।

যখনই সমাজ জীবনে ঘোলাটে আবর্তের সৃষ্টি হয় তখনই সেই আবর্তের মাঝে জন্ম নেয় নতুন শক্তি। যে নতুন শক্তি সংকীর্ণ কেন্দ্রের সর্বনাশা আকর্ষণ থেকে সমাজকে এক ঝটকায় বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে প্রশস্ত পথে, দূর প্রসারি লক্ষ্যমুখী পথে পরিচালিত করে। এই নতুন শক্তিই বিপ্লব। এই নতুন শক্তিই কালানুগ প্রগতির দর্শন, প্রকৃত প্রজ্ঞা। যুগে যুগে তাই দেখি কেরলেও মহাপুরুষদের আবির্ভাব। জীর্ণ পুরাতনকে উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়ে গণমানষের অপ্রকাশিত কামনাকে রূপ দিতেই তাঁদের প্রতিভা নিয়োজিত।

বাংলা তন্ত্রের প্রসূতি আগার। কেরলেরও আছে নিজস্ব তান্ত্রিক সাধনা—শক্তি উপাসনা। মাতৃপ্রাধান্যের ফলশ্রুতি। মাতৃমন্ত্রের

উদ্গাতা বাংলা, উদ্গাতা কেরল। কৃষ্ণপ্রেমের বন্যায় বাংলা, কেরল দু-অঞ্চলই ডুবুডুবু হয়েছিল। বাংলার কবি জয়দেবের 'মঞ্জুতর কুঞ্জতল' গানে কেরলের কথাকল্লির অবকাশ রঞ্জনের (মেলাপ্পাদম বা মঞ্জুতর) ব্যবস্থা।

স্বাধীন চিন্তার ধারক বাহক এবং উদ্গাতা বাঙ্গালী মালয়ালী উভয় জাতিই। স্বাধীনচেতা উভয়েই। রক্তে এদের স্বাতন্ত্র্যের উষ্ণতা, বক্ষে প্রেম, জীবন জিজ্ঞাসা এবং অমিত সাহস। হৃদয় এদের শিল্পসংস্কৃতির অভিব্যক্তি। কাব্য এদের প্রাণস্পন্দন, গান সেই প্রাণের উল্লাস। প্রগতি এদের নিত্যকার ঊষাবন্দনা, রক্তের ঝংকার।

প্রাকৃতিক নিয়মে, প্রকৃতির উদার দাক্ষিণ্যে পুষ্ট পৃথিবীর যে কোনও প্রাচীন জাতি সম্পর্কে যে কথা খাটে কেরল যেন তারই পুরোধা। গ্রহণ বর্জনের পরিমিতিবোধে উজ্জ্বল তার ইতিহাস, তার ধর্ম, তার শিল্প তার সাহিত্য, তার সংস্কৃতি এবং তার জীবন ও জীবনবোধ।

কেরল যে ঠিক কতদিনকার সভ্য জনপদ তার কোনও ইতিহাস নেই। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উপকরণ সাহায্যে তার ইতিহাসের যে কাঠামোটা তৈরী করার চেষ্টা চলেছে তা থেকেই উপলব্ধি করা যায় তার বৈচিত্র্য এবং মুগ্ধকারিতা। এমন বৈচিত্র্য নেই ভারতের আর অন্য কোন অঞ্চলের ইতিহাসে। এক্ষেত্রে কেরল দোসরহীন, একক।

প্রাচীন কাল থেকেই বিভিন্ন সংস্কৃতির লীলাভূমি কেরল। কে জানে কোন্ সুদূর অতীতের কোন বিশেষ দিনটি থেকে সাগরপারের চিন্তা, দর্শন সংস্কৃতি ও অর্থনীতির সঙ্গে তার আদান-প্রদান সুরু হয়েছিল। কেরলের জীবন সৃষ্টির প্রথমদিন থেকেই যেন পরিণত এবং গতিশীল। বদ্ধজলার অস্বাস্থ্য তার সভ্যতা, তার সংস্কৃতিকে কোনদিন বেশীক্ষণ আবিল করে রাখতে পারে নি। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে পরাধীনতার নিগড় যেমন কোনদিনই তার হাতে পায়ে চেপে বসতে পারেনি তেমনই পারে নি তার স্বাধীন স্বত্বা এবং চিন্তাধারার বুকে পাথর চাপা দিতে। তার জীবনের বীজমন্ত্র সেকাল একাল সর্বকালেই—চরৈবেতি চরৈবেতি।

চলার পথের বাঁকে বাঁকে দুর্মদ গতি তাকে ঘূর্ণিতে টেনে ফেলেছে তবে কোনও ঘোলার সৃষ্টি করে নি। খলখল হাসিতে ঘূর্ণির বজ্রআলিঙ্গন চুরমার করে সে এগিয়ে গেছে সুমুখপানে, এগিয়ে চলে সুমুঁখপানে। পথের সাথেই তার প্রণয়বিহার। কানে কানে পথেরই প্রেমগুঞ্জন তাকে তেপান্তরের সান্ধাকুঞ্জের সন্ধান বলে দেয়। নিত্যনূতন বাঁকে নতুন বেগে, নতুন রূপে নতুন দিগন্তের দিকে হাসির উল্লাস ছড়িয়ে এগিয়ে চলেছে কেরল। এ চলার তার শেষ নেই।

কেরলের মাটিতে ঘটেছে কত বিভিন্ন জাতির আবির্ভাব। মিশে গেছে তারা মহাসমুদ্রে। কত ধর্ম এসেছে, হয়েছে কেরলের আপনধর্ম। এসেছে এবং জন্ম নিয়েছে কত দর্শন আর তাদের প্রত্যেকটির কত রকমের ভাষ্য—সব হয়ে গেছে কেরলের জীবন-দর্শনে লীন। হিন্দু বৌদ্ধ জৈন ইসলাম খৃষ্ট—সব ধর্ম ই কেরলের আপন ধর্ম। প্রাক-বৈদিক যুগ থেকে আজকের মার্ক্সীস যুগ পর্যন্ত কেরলে বিশ্বের প্রায় সব দর্শনেরই পূর্ণ বিকাশ। নিখিল ভারতের চেয়ে আগে থেকেই কেরল নিখিল বিশ্বের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ, একাত্ম।

শুনতে আশ্চর্য লাগলেও ভারতের অন্যান্য প্রান্ত ইসলামের অস্তিত্বের খবরও যখন জানত না তখন কেরলেরই এক সামন্ত রাজার কাছে পোঁছে গিছল হজরত মুহম্মদের পবিত্র ধর্মের আহ্বান। সাগর ডিঙ্গিয়ে তিনি ছুটেছিলেন মক্কাতীর্থে এবং ইসলাম ধর্মকে বরণ করেছিলেন। অমোঘ মৃত্যু তাঁকে দেশে ফিরে আসতে দেয় নি। তবু মৃত্যুর পূর্বক্ষণে তিনি তাঁর উত্তরাধিকারীদের উদ্দেশে আবেদন করেছিলেন তাঁর রাজ্যে এই নবধর্ম প্রচারের সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা করে দেবার জন্য, সর্বতোভাবে এই নবীন ধর্মের শাশ্বত মঙ্গল উদ্দেশ্যে সাহায্য করার জন্য। রাজার ধর্ম তাই প্রজাদের কাছেও বরণীয় হয়ে উঠেছিল, বঞ্চিত হয় নি সম্মানের আসন লাভে। যাঁরা বলেন যে ভারতে ইসলাম এসেছিল আরবী ঘোড়ায় চেপে মুক্ত তরবারি হস্তে তাঁরা বোধ হয় ভুলে যান যে, ইসলাম ধর্মাবলম্বীর রাজ্য জয়,

ইসলাম ধর্মের ভক্তহৃদয় জয়ের চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ নয়। দক্ষিণ ভারতও ভারতের মধ্যেই অবস্থিত। ভারতে ইসলাম ধর্মের প্রথম প্রবেশ কেরলের পথে। আর কেরলে ইসলাম ধর্ম রাজ্যবুভুক্ষুর বেশে প্রবেশ করেনি। প্রবেশ করেছিল সম্মানিত উপাস্যের সৌম্যরূপে। তাই বোধ হয় মুসলিম লীগ এবং তার দ্বিজাতি তত্ত্বের বিষাক্ত নখরের আঘাতের আগে কোনদিনই কেরলের হিন্দু মুসলিম সাধারণ মানুষের সম্প্রীতির বাঁধন শিথিল হয় নি।

খৃষ্টধর্মের কেরল প্রবেশ আরো আশ্চর্যজনক, আরো বিচিত্র। খৃষ্টীয় প্রথম শতকেই খৃষ্টধর্মের মশাল কেরলে পৌঁছে গিছল। রোম এর পর আরো তিনশো বছর অপেক্ষা করেছিল খৃষ্টধর্মকে স্থায়ী আসন দিতে।

পৃথিবীতে যখনই কোন নতুন ধর্মের ধ্বনি উঠেছে কেরলের বাঁশীতে তার সাড়া পৌঁছে গেছে তখনই। প্রগতিশীল নূতনকে চিনে নিতে প্রগতিপথিক কেরলের কোন দিনই বিলম্ব হয় নি, দ্বিধা জাগে নি। বেদান্ত দর্শনের মহাপীঠ কেরলে তাই ইসলামের বিজয় বৈজয়ন্তী, খৃস্টধর্মের বিভিন্ন শাখার সপল্লব বিস্তার, বৈষ্ণব-শাক্ত-বৌদ্ধ-জৈন মতের মহামিলন। আবার সেই ক্ষেত্রেই হচ্ছে আজ মার্ক্সীয় দর্শনের সার্থক প্রযুক্তি।

কেরলের জাতীয় জীবন গঠনের ক্ষেত্রে, মন এবং মনকে স্বচ্ছ রাখার ক্ষেত্রে, সর্বমত এবং পথকে বিচারশুদ্ধ করে নেওয়ার ক্ষেত্রে বেদ-বেদান্তের পাশাপাশি ত্রিপিটক বাইবেল কোরাণ সমান ভাবেই উপকরণ জুগিয়েছে। ওনম্, খৃষ্টমাস, মহরমের পাশাপাশি তাই মে দিবসও জাতীয় উৎসব তালিকায় নিজের স্থান করে নিয়েছে।

পুরাণ বলে, ভৃগুতনয় পরশুরাম যখন বারবার পৃথিবী নিক্ষত্রিয় করে দাক্ষিণাত্যের পর্বতচূড়ায় উঠে রক্তাক্ত কুঠারখানি সাগরজলে নিক্ষেপ করলেন তখন সেখান থেকে ধীরে ধীরে মাথা তুলে জেগে উঠল হরিতবসনা সুন্দরী সাগরিকা কেরল। কণ্ঠে তার এলাচমালা,

কর্ণে লবঙ্গের ফুল, ওষ্ঠ রাঙ্গানো অরুণ প্রাতের তরুণ আলোক-নির্যাসে। মুগ্ধ হয়ে গেলেন ভৃগুনন্দন। এই-ই যেন তিনি চাইছিলেন। ঠিক এমনটিই যেন চাইছিলেন। ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রেখে বেদাভ্যাস যাগযজ্ঞ করার এমন স্থান সংগ্রহ করার জন্যই তিনি নিরলস কুঠার চালনা করেছিলেন। বার বার আর্যাবর্তের মাটিকে রক্তে কর্দমাক্ত করেছিলেন প্রকৃতির নিয়মকে বদলে দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টায়। অস্ত্রবলে ঘুরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন ইতিহাসের চাকাকে পিছন দিকে। আর তা না পেরে অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরই চোখের উপর আর্যাবর্তে ক্ষত্রিয়ের প্রভাব ব্রাহ্মণদের প্রতিপত্তিকে নস্যাৎ করে দিচ্ছিল। ক্ষত্রিয়রাই তখন সমাজের অগ্রগামী শক্তি। সুরু হয়ে গেছে ক্ষত্রিয় প্রাধান্য।

ক্ষত্রিয় শোণিতে বার বার স্নান করেও ব্রাহ্মণদের হৃত মর্যাদা এবং প্রাধান্য ফিরিয়ে আনতে না পেরে পরশুরামের মন হয়ে পড়েছিল বিকল। হতাশায় তিনি প্রায় ভেঙ্গে পড়েছিলেন। কুঠারখানি সাগর জলে বিসর্জন দিতেই চোখের সুমুখে দেখলেন সুন্দরী কেরলকে। আর্য সম্প্রসারণবাদীদের লুব্ধ হাতের স্পর্শ থেকে তাকে এতদিন আড়াল করে রেখেছিল সহ্যাদ্রি পর্বতমালা।

কেরল ভূমির সন্ধান পেয়েই ভার্গবের মনে জাগল নতুন চিন্তা। নতুন করে পর্য্যালোচনা করলেন তিনি অবস্থাটাকে। মনে মনে পরবর্তি কর্মপন্থারও একটা পরিকল্পনা তিনি করে ফেললেন।

আর অনুশোচনা নেই পরশুরামের। চরম ব্যর্থতার ভিতর দিয়েই তিনি পেয়ে গেছেন সাফল্যের সন্ধান। পেয়ে গেছেন ব্রাহ্মণদের সামাজিক মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে বেদচর্চার তপোবন; যেখানে তাঁরা সন্ধান করতে পারবেন নিশ্চিন্ত মনে অখণ্ড অবসরে পরব্রহ্মের অথচ থাকতে পারবেন রাষ্ট্রক্ষমতারও শীর্ষাসনে। এক হাতে অভিজ্ঞতালব্ধ তত্ত্ব অন্য হাতে সেই তত্ত্বে বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা উৎপাদনের জন্য খড়্গ—নিঃসন্দেহে ব্যবস্থাটা বেশ আটঘাট বাঁধা।

এই সদ্য আবিষ্কৃত এবং অধিকৃত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড পরশুরাম দান করলেন ব্রাহ্মণদের অর্থাৎ নাম্বুদিরীদের। ব্রাহ্মণ্য জঙ্গীবাদ ধ্বংসের মুখোমুখী পৌঁছে হঠাৎ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবার, টিকে যাবার অবলম্বন খুঁজে পেল। খুঁজে পেল পায়ের নীচে মাটি, যে মাটি এসে গেছে তার নিজেরই দখলে।

ইতিহাসের জ্ঞানতঃ ধারণা, কেরলে এটাই সর্বপ্রথম বিদেশী অনুপ্রবেশ।

কেরলের কিংবদন্তী বলে যে পরমবৈষ্ণব মহারাজ বলী বামনরূপী বিষ্ণুকে ত্রিপাদভূমি দানের সাক্ষাত ফলস্বরূপ রাজ্যচ্যুত হয়ে পাতালে গিয়ে ইষ্টদেবতার তপস্যায় মগ্ন হয়েছিলেন। কে জানে পাতাল এখানে অন্ধকারার প্রতীক কিনা! তপস্যা শব্দটি নির্জনে নির্বাসন বা বিনষ্টির ক্যামোফ্লেজ কিনা! আগ্রাসীর প্রচার যন্ত্র চিরকালই ধূর্ত আর সেজন্যই এমন আশংকা জাগা অস্বাভাবিক নয়।

কিংবদন্তীটির মতে কেরলের আদি রাজা বলী। রাজধানী ছিল তাঁর তুক্কাক্করা। তুক্কাকরা নামে একটি ছোট্ট গ্রাম আজো রয়েছে এর্ণাকুলমের কাছেই। তুক্কাক্করার বামন অবতারের মন্দিরটাই নাকি ভক্তের নিঃশঙ্ক দ্বিধাহীন মহাদান এবং ভগবানের (ছদ্মবেশী আর্য প্রতিনিধি?) কূট উদ্দেশ্য সিদ্ধকারী শঠতার স্মৃতিচিহ্ন বহন করে চলেছে! যদিও আজ বামন অবতারের এই মন্দিরটি হিন্দু মাত্রেরই তীর্থস্থান, কেরল তথা ভারতের সর্বশ্রেণীর ধর্মপ্রাণ হিন্দুর বহুযুগের পূজার উপচারে ধন্য তবুও এই মন্দির দ্বারে প্রবেশকালে মহারাজ বলীর কথা স্মরণ করে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস হয়ত পড়ে অনেকের। হয়ত কারো কারো মনে ক্ষণিকের ক্ষীণ চিন্তার রেখা পড়ে, আহা মহারাজ বলী যদি আর একটু বাস্তববোধ সম্পন্ন হতেন! তাহলে কেরলের ইতিহাস হয়ত অন্যরকম হত!

এবং সেই অন্যরকম হওয়ার জন্য আমরা পেতাম না কেরলের বাঞ্চকল্লি বা নৌ বিহারের মত বর্ণাঢ্য লোকক্রীড়া, ওনমের মত

গণউৎসব, শংকরাচার্যের মত দার্শনিক আর বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতসৃষ্ট ঐতিহ্যবাহী পরিচ্ছন্ন সংস্কৃতি।

ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্যকে নিরংকুশ করার সংগ্রামে ক্লান্ত ভার্গবের পরশু যখন এসে কেরলের বুকে শেষ আঘাত হেনে বিশ্রাম গ্রহণ করেছিল তখন থেকেই কেরলে নাম্বুদিরী ব্রাহ্মণদের প্রতাপ। তবুও নাম্বুদিরীরাই কেরল আত্মার উন্মেষের ধ্বজাবাহক।

বহুশ্রুত গল্পটি সবাই জানেন।

একবার বিন্ধ্য পর্বত সোজা আকাশ ফুঁড়ে মাথা খাড়া করে রুখে দাঁড়াল, চন্দ্র সূর্য বা অন্যান্য দেবতাদের রথ আর সে মাথার ওপর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যেতে দেবে না। সৃষ্টি বুঝি রসাতলে যায়! দেবতারা এসে বিন্ধ্যাচলকে প্রার্থনা জানাতেও সাহস করে না। তাছাড়া যে সহ্যাদ্রির সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে, যে স্বভাবশান্ত মৌনী ক্রোধে গর্জন করে উঠেছে তাকে শান্ত করাও অত সহজ নয়। বিন্ধ্যাচলের প্রতাপ বড় কম নয়। বলিষ্ট বাহুতে সে দাক্ষিণাত্যের দ্বার রক্ষা করছে। দাক্ষিণাত্যে তখন সারা আর্যাবর্ত থেকে ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের শিবির, উপনিবেশও হয়ত।

বিন্ধ্যাচলের মাথা হেঁট হবার নয়। মাথা হেঁট করবে সে কিসের গরজে?

দেবতারা গিয়ে ধরে পড়লেন মহর্ষি অগস্ত্যকে। পারলে একমাত্র অগস্ত্যই হয়ত পারেন শিষ্যকে শান্ত করতে, নিবৃত্ত করতে।

ভাবলেন অগস্ত্য।

সেদিনের উপস্থিত সংকটের পটভূমি বিচারে সমস্যা সমাধানের পথ সন্ধানে তাঁর চিন্তার ধারা প্রশস্ত পথটাই বেছে নিল। বিন্ধ্যাচল শিষ্য হলেও অনার্য। সুতরাং আর্য জাতির স্বার্থে বশংবদ এবং গুরুভক্ত শিষ্যের মাথাটা চিরকালের মত হেঁট করে দিয়ে তারই ওপর দিয়ে খড়ম খটখটিয়ে দাক্ষিণাত্যে অগস্ত্যযাত্রা করলেন তিনি।

নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচল দেবতারা, তাদের রথচক্র আবার সচল হল।

আর্য সভ্যতা এবং সংস্কৃতি দক্ষিণ ভারতে যায় উত্তর ভারত থেকেই। এবং তার প্রবেশও মোটেই বরণীয় মোহনরূপে নয়, স্বাধীনতা প্রেমিকদের রক্তে কলুষিত বিজয়ী পরশু হস্তে।

উত্তর আর দক্ষিণ ভারতের সীমানা প্রাচীর বিন্ধ্যাচল। বিন্ধ্যাচলের পার্বত্য প্রদেশে তৎকালে কোন শক্তিশালী অনার্য জাতির রাজত্ব ছিল হয়ত। আর সেই রাজকুল ছিল অগস্ত্যের শিষ্য-বংশ। অগস্ত্য মহাজ্ঞানী বহুবিদ্যায় পারদর্শী গুরু হলেও ছিলেন মূলতঃ বহিরাগত বিজয়ী আর্যদেরই প্রতিভূ—সম্প্রসারণ বাদী।

সারা উত্তর-ভারত জয়ের উল্লাসে মত্ত, বিজয়ীর দম্ভে স্ফীত দেবতাদের (আর্যদের) কোন বেলেল্লাপনায় বিরক্ত এবং ক্রুদ্ধ হয়ে উত্তর-দক্ষিণ পথের মাঝখানে বিন্ধ্যাচল গড়খাই কেটেছিলেন তার খোঁজে আজ আর বিশেষ কোনও প্রয়োজন নেই। যেটুকু সত্য তা ঐ গল্পেই বিবৃত। দক্ষিণভারতের যাতায়াতের পথ ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা রদ করতে বল অসহায় হয়ে পড়ায় হীন ছলের আশ্রয় নিতে হয়েছিল দেবতাদের! অগস্ত্য (বা অগস্ত্য বংশের কোন একজন) আর্যদের জন্য দক্ষিণ-ভারতের রুদ্ধ দ্বার উম্মুক্ত করেছিলেন। এই অগস্ত্যমুনি (অগস্ত্য বংশ বা অগস্ত্য পদাসীন একাধিক ব্যক্তি) ছিলেন মহাপণ্ডিত, সুনিপুণ যোদ্ধা, ভ্রমণকারী, আবিষ্কারক এবং এ্যাড্‌ভেনচারপ্রিয়।

কালকেয় নামে দৈত্য বাস করে সাগরে। বলা নেই কওয়া নেই দেবতাদের যজ্ঞভাগে ভাগ বসানো বা যজ্ঞ পণ্ড করে তাদের জীবন পর্যন্ত বিপর্যস্ত করাই যেন কাজ তার। তাকে দমন করেন অগস্ত্য।

যে কেরলের সঙ্গে সিন্ধু-সভ্যতার সমসাময়িক কাল থেকে—যদি তারও আগে থেকেই না হয়—বহির্বিশ্বের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল সেখানকার নাবিক এবং নৌ-সৈন্যের নৌ-চালনা এবং নৌযুদ্ধের নৈপুণ্যের সাহায্য নিয়েই হয়ত অগস্ত্য সমুদ্র 'শোষণ' এবং কালকেয় দৈত্যকে পরাভূত করেছিলেন। বিচিত্র নয় মোটেই বরং এটাই হয়ত ঘটেছিল।

কারণ ইন্দোনেশিয়ায় অগস্ত্যমুনির বহু প্রতিমূর্তি পাওয়া গেছে। জাভা সুমাত্রা বোর্ণিও শ্যাম ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশে আর্য সংস্কৃতি যে মুজিরিস বন্দরের ভিতর দিয়ে যায়নি একথা বলতে পারার মত প্রমাণ এখনো পর্যন্ত আজকের পণ্ডিতদের হাতে আসেনি। সমুদ্র-বাণিজ্যে বাংলার তাম্রলিপ্ত আর কেরলের মুজিরিস বন্দরই সম্ভবত প্রাচীনতম ভারতীয় বন্দর।

পরশুরাম যে দেশ আবিষ্কার করেন এবং চৌষট্টিটি গ্রাম পত্তন করে যেখানে বৈদিক ব্রাহ্মণদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন সেই কেরলে এবং তার পার্শ্ববর্তি তামিলভূমি (মাদ্রাজ) এবং কন্নড় প্রভৃতি দেশে অগস্ত্য নিয়ে গিয়েছিলেন আর্য সংস্কৃতির মিশন। তামিল ভাষার প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন অগস্ত্য। তাঁর পত্নী লোপমুদ্রাকে তিনি হারিয়েছিলেন কাবেরী নদী আবিষ্কার করার সময়ে।

তারও অনেক পরে হয়ত এসেছিলেন বামন অবতার। নাম্বুদিরী ব্রাহ্মণদের রাজ্যকে নিরংকুশ করতে এবং তার সীমানা বৃদ্ধি করতে তিনি যে কূটনৈতিক চালটি চেলেছিলেন তার ঠ্যালা এখনো পরমবৈষ্ণব বলীরাজার বংশধররা সামলে উঠতে পারেন নি!

ইতিহাসের সাক্ষ্যকে গায়ের জোরে অস্বীকার না করলে বলতেই হবে যে ভারতে আগ্রাসীদের টেকনিকে কোনও পরিবর্তন হয়নি, প্রাগৈতিহাসিক যুগের পর থেকে আজকের ডলারের যুগ পর্যন্ত। একই কূটকৌশল, একই নীচতা এবং একই জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতায় কলংকিত পদ্ধতি।

সুশাসক, ধর্মপ্রাণ, প্রজাবৎসল বলীরাজার পর কেরলে নাম্বুদিরীদের সার্বভৌম রাজত্বকাল। বেদ-এর পোঁটলার মধ্য থেকে চকচকে খড়্গ পরশু এবং সেবক দাস নায়ারদের মধ্য থেকে সেই খড়্গ চালনায় দক্ষ সৈনিক বেরিয়ে আসতে বিলম্ব হয়নি।

নাম্বুদিরী আর্যরা পরশুরাম মারফত কেরলের অধিকার লাভ করে যখন সেখানে পাকাপাকিভাবে বসবাস করবার জন্য এসে উপস্থিত হয়

তখন তাদের সঙ্গে ছিল বেশ কিছু সংখ্যক সেবাদাস (শূদ্র)। এই শূদ্ররাই পরবর্তিকালে কেরলের সবকিছুরই পাইওনিয়র—নায়ারজাতি। যেমন সেকালে তেমন ঠিক একালেও নায়ারদের বাদ দিয়ে কেরলকে ভাবাই যায় না।

কেরলকণ্ঠের নীলকান্তমণি নায়াররা।

কেরলের আগন্তুক সম্প্রদায়গুলির মধ্যে নাম্বুদিরী আর নায়াররাই সর্বপ্রাচীন বলে পণ্ডিতদের অভিমত। নাম্বুদিরীরা শুদ্ধ আর্যরক্তের উত্তরাধিকার। নায়াররা আর্য এবং অনার্যের মিশ্রিত রক্তে সৃষ্ট শূদ্র।

নাম্বুদিরীরা এসে যখন কেরলে জেঁকে বসল তখন কেরলের প্রকৃত মালিক চেরমর, পুলয়র প্রভৃতি জাতীরা হয়ে পড়ল তাদের দাস। নিজভূমে পরবাসী। নতুন প্রভুদের জবর দখল জমিতে চাষ আবাদ করা একদা আপন পশুগুলি ওদেরই নির্দেশে পালন রক্ষণ এবং প্রভুদের অন্যান্য হুকুম তামিল করাই হল তাদের একমাত্র উপজীবিকা। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে আপন ইচ্ছা অনিচ্ছারও সমাধি ঘটল। কারণ আর্যদের তদানীন্তন ধারণা অনুযায়ী আর্যেতরদের সৃষ্টি আর্যদের সেবায় জীবন উৎসর্গ করে ধন্য হওয়ার জন্যই। তাই আর্যরা দেবতা। আর্যতররা কখনো বানর, কখনো দানব কখনো রাক্ষস। নীল রক্তের শ্রেষ্ঠত্বের দর্শন। পরবর্তি যুগে এই সব বানর প্রভৃতিদের ল্যাজ গজিয়ে ছেড়েছেন বিজয়ী আর্যদের উগ্র পণ্ডিতেরা! উদ্দেশ্য স্পষ্ট। আবার আজকের যেসব দিগগজ পণ্ডিত সেই পুরানো ল্যাজ দিয়েই নিজেদের জ্ঞানের বহর মাপেন তাঁদের উদ্দেশ্যও মোটেই অস্পষ্ট নয়!

আজ আমাদের চিন্তায় রামভক্ত হনুমানের যে রূপটা ভেসে ওঠে তাতে বোধ হয় এই ল্যাজ ও পোড়া মুখটাই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কিন্তু কাথিয়াবাড় বা সুদামাপুরীর রাজারা দাবী করেন তাঁরা এই রামভক্তেরই বংশধর। তাঁরা একালের অভিজাত। সেদিন বিষ্ণুর অবতার শ্রীরামচন্দ্রের অন্যতম রণনায়করূপেও হনুমানের আভিজাত্য ছিল স্বীকৃত, অপরিহার্য!

নতুন সংস্কৃতি, নতুন সমাজ ব্যবস্থা, নতুন রীতিনীতি ও রাষ্ট্রপদ্ধতি কেরলের পুরানো মাটিতে শিকড় চালাতে শুরু করল আর্যদের অনুপ্রবেশের পর।

সুরু হল 'মণিপ্রবালম' এর জড়োয়া গহনার নতুন গঠনশৈলী।

কেরলে উপনিবেশ স্থাপনের সময় পরশুরাম কতকগুলি নিয়ম করে দিয়েছিলেন উপনিবেশটিকে স্থায়ী এবং সমৃদ্ধ করার জন্য। এই নিয়মগুলির অন্যতম হচ্ছে নাম্বুদিরী ব্রাহ্মণদের দেশের বাইরে যাওয়ার অধিকার লোপ। অবশ্য এই বহির্গমনের পথ সোজাসুজি বন্ধ করা হয়নি। নিয়ম করে দেওয়া হয়েছিল যে যদি কোনও নাম্বুদিরী কেরলের বাইরে যান তবে সেই বাইরের সমাজে তাঁকে দেখা হবে জাতিভ্রষ্ট ব্রাহ্মণের মত! ফলে কেরলের নাম্বুদিরীরা এই সেদিন পর্যন্তও আপন দেশ ও সমাজের গণ্ডীর বাইরে পা দিতে সাহস করেনি। দেশের সীমানার চৌহদ্দিতেই নাম্বুদিরী বংশের বৃদ্ধি হতে থাকে। অধিকৃত রাজ্য রক্ষার জন্য আপন সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজন সেদিন নিশ্চয়ই অপরিহার্য ছিল।

অবসর নাকি উচ্চচিন্তার সূতিকাগার। কথাটা আংশিক সত্য হলেও হতে পারে। বেকারের অবসর অখণ্ড। বর্তমান বিশ্বে বেকার বাহিনীরই তাহলে উচ্চচিন্তার রাজাসনে বসার কথা! কারণ তাদের সংখ্যাটা এতই স্থূল যে বিশ্বের অর্থনৈতিক ভারসাম্য অনেকদিন আগেই নষ্ট হয়ে গেছে।

পরশ্রমজীবিদের অবসর জীবনের বাস্তবক্ষেত্র থেকে অনেক ঊর্ধ্বে উঠে অর্কিডের মত ফুলের জন্ম দিয়েছে সত্য কিন্তু জীবনের গভীরে শিকড় চালিয়ে যে মধুমালতীর কুঞ্জ ফুলে ফুলে হেসে উঠেছে সেখানে খোঁজ নিলেই দেখা যাবে যে শিল্পীরা কোনমতেই পরশ্রমজীবি ছিলেন না। কারণ শিল্পী, দার্শনিক এবং কবি প্রভৃতির শ্রমও ক্ষেত্র বিশেষে শ্রমের সম্মান পেতে পারে। কথাটা যেমন আজকের দিনে তেমন সেই ঋগ্বেদের যুগেও খাটত। ঋগ্বেদের যে অংশে রয়েছে সামগ্রিকভাবে

সমাজ বা গোষ্ঠির কল্যাণ কামনা সেখানেই মন্ত্রের উদ্গাতা, কায়িকশ্রম না করলেও আপন শ্রমজীবি। আর যে অংশে 'আমরা' 'আমি'তে পর্যবসিত সেই অংশের রচনা কালে সমাজে একদল উদ্বৃত্ত এবং পরস্বভোজীর যে সৃষ্টি হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। 'আমি'র মঙ্গলচিন্তায় এবং উন্নতিকামনায় প্রকৃতি এবং দেবতাকে সন্তুষ্ট করতেই তারা ব্যস্ত। নিঃসন্দেহে স্রষ্টা এখানে পরশ্রমজীবি বা তাদের উমেদার।

নায়ার এবং স্থানীয় দাসদের উপর কায়িক শ্রমের সব দায়টুকু চাপিয়ে এবং তাদের সম্মিলিত শ্রমের ফলভোগ করার অবসরে নাম্বুদিরীরাও বেদাধ্যয়ন যাগযজ্ঞ প্রভৃতি নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। তবে স্বাধিকারের নিরাপত্তা এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণের হাত থেকে দেশরক্ষার ব্যাপারেও ছিল তাঁদের সজাগ এবং সতর্ক দৃষ্টি। নায়ারদের হাতেই সবভার ছেড়ে দিয়ে তাঁরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন নি। কারণ রক্ষকই যে শেষ পর্যন্ত ভক্ষক হয়ে উঠতে পারে এটুকু তাঁরা বেশ ভালভাবেই জানতেন। তাছাড়া রাষ্ট্রনীতিতে অন্ধবিশ্বাসের পরিণতি সম্বন্ধেও সম্যক জ্ঞান ছিল তাঁদের।

সৈন্যদলের উপর প্রভূত্ব এবং নেতৃত্ব করার জন্য কিছুসংখ্যক নাম্বুদিরী ব্রাহ্মণকে অনুমতি দেওয়া হল যুদ্ধবিদ্যা শেখবার এবং যুদ্ধকেই একমাত্র বৃত্তিরূপে গ্রহণ করার। ব্রাহ্মণের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বেদশিক্ষা, চতুরাশ্রম প্রথা সবই তাঁদের ক্ষেত্রে ছাড়পত্র পেল। তাঁদের জন্য নিত্য ত্রিসন্ধ্যা সন্ধ্যাহ্নিক করলেই মোক্ষলাভের ব্যবস্থা দেওয়া হল। এই যুদ্ধ ব্যবসায়ী নাম্বুদিরীরাই আজকের যাত্রানাম্বুদিরীদের পূর্বপুরুষ। যাত্রানাম্বুদিরীদের মধ্যে আয়ুধমেটুকল (অস্ত্রগ্রহণ) নামক এক অনুষ্ঠান এখনো তাঁদের প্রাচীন পেশাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। নতুন নাম্বুদিরী সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে বেদশিক্ষা আর আবশ্যিক রইল না তার বদলে আবশ্যিক হল রাজনীতি ও রণবিদ্যা শিক্ষা।

নাম্বুদিরী ব্রাহ্মণরা দেশরক্ষা এবং রাজ্যশাসনের ব্যাপারটাও ভালই বুঝতেন। রাজ্যরক্ষা এবং রাজ্যবৃদ্ধির ক্ষেত্রে কূটনৈতিক তৎপরতাও

বোধ হয় বেদের মতই প্রাচীনত্বের দাবীদার। মানুষ বুদ্ধি দ্বারা সমাজবদ্ধভাবে পরিচালিত হবার সমসাময়িক কাল থেকেই বলের পাশাপাশী ছল এবং কৌশলকে রণজয়ের কাজে লাগিয়ে আসছে। নিঃসন্দেহে যুদ্ধব্যাপারে সুঅভিজ্ঞ আর্যরা এর ব্যত্যয় ছিলেন না।

গোকর্ণ থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত এবং পশ্চিম ঘাটের পাদদেশ থেকে আরব সাগরের তটরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত কেরল ভূমিতে নাম্বুদিরীরা বাস সুরু করেন চৌষট্টিটি গ্রামে বিভক্ত হয়ে। এই চৌষট্টিটি গ্রামের নির্বাচকরা একযোগে প্রতি বারো বছর অন্তর একজন নেতা নির্বাচিত করতেন সমগ্র দেশ শাসন এবং রাজকার্য পরিচালনা করার জন্য। এই নেতাকে বলা হত রক্ষাপুরুষ। প্রতি রক্ষাপুরুষের রাজত্বকাল নির্ধারিত ছিল দ্বাদশ বৎসর। তারপর আবার নতুন নেতা নির্বাচন।

রক্ষাপুরুষের সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচিত হতেন চারজন তল্লিয়াতিরী বা রাজপ্রতিনিধি। এঁরা রক্ষাপুরুষের অধীনে প্রাদেশিক শাসনকর্তা রূপে কাজ করতেন। চৌষট্টিটি গ্রামকে চারভাগ করে এক এক ভাগ দেওয়া হত এক একজন তল্লিয়াতিরীর শাসনাধীনে। তবে একথা মনে করবার কোনও কারণ নেই যে আর্যদের অধিকার মাত্র এই চৌষট্টিটি গ্রামে সীমাবদ্ধ ছিল। এই চৌষট্টিটি গ্রামের আর্য অধিবাসীরাই ছিল বাকী দেশটার মালিক। সুতরাং তাদেরই ভোটে নির্বাচিত হত সমগ্র দেশের রক্ষাপুরুষ।

কেরল ইতিহাসের প্রথম পরিচ্ছেদেই গণতন্ত্র। তৎকালীন ধ্যানধারণা এবং বিচারবুদ্ধি বিচারে এর চেয়ে ব্যাপক গণতন্ত্রের প্রত্যাশা করা যায় না। বিশেষ করে মানব সভ্যতার সূর্য আজ যখন নাকি মধ্যগগনে দীপ্ত তখন যদি মৌলিক গণতন্ত্র, দক্ষিণ ভিয়েতনামের গণতন্ত্র চলে, যদি পূর্ণবয়স্কের ভোটাধিকারের নামে গণতন্ত্রের ধর্ষণ চলে তবে সেদিনকার কেরলের শাসকশ্রেণীর প্রতিনিধি নির্বাচনকে অধিকতর প্রগতিসম্পন্ন গণতন্ত্র বলতে অসুবিধা বোধ

করার অর্থ সেদিনকার সভ্যতার স্তর এবং মর্মবাণীকেই উপলব্ধি করতে না পারা। হতে পারে নির্বাচনের ব্যাপারটায় একমাত্র শাসক-সম্প্রদায়ের মানুষই অংশ গ্রহণ করতে পারত কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় আজকের মহাশূন্য অভিযানের যুগেও ঐ একই ব্যবস্থা চলছে। অধীনদের সমানাধিকার দিতে সর্বকালের বিজয়ী শক্তিই বিমুখ তাই সারা পৃথিবী জুড়ে চলেছে সবরকমের অধীনতার বেড়াজাল ছিঁড়বার সংগ্রাম। সব মানুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রাম। সকলের সব রকম অধীনতার শৃংখল খানখান হয়ে পায়ের কাছে ধূলায় গড়াগড়ি না দেওয়া পর্যন্ত গণতন্ত্র একটি শব্দ মাত্র। এই একটি শব্দকে ব্যাখ্যা করতে নিত্যনূতন সূত্রের উদ্ভব হচ্ছে। কিন্তু গণতন্ত্রের প্রযুক্তির জন্য পৃথিবীর আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। মদটুকু যেমনটি ঠিক তেমনটি রেখে বোতলের গায়ের লেবেল পালটে দিলেই মদ গঙ্গাজল হয়ে যায় না। আসলে গঙ্গাজলটা কমণ্ডলুতে রাখলেই আর কোনও লেবেল আঁটার প্রয়োজন থাকে না।

নাম্বুদিরীরা সুঅভিজ্ঞ শাসক ছিলেন সত্যি তবু শেষরক্ষা হয় নি। ক্ষমতার লড়াই এর অন্তর্দ্বন্দ্ব সুরু হয়েছিল কালক্রমে। সুরু হয়েছিল বামনাই ঘোঁট এবং দল পাকানো। হয়ত রক্ষাপুরুষ নির্বাচনের ব্যালট পেপার (?) চুরী হওয়া বা জাল হওয়া সুরু হয়ে গিছল!

এই ক্ষমতালাভের দ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত এমনই এক পর্যায়ে এসে পৌছে গেল যে নাম্বুদিরী সমাজ ঠিক করল আর কোনও নাম্বুদিরী রক্ষাপুরুষ নয়। কেরলের সন্নিহিত দেশগুলির কোন একটি থেকে নিমন্ত্রণ করে আনা হোক কোনও ক্ষত্রিয় নায়ককে কেরলের জন-প্রতিনিধি (নাম্বুদিরীদের প্রতিনিধি) রূপে কেরল শাসন করার উদ্দেশ্যে। সেই ক্ষত্রিয় নায়কের হাতেই বারো বছরের জন্য রাজদণ্ড তুলে দেওয়া হোক।

এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পাশের তামিল দেশগুলি থেকে বারো বছর অন্তর পালা করে চোল, পাণ্ড্য, চের প্রভৃতি রাজাদের আমন্ত্রণ

করে আনা হত রাষ্ট্রকর্তৃত্বের সনদ দিয়ে। এই প্রতিভূ রাষ্ট্রপ্রধানদের বলা হত পেরুমল। দীর্ঘ দিনের রক্ষাপুরুষ ব্যবস্থার কাঠামোর ওপরই পেরুমলী শাসনব্যবস্থা রূপ পেল। সুরু হল পেরুমলদের রাজত্বকাল। পেরুমলদের শাসনকালের মেয়াদ হয়েছিল প্রায় সাড়ে পাঁচশো বছর—খৃঃ পূঃ ১১৬ অব্দ থেকে ৪২৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত।

প্রাচীন তামিল সাহিত্যে পেরুমলদের রাজধানীর উল্লেখ পাওয়া যায় বঞ্চি নামে। শহরটির বর্তমান নাম তিরুবঞ্চিকুলম। প্রাচীন নাম কোটুংগল্লুর। তিরুবঞ্চিকুলমে পেরুমলদের আমলে নির্মিত একটি শিবমন্দির এখনো দেখা যায়। এই মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাতা পেরুমল কুলশেখর। বৌদ্ধধর্মের বন্যা যখন দক্ষিণ ভারতের কেরল প্রদেশেও এসে আছড়ে পড়ে জীর্ণ পুরাতন যা কিছু সব ভাসিয়ে নিয়ে যেতে উদ্যত, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ভিত্তি উঠেছে টলে তখন পেরুমল কুলশেখর আপন কুলদেবতার এই মন্দিরটি নির্মাণ করালেন সেই বন্যাধারাকে প্রতিরোধ করতে। কুলশেখরের বংশধররূপে পরিচিত কোচিনের রাজবংশ আজও এই মন্দিরে অধিষ্ঠিত দেবতাকে আপন কুলদেবতা রূপে মান্য করেন। কুলদেবতার জন্য বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে বিশেষ পূজা অর্চনার ব্যবস্থা করা হয়। শেষ চেরমন পেরুমল ভাস্কর রবিবর্মা এবং তাঁর গুরু সুন্দরেশ্বরের প্রতিমূর্তি এখনো এই মন্দিরে সযত্নে রক্ষিত।

পেরুমলদের শাসনকালকে প্রাচীন কেরলের স্বর্ণযুগ বলে চিহ্নিত করা হয়। নাম্বুদিরীদের আপন সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচনে সমস্যার উদ্ভব হওয়ায় পাশের ক্ষত্রিয় রাজাদের মধ্য থেকে পর্যায়ক্রমে যোগ্যতম ব্যক্তিকে নির্বাচিত করে রাজকার্য পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং তদনুযায়ী কাজ করতে থাকে। এ ব্যবস্থা যে কতখানি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং বাস্তববোধের পরিচায়ক ছিল সেটা বুঝতে পারা যায় পরবর্তিকালের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই। পেরুমল নির্বাচনে নাম্বুদিরীরা কোনবারই যোগ্যব্যক্তি

নির্বাচিত করতে অপারগ হয় নি। যে কয়জন পেরুমল পদ অলংকৃত করেছেন তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেই ছিলেন পণ্ডিত, যোগ্য শাসক, কলা এবং সাহিত্যপ্রেমী। সুকুমারবৃত্তির সাথে সাথেই কেরলের বৈদেশিক বাণিজ্যও পেরুমলদের আমলেই প্রসারলাভ করে। চের, চোল, পাণ্ড্য প্রভৃতি রাজ্যগুলি নিঃসন্দেহে ছিল উন্নত এবং সমৃদ্ধ। তাদের বাণিজ্যতরীর মত কেরলের বাণিজ্যপোতও পেরুমলদের আমলেই সপ্তসাগর পাড়ি দিয়ে বেড়াতে থাকে সাগর ছেঁচা মুক্তা, গোলমরিচ এলাচ প্রভৃতি পণ্য ভরে নিয়ে।[১] জাভা বোর্ণিও সুমাত্রার ঘাটে, রোম মিশরের বন্দরে গিয়ে নোঙ্গর করত কেরলের বাণিজ্য বহর। দূর প্রাচ্যের বন্দরগামী জাহাজগুলো মাঝপথে বিশ্রাম করে নিত তদানীন্তন আন্তর্জাতিক প্রাকৃতিক পোতাশ্রয় নক্কাভরমে—আজকের নিকোবরে। জাহাজের পানীয়জলের পাত্র ভরা হত টাটকা জলে। সমুদ্র দেখতে দেখতে হাঁফিয়ে ওঠা নাবিকরা দুচোখ ভরে নিত সুপারী নারিকেল কুঞ্জের বৈকালী সৌন্দর্যে। পায়ের তলায় সবুজ ঘাস মুছে নিত প্রিয়বিচ্ছেদ ব্যথা। নক্কাভরম বা নিকোবর ছিল সেদিনকার দূর পাল্লার সমুদ্র যাত্রার বিশ্রামকুঞ্জ বা এ্যাংকরেজ। কত দেশের কত সপ্তডিঙ্গা মধুকর যে তার ঘাটে ভিড়েছে সে হিসাব পাওয়া যেতে পারে সেখানকার নারিকেল কুঞ্জের গভীর রাতের গুঞ্জরণে, তার উপকূলের শিলায় শিলায়, বেলাভূমির প্রতিটি বালুকণার বুকের নিভৃতে।

বিদেশের মানুষ কেরলের এলাচ লবঙ্গ কুঞ্জের সুরভিতে আকৃষ্ট হয়েছিল স্মরণাতীত কালেই। ফারাওদের শব মমী করার জন্য যে রাসায়নিক মিশ্রণ ব্যবহার করা হত তাতে দালচিনি প্রভৃতি মসলা

১ 'They carried on an extensive Commerce in pearls, pepper and spices, particularly with Egypt and Rome and took active part.......in the colonisation of regions like Java, Bali, Combodia, Cochin-China.—"*Prof, H. N. Mukerjee : India's struggle for freedom.*

ব্যবহারের নজির নাকি খুঁজে পাওয়া গেছে। সারা বিশ্বকে তখন একমাত্র কেরলই দিত লবঙ্গ, দালচিনি, এলাচ, গোলমরিচ প্রভৃতি মশলার জোগান। এইসব মশলার পিতৃভূমি কেরল।

খৃষ্টজন্মের আড়াই তিনহাজার বছর বা তারও আগে মেসোপোটেমিয়া, ব্যাবির্লন প্রভৃতি দেশের সঙ্গে কেরলের নিয়মিত সমুদ্র বাণিজ্যের সম্পর্ক থাকলেও খৃষ্ট বা ইহুদী ধর্মাবলম্বী জাতিরা কেরলের মনোহর ভূমিতে এসে পাকাপাকী বসবাস সুরু করে পেরুমলদের আমলেই। পেরুমলরা হিন্দু হলেও এই সব বিদেশোগত ঔপনিবেশিকদের সঙ্গে ব্যবহারে যে বন্ধুত্ব, মমত্ব এবং সৌহার্দের পরিচয় দেন, কেরলের উদারপ্রাণ সাধারণ মানুষ তাদের যে নিবিড় ভ্রাতৃপ্রেমের বন্ধনে বেঁধে ফেলে সে বন্ধন ছিন্ন করে তারা আপনদেশের অনিশ্চিত রাজনৈতিক তথা ধর্মীয় কুজ্ঝটিকার মধ্যে ফিরে যাবার কথা ভাবে নি। কেরলই হয়েছিল তাদের নতুন স্বদেশ। কেরলের জীবন যাপন প্রণালী, কেরলের ভাষা, কেরলের আহার বিহার সবই ক্রমে তাদের নিজস্ব হয়ে গেছে। তারাও হয়ে গেছে কেরলবাসী—মালয়ালী। অবশ্য এই সেদিন ইহুদীভূমি ইজরাইল লোকতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর কিছু ইহুদী চলে গেছে তাদের পিতৃপুরুষের জন্মভূমি ইজরাইলে।

ভাস্কর রবিবর্মাই হচ্ছেন শেষ পেরুমল। চেরবংশ থেকে এসেছিলেন তিনি। সেজন্য তাঁকে বলা হয় চেরমন পেরুমল। তাঁর বংশ তাই চেরমন পেরুমল নামে খ্যাত।

চেরমন পেরুমল ভাস্কর রবিবর্মাই ছিলেন পেরুমলদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। প্রথমে তিনি কেরলে পেরুমল পদ গ্রহণ করে আসেন অন্যান্য পেরুমলদের মতই বারো বছরের মেয়াদে। কিন্তু তাঁর কার্যকাল শেষ হবার সাথে সাথেই নাম্বুদিরী সম্প্রদায় চিরাচরিত প্রথা রদ করে তাঁকে আজীবন পেরুমল পদে বরণ করে নেয়। ভাস্কর রবিবর্মাও স্থায়ী প্রতিনিধিরূপে ছত্রিশ বছর কেরলের মালিক

নাম্বুদিরী সম্প্রদায়ের সেবা করেন। আপন চেররাজ্যে আর তিনি ফিরে যান নি। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কেরলেই অতিবাহিত করেন। তিনি কেরলের স্থায়ী রাজারূপেও নাম্বুদিরীদের স্বীকৃতি লাভ করেন।

ভাস্কর রবিবর্মার মৃত্যুর সাথে সাথেই কেরলে পেরুমলদের শাসনকালের অবসান ঘটে। মৃত্যুর আগে চেরমন পেরুমল ভাস্কর রবিবর্মা আঞ্চলিক শাসনকর্তাদের দেশশাসন ব্যাপারে উপযুক্ত শিক্ষাদান করেন এবং আপন আপন অঞ্চলের মালিকরূপে স্বীকৃতি দেন। এই স্বীকৃতি লাভের সাথে সাথেই ঘটল কেরলে পেরুমলযুগের অবসান এবং সামোতিরী বা জামোরিন যুগের সূচনা।

সামোতিরী বা সামন্তকাল কেরলে আনল আপন শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার প্রয়াসজনিত অস্থিরতা। সামন্তকালসুলভ বীরপূজা সুরু হল। সামন্তরাজারা কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আপনাপন অঞ্চলের সার্বভৌমত্ব লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করা, অপরাপর রাজশক্তিকে বশীভূত করে আপনাপন রাজ্যসীমা বৃদ্ধি করার দুর্জয় লালসায় মেতে উঠলেন। আপন রাজ্যসীমা বৃদ্ধির জন্য পররাজ্য আক্রমণ সুরু হল। সুরু হল হানাহানি একই উৎসসম্ভূত শক্তিগুলির পরস্পরের মধ্যে। পররাজ্য আক্রমণ এবং অপরের আক্রমণ থেকে আপন রাজ্যসীমার কৌমার্য অক্ষত রাখার সংগ্রামের মাঝেই স্বাভাবিক ভাবে জন্ম নিল সৈনিকোচিত মনোবৃত্তি। শত্রুর সঙ্গে সংগ্রামে বীরত্ব প্রকাশই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠগুণ বলে বিবেচিত হতে সুরু করল। সংগ্রাম, শত্রুকে নিধন করা, বিজিতকে লুণ্ঠন করা পবিত্র ধর্মীয় কর্ম বলে গণ্য হতে লাগল। এবং এই আবহাওয়া থেকেই স্বাভাবিকভাবে গড়ে উঠতে থাকল জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারণা। সারা কেরল তখন কয়েকটি পরস্পর বিরোধী সামন্তরাজার অধীনে আপনাপন অঞ্চলে আপনাপন বীরপূজায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। চারণদের কণ্ঠে বেজে উঠল কেরলের প্রথম চারণগীতি। সাহিত্যের এই শাখাটি পুষ্পিত হল, সজ্জিত হল স্বাভাবিকভাবেই মনোরম ফুলে ফলে সহজ সৌন্দর্যে।

সামন্ত যুগেই দেশের পুরুষদের পাশে এসে দাঁড়াল পুরাঙ্গনারাও। বীরকণ্ঠে দুলিয়ে দিল বরমাল্য। এমন কী কটাক্ষবাণ পারদর্শিনী যুবতীর হাতে ঝিকমিক করে উঠল শাণিত উলঙ্গ খর্পর। রণচণ্ডা মূর্তিতে রণক্ষেত্রে তাতা থৈথৈ নৃত্য সুরু করল মৃত্যুনেশায় বিভোল কেরল ললনা। মরল কত, মরল আরো কত সামন্ত যুগসুলভ দেশের স্বাধীনতার অমৃতকুম্ভ রক্ষার সংগ্রামে। কিছুদিন আগেও যে কেরল ছিল একই রাজশক্তির ছত্রছায়ে একক ও অভিন্ন, বিভিন্ন রাজশক্তির বিচ্ছিন্ন শাসনযন্ত্রের প্রভাবে সেই একই দেহের বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক হানাহানি চরমরূপে আত্মপ্রকাশ করল। ঠিক এমনটিই দেখা গিয়েছিল রাজপুতানায়। দেখা গিয়েছিল বাংলায় ভূঞাদের আমলে। আর ততদূর যাওয়ারই বা দরকার কী—রাজনীতির প্যাঁচে পড়ে পূর্ব এবং পশ্চিম বাংলা বা পাঞ্জাব আজ বিপরীতধর্মী দুই মেরু। সুবিধাবাদী এবং স্বার্থ সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক নেতাদের ঢাকে সেই আদিম এবং একমাত্র সুর বেজে চলেছে উভয় প্রান্ত থেকে—দুমুখ কখনো এক হবার নয়। এ ঢাক সেদিন কেরলেও বেজেছিল একই সুরে আলাদা ভাবে ত্রিবাংকুরে, কোচিনে, কালিকটে। এ ঢাক শুনেছি মেবারে মারওয়াড়ে। একই ঢাক বার বার ফেঁসে যায় আর চাপানো হয় নতুন রং এর নতুন ছাউনী।

সামন্তযুগে কেরল যুদ্ধের আবহাওয়ায় বিকশিত হতে থাকল বিভিন্ন ক্ষেত্রে। যুদ্ধ এবং আঞ্চলিক স্বাধীনতা রক্ষাস্পৃহাকে উপজীব্য করে শিল্প সাহিত্য বিকাশলাভ করল। সাধারণ্যে প্রসারলাভ করল সমরবিদ্যা ও স্বাধীনতার উপলব্ধি। গণমানসে এলো নতুন জোয়ার। রাজসিংহাসনের চৌহদ্দি ছেড়ে সরল সদাহাস্যময় হরিতক্ষেত্র, জোনাক জ্বলা গ্রামের পর্ণকুঠির পর্যন্ত ছাড়িয়ে পড়ল যুদ্ধের বিভীষিকা। যুদ্ধস্পৃহা তার শাণিত নখদন্ত উদ্যত করে সারা দেশটা শুঁকে বেড়াতে লাগল। টগবগ করে ফুটতে লাগল কেরল ধমণীর রক্তস্রোত।

কেরলের সামন্ত যুগই বহিঃশত্রুর আক্রমণের যুগ। সমান্তযুগেই কেরলের মাটি সাত সমুদ্দুর তেরো নদীপারের পরস্বলোভী ইউরোপীয় রাজশক্তিদের কলুষ হস্তের স্পর্শে কলংকিত হয়। সামন্ত রাজারা পরস্পরের এতই শত্রু হয়ে পড়ে যে বিদেশী আক্রমণ থেকে একজনকে রক্ষা করার জন্য অপর কয়জন সাহায্য করা দূরে থাক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিদেশী আক্রমণকারী শক্তিকেই সাহায্য করে প্রতিবেশী শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য। ঐশ্বর্যশালিনী ভারতের ঐশ্বর্য লুণ্ঠন করার জন্য সমুদ্র পথে ভারতে আসবার পথ আবিষ্কারের তোড়জোড় ইউরোপে সুরু হয়েছিল অনেকদিন আগেই। যে মূরদের অধিকারের জোয়ালে বাঁধা পড়েছিল স্পেন, যাদের শক্তির প্রত্যক্ষ ঔজ্জ্বল্যে সারা ইউরোপ বিবশ হয়ে পড়েছিল সেই আরববাসীরাই (মূর) স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতের সঙ্গে ইউরোপের ব্যবসাবাণিজ্যের মধ্যস্থতা করত। সেই মূরদের ঐশ্বর্যের চাকচিক্যে চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল ইউরোপের। ইউরোপ তখন সবে সামরিক এবং নৌশক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠেছে। তার দুঃসাহসী নাবিকরা ভারতের পথ সন্ধানে অজ্ঞাত সমুদ্রে ভেসে পড়ছে। ভেসে পড়ছে রূপকথায় শোনা সম্পদের দেশ ভারতের পথ সন্ধানে। তদানীন্তন ইউরোপ ভারতের তুলনায় দীনদরিদ্র। ভাস্কো-দা-গামার কালিকটের জামোরিনকে দেওয়া নজরানার দৈন্য সেদিনকার যে কোনও ভারতবাসীর কাছেই ইউরোপের বৈভবদৈন্য প্রকটরূপে প্রকাশিত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

কেরল তথা ভারতের সম্পদের লোভে লোলুপদৃষ্টি ক্ষুধিত বন্যকুক্কুরের মত একে একে পর্তুগীজ, ডাচ, দিনেমার, ফরাসী, ইংরেজদের জাহাজ এসে নোঙর করতে লাগল কেরলের বন্দরে। লুব্ধ হাতের কলুষ স্পর্শে কলুষিত হল কেরল। শিউরে উঠল ঘৃণায়। তবুও সামন্তরাজারা আপন আপন সংকীর্ণ স্বার্থ, অহমিকা এবং দূরদৃষ্টির অভাব বশতঃ সাধারণ শত্রু বিদেশীদের বিরুদ্ধে একযোগে রুখে দাঁড়াতে পারল না। একহাতে তারা বিদেশী শক্তি এবং অন্যহাতে

আগ্রাসী প্রতিবেশী সামন্তশক্তিকে রুখতে লাগল। কেরলের বাতাস এ যুগটায় রণদামামার উন্মত্ত আহ্বান, আর্তের হাহাকার, বিজয়ীর পাশব উল্লাসধ্বনি এবং স্বজনহারার আর্তনাদে ভয়াবহ। এই সময়ে কেরলে যত মানুষ অস্ত্রচালনা এবং যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করে এর আগে বা পরে কখনো তেমনটি আর দেখা যায় নি। সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধে সারা কেরল যেন আপন বিচ্ছিন্ন গণ্ডীর মধ্যে কয়েকটি ছুটন্ত উল্কাপিণ্ডের মত উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এই সামন্ত কালেই। রাজার পরাজয়কে জাতীয় পরাজয় বলে মনে করতে থাকে কেরলের সাধারণ মানুষেরা।

সামন্ত রাজাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ প্রভাবশালী এবং সম্মানের অধিকারী ছিলেন ত্রিবাংকুরের (ওয়েনট বা তিরুবিতাংকর) রাজারা, কোচিন রাজবংশ এবং কোষিকোট (কালিকট) এর সামোতিরি। সর্বপ্রকার বৈদেশিক আক্রমণকে প্রতিহত করা এবং শত্রুকে পরাস্ত করার ঐতিহ্যের অধিকারী ছিলেন এঁরা। এই তিন শক্তির শাসন-ব্যবস্থা, বীরত্ব এবং শক্তির প্রশংসায় ইতিহাস সোচ্চার। এঁদের মধ্যে আবার ত্রিবাংকুরের রাজা মার্তণ্ড বর্মার নাম সবার উপরে। রাজা মার্তণ্ড বর্মারই দূরদৃষ্টি, বীরত্ব, রণনৈপুণ্য প্রভৃতি গুণের জন্য বিশাল ত্রিবাংকুর (তিরুবিতাংকর) রাজ্য তার ভিত্তিকে আরো দৃঢ়-মূল করতে সক্ষম হয়। এই ভিত্তিমূল এতই সুদৃঢ় ছিল যে স্বাধীন ভারতের ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের আগে পর্যন্তও সে আপন মহিমার আসনে সমারূঢ় ছিল। ত্রিবাংকুরের পরই নাম করতে হয় কোচিন রাজ্যের। কোচিন রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে শক্তন্ তম্পূরণের নামই সর্বাধিক উচ্চারিত। কালিকটের সামোতিরী আর পষশ্‌শী রাজারা ইংরাজ অধিকারের সাথে সাথেই পেন্সন নিয়ে সিংহাসন ছেড়ে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হন। এই রাজাদের উত্তরপুরুষরা এখনো কেরলের অভিজাত সমাজের অন্তর্ভুক্ত। জমিদারী, জায়গীরদারী এবং সরকারী পেন্সন এঁদের কাঞ্চন কৌলিন্যের যুগে সমাজে উচ্চাসন প্রদান করেছে।

বৃটিশসিংহের থাবা কেরলের বুকে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই কেরলে সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটে।

সামোতিরী আর পষশ্শী রাজাদের বলপ্রয়োগে কাবু করতে সমর্থ হলেও ইংরাজ ত্রিবাংকুর আর কোচিনের রাজাদের ক্ষেত্রে কূটনীতির সাহায্যে সন্ধি স্থাপন করে। সন্ধি আরোপিত সর্ত অনুযায়ী এই দুই রাজ্য আপনাপন অঞ্চল শাসন করার অধিকার লাভ করে' যতদিন ইংরাজ ভারত শাসন করেছে ততদিন এই দুই দেশ সীমাবদ্ধ মর্যাদার সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থেই সহ অবস্থান করেছে। এ দেশের সাধারণ মানুষের পরাধীনতার প্রতি ঘৃণা এবং স্বাধীনতার জন্য সর্বস্বপণ সংগ্রামী দাঢ্যকে ভয় করেছে ইংরাজ রাজশক্তি। তাই এই দুই রাজ্যকে সামন্ত রাজ্যের মর্যাদা দিয়ে পরোক্ষভাবে দেশের সাধারণ মানুষদের, স্বাধীনতাকামী জনসাধারণের ইংরাজের তথা আগ্রাসী বিদেশী রাজশক্তির প্রতি ঘৃণা এবং ক্রোধের ক্ষুরধারকে ধীরে ধীরে ভোঁতা করে দিতে চেয়েছে। ত্রিবাংকুর এবং কোচিনকে দেশীয় রাজ্যরূপে স্বীকৃতি দিয়ে বৃটিশসিংহ চেয়েছিল স্বাধীনতা অভিমানী মালয়ালী (কেরলবাসী) দের দুর্জয় স্বাধীনতা স্পৃহা এবং দুর্নিবাপ্য জনচেতনার আগুনকে সংযত রাখতে। তবু ১৮৫৭ খৃস্ট অব্দের সিপাহী বিপ্লবেরও ষাট বৎসর আগে দেখা যায় পষশ্শী রাজাদের নেতৃত্বে স্বাধীনতা অভিমানী কেরলবাসী বনজঙ্গল পাহাড়ের আড়াল থেকে বার হয়ে বার বার ইংরাজ শক্তির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সামন্ত রাজাদের পেন্সন জায়গীর প্রভৃতি উপঢৌকন দিয়ে ইংরাজ তাদের স্বপক্ষে টেনেছে। কেরলের সাধারণ মানুষ কিন্তু এই সব ভাঁওতায় ভোলেনি। তারা যখনই দেখেছে যে তারা যাদের হয়ে লড়ছিল, যাদের সিংহাসন রক্ষার জন্য দলে দলে প্রাণ দিচ্ছিল আর ভাবছিল স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে বীরের মৃত্যু বরণ করছে আর ঐ সব নৃপতিরা অনিশ্চিত সিংহাসনের চেয়ে নিশ্চিন্ত পেন্সন এবং জমিদারীকেই শ্রেয় বলে মেনে নিয়ে দেশের মানুষের শ্রদ্ধার মুখে নিষ্ঠিবন নিক্ষেপ

করছে তখনই তারা অবস্থাটা নতুন করে পর্যালোচনা করেছে। সুঅভিজ্ঞ সংগ্রামী সাধারণের চোখে নতুন আলো পড়ছিল, নতুন দিশার সন্ধান পেয়েছিল তারা। তারা চিনেছিল প্রকৃত শত্রুকে। চিনেছিল নিজেদের। তারা হয়েছিল স্বার্থ সচেতন। জনগণ নিজেদের চিনেছিল, চিনেছিল নিপীড়ক, শোষক এবং তাদের সহায়তাকারীদের। তাই তাদের স্বাধীনতা স্পৃহা, শোষণের বিরুদ্ধে দুর্জয় ঘৃণা বার বার আঘাত হেনেছে বিভিন্ন ধরণের অভ্যুত্থানের রূপ ধরে। ঘৃণার্হ প্রবলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম কেরলের ধমণীতে উষ্ণধারারূপে প্রবাহিত। সব ধরণের আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বাঁধ ভেঙ্গেই তার পথ পরিক্রমা।

১৯২১ খৃষ্ট অব্দের মোপলা কৃষক অভ্যুত্থান নিঃসন্দেহে জমিদার এবং তাদের রক্ষক বৃটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে জাগ্রত শ্রেণী চেতনার সক্রিয় অভ্যুত্থান। যতদূর জানা যায় মোপলাদের প্রথম অভ্যুত্থান ঘটে ১৮৩৬ সালে। পরবর্তি আঠারোটি বছরে অভ্যুত্থান ঘটে মোট বাইশ বার। ১৮৪৯ সালের অভ্যুত্থানে লড়াই চলে শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত।[১] অভ্যুত্থানের পৌনপুনিকতা এবং নিষ্ঠুর দমনের মধ্য থেকে অধিকতর শক্তিসংগ্রহ বৃটিশ কেশরীকে এমনই বিপর্যস্ত করে তুলেছিল যে সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করে কোন রকমে আত্মরক্ষা করতে হয়েছিল। নির্বিচার হত্যা, জঘন্যতম উৎপীড়ন এবং আনুষঙ্গিক সবরকমের দমন ব্যবস্থার আশ্রয় নিয়েও এই নিপীড়িত নির্যাতীত মানুষগুলিকে নুইয়ে দেওয়া সম্ভব হয় নি। জাহাজ ভর্তি করে সপরিবারে আন্দামানের কালাপানিতে চালান করেও কেরলের কৃষকের মনের আগুন নিভানো যায় নি। বরং তা আরো উদ্ভাসিত হয়েছে। তার রক্তিম ছটা ছড়িয়ে দিয়েছে সারা দেশে। আঞ্চলিকতার বন্ধন কেটে সে আন্তর্জাতিক মহাযজ্ঞের শরিকদার হয়েছে।

১৮৩৬ সালে মোপলা অভ্যুত্থানের সুরু। তারই পরিণতি ১৯২১ এর

---

১ *L. Natarajan* **: Peasants uprising in India (1850-1900)**

অভুত্থান। মোপলা কৃষকদের শতাব্দীব্যাপী পৌনপুনিক অভ্যুত্থান নিঃসন্দেহে বৃটিশ রাজশক্তি তথা তার তাঁবেদার জমিদার শ্রেণীর নিষ্ঠুর শোষণ পীড়নের বিরুদ্ধে জাগ্রত জনমতের সক্রিয় অভ্যুত্থান। এই সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্রবলের চেয়ে বেশী কার্যকরী হয়েছিল সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির বিষ। সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির বর্ম মুড়ি দিয়ে তাকে আত্মরক্ষা করতে হয়েছিল। তবুও নির্বিচার হত্যা, অমানুষিক নির্যাতন, গ্রাম জ্বালান, শিশুবৃদ্ধ নারী হত্যা, নারী নির্যাতন এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য সব ধরণের দমন ব্যবস্থার আশ্রয় নিয়েও এই নিপীড়িত যুগ যুগ নির্যাতীত সর্বহারা মানুষগুলোকে বশে আনতে পারে নি। অন্যায়ের প্রতিকার স্বহস্তে করার শপথ সর্বগ্রাসী দাবাগ্নির মত এদের এক অন্তর থেকে অপর অন্তরে সঞ্চারিত হয়েছে, সঞ্চারিত হচ্ছে এক পুরুষ থেকে পরবর্তি বংশধরের অন্তরে।

মোপলা কৃষকদের হাতে বহু হিন্দু নিহত হয়েছিল একথা সত্য কিন্তু এটাই সত্যের সবটুকু নয়। এই হিন্দুরা কারা জানা না থাকলে সত্য বিভ্রান্তিকর রূপে প্রতিভাত হওয়াই স্বাভাবিক। এই হিন্দুরা ছিল ভূস্বামী বা তাদের ভাড়াটে নির্যাতনকারী। তারা পেত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজশক্তির সক্রিয় সহায়তা। আর ঐ অঞ্চলের কৃষকরা ছিল বেশীর ভাগই দরিদ্র মোপলা মুসলমান। জমিদারের নির্যাতনের বিরুদ্ধে কৃষকের অভ্যুত্থানকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রূপ দেওয়া প্রয়োজন হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী রাজশক্তি এবং তার তাঁবেদার, প্রসাদপুষ্ট জমিদার শ্রেণীর। বিদ্রোহ ছিল সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থসিদ্ধিকারী ভূমিব্যবস্থা এবং তার স্বত্বভোগী বৃটিশ পক্ষপাতপুষ্ট মুষ্টিমেয় জমিদারের বিরুদ্ধে। অর্থাৎ শোষকদের বিরুদ্ধে শোষিতদের স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থান। ১৯২১ সালের অভ্যুত্থান খিলাফত আন্দোলনের প্রভাব এবং অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে দেশব্যাপী জাগরণেরই সংগ্রামী চেতনা গ্রাহ্য প্রমূর্ত রূপ। এই ভয়ংকর সুন্দরকে দেখে শিউরে উঠেছিল সেদিনের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি।

যা কিছু অন্যায় যা কিছু অসুন্দর, যা কিছু প্রতিক্রিয়াশীল যা কিছু গণমানষের আশা আকাংখার পরিপন্থী তারই বিরুদ্ধে কেরলবাসীর সংগ্রাম ঐতিহাসিক ঐতিহ্য। এই মানসিক গঠনের প্রতিচ্ছায়া তাদের নিষ্কলংক দুগ্ধ শুভ্র পোষাক। যে পোষাকের শুভ্র শুচিতা কেরল আত্মাকেই প্রতিফলিত করে।

কোন দেশকে জানতে হলে তার ভৌগোলিক অবস্থান এবং অধিবাসীদের সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রাথমিক প্রয়োজন। তারপরই আসে তার রাজনৈতিক ঐতিহ্য, সাহিত্য, কলা এবং সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিকাশের স্তরগুলির কথা। কারণ প্রথমটাই অনেকাংশে দ্বিতীয়টির উপর প্রভাব বিস্তার করে।

ভারতের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তের খানিকটা জুড়ে কেরল। পূবদিকে তার সহ্যাদ্রি পর্বতমালা, যেখান থেকে ক্ষত্রিয়-হত্যায়-ক্লান্ত পরশুরাম তাঁর রক্ত-কলুষিত কুঠারখানি আরব সাগরে নিক্ষেপ করেছিলেন। পশ্চিমে 'কভু অশান্ত কভু প্রশান্ত' আরব সাগর। কেরলে সূর্য ওঠে চা বা কফি বাগিচার কোল থেকে, এলাচ দারুচিনি বনের বুকের রাতের বসন ছিঁড়ে দিয়ে। অস্ত যায় আরব সাগরের গভীর নীল স্বপ্নে। সেই স্বপ্নের পথ বেয়ে কত পরবাসী সওদাগরের সপ্তডিঙ্গা মধুকর সোনায় ভরে এসে ভিড়ত মুজিরিস, কোচিন, কালিকট বন্দরে। সেখান থেকে ভরে নিত এলাচ, গোলমরিচ, লবঙ্গ, হাতীর দাঁত, চন্দনকাঠের কারুকৃতী, দালচিনি, সাগর ছেঁচা মুক্তা—তারপর তুলে দিত অনুকূল হাওয়ায় পাল। বিদায় নিত স্বর্ণপ্রসবিনী ভারতের কাছ থেকে। বিদায়কালে তরী আর তীর, দুদিক থেকেই শুভকামনা করা হত—পুনর্দর্শনায় চ!

সহ্যাদ্রি পর্বতে হেলান দিয়ে, আরব সাগরে পা ডুবিয়ে বসে আছে চিরষোড়শী কেরল। উত্তর দক্ষিণে যার বিস্তার ছিল এককালে যথাক্রমে কন্নড় দেশের কোলে গোকর্ণ থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত।

বর্তমান ভারত ভাগ্যনিয়ন্তাদের আশীর্বাদে কেরলের দক্ষিণ প্রান্তের কন্যাকুমারী জেলা মাদ্রাজ রাজ্যের অংকশায়িনী। এই প্রক্রিয়ার ডাক নাম ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন। গত বিশ বছরে এমন কত রাজ্য পুনর্গঠনের ভেল্কীবাজী দেখেছে ভারতের সাধারণ মানুষ মূক বিমূঢ়ভাবে। আর দেখেছে দেশের বুকে শত শত রক্তপিপাসু সীমান্তরেখা। জাতীয় ঐক্যের বুলি কপচে মহীশূর থেকে গুজরাটকে, বাংলা থেকে বিহারকে, কেরল থেকে মাদ্রাজকে কান ধরে লক্ষযোজন দূরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে ফেলার কেরামতি! ঐ একই কেরামতির ঠ্যালায় পূর্ব পাঞ্জাবের অঙ্গচ্ছেদ, অঙ্গচ্ছেদ পশ্চিমবঙ্গের!

উত্তরে কন্নড় দেশ বা মহীশূর রাজ্যের কোলে কাষড়কোট থেকে দক্ষিণে পারশ্‌শালা পর্যন্ত ফালি জায়গাটুকুই বর্তমান কেরল—স্বাধীন ভারতের সর্বাধিক আলোচিত এবং সবচেয়ে আলোকিত রাজ্য। বংশানুক্রম দেশসেবার মৌরসীপাট্টার দাবীদারদের জাগরণের আতংক, নিদ্রার দুঃস্বপ্ন!

পশ্চিমঘাট পর্বতমালা কেরলের সমভূমির মধ্যেও এখানে সেখানে উঁকি দেয়।

বিশ্বসংসারের রঙ বদলের খেলায় মুগ্ধা কাজলী মেয়ে কেরল। চুপচাপ অন্যমনস্ক বসে আছে সাগর জলে পা ডুবিয়ে। মুক্তবেণী নদীগুলি বুকের উপর দিয়ে নৃত্যছন্দে নেমে এসে কোলের কাছে সাগর জলে খেলা করে লীলাভরে। আষাঢ়ের মেঘ দেখে তার দুচোখে খেলে বিদ্যুৎ! শ্রাবণে বর্ষণের উল্লাসে খসে পড়ে বুকের তোর্তু (ওড়না), ভেজে তার নিরাবরণ বক্ষ।[১] শরতের সাদা মেঘ যখন আকাশের অঙ্গনে ছুটাছুটি করতে করতে দিগন্তরেখার কোলে পৌঁছে যায় সে বুঝি চমকে তাকায় কোনও ময়ূরপংখী নাও-এর

১। কেরলের প্রাচীন প্রথানুযায়ী মেয়েদের উর্ধ্বাঙ্গ নিরাবরণ রাখারই রেওয়াজ ছিল। আজকাল সে প্রথা উঠে গেলেও দূর গ্রামে অনেক প্রাচীন মহিলাকে এখনো বিবস্ত্র বক্ষেই দেখা যায়।

পালভ্রমে। কত ধর্মের মন্ত্র গুঞ্জরণ তার কানে। কত দিগ্বিজয়ীর বরমাল্য দুলতে চাইল তার কণ্ঠে কিন্তু কুমারী মেয়ের ব্রতভঙ্গ হল না। তার অন্তরের ফল্গুধারার স্পর্শে সব ধর্মই হল ধন্য। দিগ্বিজয়ীর বরমাল্য তার চরণপ্রান্তে পূজার অর্ঘ হতে পেরে ধন্য হল। কেরল চিরকালের অনন্যপূর্বা, অনন্যা। সে যে সুদূরের পিয়াসী, সে যে বিশ্বমানবতার উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত সন্ধ্যামালতী।

পাহাড়ের দেশ কেরল, নদী এবং উপত্যকার বরপ্রসূত ভূমি কেরল। কেরল প্রাকৃতিক শোভার রম্যভূমি। সৌন্দর্য বিচারে কেরল-কাশ্মীর যমজ বোন। বৈচিত্র্য কেরলের পাহাড়ে সাগরে। বৈচিত্র্য তার তটিনী আর তটে, তার জীবনে। জলে জঙ্গলে, জনজীবনে তার বৈশিষ্ঠ্য, সর্বত্রই তার বৈশিষ্ঠ্যের সমারোহ।

সমুদ্র কিনারে প্রাকৃতিক শোভার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ঐতিহ্যমণ্ডিত বন্দরের মালা। যেন তপস্বিনী উমার কণ্ঠে একশো চার মুক্তা আর মাণিক্য গাঁথা হার। তলশ্‌শেরী, ওয়েক্কল, কোঘিকোড (কালিকট), তিরুর, বডগরা, কোটংগল্লুর, কোল্লর, তিরুবনন্তপুরম (ত্রিবান্দ্রম), কোবলম, কোচ্চি (কোচিন)—কাকে ফেলে কার নাম করি! প্রত্যেকটি বন্দরই বিশ্ববিখ্যাত। তবে এদের মধ্যে কোচিনই যেন মণির রাজ্যে কোহিনূর। বোম্বাই বন্দরও নাকি প্রকৃতির দাক্ষিণ্যের বিচারে কোচিনের কাছে হেলা ফেলা।

কেরলের নদীগুলি পাহাড় থেকে অভ্র, মোনাজাইট, স্বর্ণ প্রভৃতি মূল্যবান খনিজসম্পদ বহন কবে আনে।

ভূমি এখানে স্বর্ণপ্রসূ। বনেজঙ্গলে সেগুন চন্দন প্রভৃতি মূল্যবান বনজসম্পদ সম্ভার। আর রয়েছে এক দিগন্ত থেকে দিগন্তান্তরের মধ্যে সম্পর্কস্থাপনকারী এলাচ, গোলমরিচ, লবঙ্গ, দালচিনি, চা, রবার, কফির বাগিচা। নারকেল সুপারীর কুঞ্জ। বসন্ত সমাগমে কেরলের আমবাগানে বাংলার মত একই সুরে কোকিল ডাকে। সন্ধ্যার আগে ফিঙেয় টেলিগ্রাফের তার বা নারকেলের পাতা ধরে দোল খায়।

কেরলের বনভূমি ইন্দ্রের হাতিশালা যেন, যেন ডায়নার মৃগয়া ক্ষেত্র। হাতী, হরিণ, বাঘ—প্রকৃতির শান্তকোলে বিচরণ করছে নির্বিঘ্নে। বিহার করছে সৃষ্টির প্রথম প্রভাত থেকে।

ঠিক এই পারিপার্শ্বিকের ছত্রছায়ায় গড়ে উঠেছে 'ছত্রের দেশ' কেরল। ছাতি কেরলে আভিজাত্যের প্রতীক নয়—যেন পোষাকেরই অঙ্গবিশেষ। ছাতি ছাড়া এককালে পথ চলত কেবল ভ্রষ্টা সমাজচ্যুতা নাম্বুদিরী স্ত্রীলোকেরা। ভ্রষ্টা প্রমাণিত হলে নাম্বুদিরী নারীর ছাতি কেড়ে নিয়ে ভেঙ্গে ফেলা হত এবং তাকে পথে নামিয়ে দেওয়া হত।

সে সব দিন এখন মুত্তরুশীর (দিদিমার) রূপ কথা!

কেরল শব্দের উৎপত্তির সঙ্গে নাকি শেষ পেরুমল-এর (চেরমন পেরুমলের) নাম সম্বন্ধিত। চেরলই উচ্চারণের বিবর্তনে হয়েছে কেরল। আগে দেশের নাম ছিল মালয়ালম। আজ কেবল কেরলের ভাষার নামই মালয়ালম। কেরলবাসীদের বলা হয় মালয়ালী।

পণ্ডিতরা এখনো পর্যন্ত সর্বসম্মতভাবে নিশ্চিত নন যে দ্রাবিড় জাতির মূল বাসস্থান উত্তর অথবা দক্ষিণ ভারত। উত্তর ভারতে তারা আর্যদের দ্বারা সামরিক শক্তিতে পরাস্ত হয়ে দক্ষিণ ভারতের দিকে নেমে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করে অথবা তারা মূলতঃ দক্ষিণ ভারতেরই মানুষ এটা ঠিক করে এখনো বলা সম্ভব হচ্ছে না। প্রাক আর্য যুগে তারা দক্ষিণ ভারত থেকেই উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল, উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, গড়েছিল মহেন-জো-দারো হরপ্পার মত সমৃদ্ধ এবং উন্নত জনপদ, সমৃদ্ধ সভ্যতা অথবা উত্তর ভারতের সভ্যতাই পুনর্বসিত হয়েছিল দক্ষিণ ভারতে এটা বলা শক্ত। তবে সব যুক্তি বিচার করলে এটুকু বুঝতে অসুবিধা হয় না যে দক্ষিণ ভারতের সভ্যতা দক্ষিণ ভারতেরই এবং যেহেতু প্রাচীন ভারতেও উত্তর দক্ষিণে সভ্যতা এবং সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বিদ্যমান ছিল সেহেতু উভয়ের অনেক ক্ষেত্রে সাদৃশ্য থাকা খুবই স্বাভাবিক।

কেরল দেশ যে সুপ্রাচীন কাল থেকেই সুসভ্য এ বিষয়ে আজ আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। ফারাওদের যুগে মিশরের সঙ্গে কেরলের মশলার কারবার এবং সিন্ধু সভ্যতার যুগে উত্তর ভারতের সঙ্গে কেরলের বাণিজ্যিক যোগাযোগ থাকার কথা আজ আর কষ্ট কল্পনা নয়। ওমান এবং পারস্যসাগরের মধ্য দিয়ে কেরলের দালচিনি এলাচ গোলমরিচ ভরা জাহাজ যীশুখৃষ্টের জন্মেরও বহু শতাব্দী আগে থেকেই পাড়ি জমাত। খৃষ্ট জন্মেরও এক হাজার বছর আগে ইজ্‌রাইলের বাদশাহ সোলেমানের এক নৌবহর কেরলের ওফির বন্দরে এসে ভিড়েছিল এ কথা ঐতিহাসিক সত্য। ওফির শব্দটার সঙ্গে ত্রিবান্দ্রম জেলার পুবার এবং কালিকট জেলার বেপুর নামের মিল সুস্পষ্ট বলে অনেকেই মনে করেন।

কেরলের সুপ্রাচীন অধিবাসীদের মধ্যে এখন চেরুমর, পুলয়র প্রভৃতিদের দেখতে পাওয়া যায়। কৃষিকাজই এদের মূল উপজীবিকা। প্রাচীন জাতিদের মধ্যে আর যাদের দেখতে পাওয়া যায় তারা হচ্ছে মলয়র, নায়াটি, কাটর প্রভৃতি জাতি। এরা থাকে ঘন জঙ্গলে। এককালে কেরলের সমতলভূমিতেই হয়ত এদেরও ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রাম ছিল, ছিল বৈভব সমৃদ্ধ নগর বন্দর। এদেরই কোনও পূর্বপুরুষ হয়ত মিশরবাসীদের এলাচ দালচিনির নির্যাস তৈরীর কৌশল শিখিয়ে দিয়েছিল। হয়ত এই নির্যাস তৈরীর কৌশল জানা না থাকায় মিশরীয় বৈজ্ঞানিকেরা শব সংরক্ষণ করার কাজ সম্পূর্ণ করতে পারছিলেন না!

দেবতাদের জন্য ত্রিপাদভূমি ছেড়ে দিয়ে বলীরাজা পাতালে প্রবেশ করেছিলেন। এখনো তাঁর বংশধররা পাতাল ছেড়ে পৃথিবীর আলোকের স্বাদ পেল না, হাজার হাজার বছরের উৎপীড়ন, শোষণ এবং প্রতিকূল প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে টিকে আছে। সভ্যতার সূর্য এদেরই দুয়ারে প্রথম করাঘাত করেছিল। অথচ এরাই আজ সভ্য মানুষের চোখে জংলী, বুনো, অনগ্রসর, উপজাতি আরো কত সুন্দর

সুন্দর বিশেষণে সুশোভিত অপাংক্তেয়। মধ্যপ্রদেশের মাইকেল পর্বত-মালার পাদদেশে এখনো দেখা যায় 'আগারিয়া' নামক এক জাতিকে। নিষ্ঠুর প্রকৃতির সঙ্গে এবং প্রতিকূল রাষ্ট্রব্যবস্থার কল্যাণে তারা এসে দাঁড়িয়েছে ধ্বংসের মুখোমুখী। অথচ, এল্যুইন সাহেবের মতে এরাই নাকি ভারতীয় সভ্যতাকে প্রস্তরযুগ থেকে লৌহযুগের স্বর্ণসৌধে পৌঁছে দিছল। এককালে ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্বের দাবীদার আর্যদের দরবারে এইসব চেরুমর, মলয়র, নায়াটি, কাটর, পুলয়র আর আগারিয়া বাগারিয়ারা বন্য জীবের অধিক সম্মান পায়নি।

এরা সভ্য সমাজ থেকে দূরে দূরেই থাকে। আগে থাকতো প্রাণের ভয়ে এখন ঘৃণামিশ্রিত উপেক্ষা নয়ত, খুব উন্নত আরচণ হলে, করুণার পাত্ররূপে। কিন্তু দিন পালটায়। দিনের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর রূপও। সভ্যতার চাকা ঘোরে সোজা রাস্তায়ই। বনের মানুষগুলোই হাজার হাজার বছর পরে আবার পাদপীঠের সুমুখে এসে দাঁড়াচ্ছে। কুবেরের দরজায় হানছে অবিরাম গাঁইতি আর হাতুড়ীর আঘাত। হলধরের হাতিয়ার হয়েছে উদ্যত! সেই হলের আঘাতে সমান হবে সমাজের বন্ধুরতা। মন্দিরের রুদ্ধদ্বার ভেঙ্গে পড়ছে ভক্তের বজ্রমুষ্ঠির আঘাতে। যুগ যুগ পরে বন্দী দেবতার মুখে হাসি ফুটছে। হাসি ফুটছে আনন্দে তৃপ্তিতে। তারও বন্দীত্বের অবসান হতে চলেছে জরাসন্ধের জরাজীর্ণ লৌহকপাট ভেঙ্গে পড়ার সাথে সাথেই।

কেরলে ঠিক কবে থেকে বহিরাগতরা এসে বসবাস সুরু করেছিল তার হদিস ইতিহাসও ঠিকমত দিতে পারছে না। তবে যেটুকু জানা যায় তা থেকে ধরে নেওয়া হয়েছে যে নাম্বুদিরী ব্রাহ্মণ এবং তাদের সেবা করার জন্য আগত নায়াররাই কেরলের প্রথম আগন্তুক। যে ব্রাহ্মণদের জন্য নিরুপদ্রব ভূভাগের সন্ধান বা তাদের নিরুপদ্রব করার জন্য ভার্গব পরশুরাম প্রচণ্ড জঙ্গী উপদ্রবের সৃষ্টি করেছিলেন নাম্বুদিরীরাই তারা বা তাদের অংশবিশেষ। পরশুরামের কাছ থেকে কেরল উপহার পেয়ে

নাম্বুদিরীরা সেখানে এসে উপনিবেশ স্থাপন করল। স্মরণাতীত কাল থেকে বামনদেবের যে অপকর্মটির কিম্বদন্তী প্রচলিত তার অন্তর্নিহিত সত্যটুকু হয়ত এই যে পরশুরাম প্রতিষ্ঠিত উপনিবেশকে কেন্দ্র করে বামনদেব শক্তিশালী বলীরাজকে তাঁর ভালমানুষী এবং ঈশ্বর বিশ্বাসের মূল্যে রাজ্যচ্যুত ও নির্বাসিত করে সমগ্র কেরল ভূমিতে আর্য অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও নিরংকুশ করেছিলেন। অবতারের আবির্ভাব যে যুগে যুগে হয় একথা কেরল ইতিহাসই সপ্রমাণ করে। পরবর্তি যুগেও আমরা পরশুরাম এবং বামন অবতারকে দেখি যথাক্রমে পর্তুগীজ এবং ইংরাজরূপে। একই রূপ, একই উদ্দেশ্য তাঁদেরও—কেরল ধন্য করা, অসভ্যকে সভ্য করা, অন্ধকার থেকে আলোকের পথে নিয়ে যাওয়া!

শুদ্ধ আর্যরক্তের ধারক নাম্বুদিরী ব্রাহ্মণরা। নায়াররা নাম্বুদিরীদের কেরলস্থিত, কেরলের বিজিত অধিবাসীদ্বারা সৃষ্ট দাস বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। নায়ার শব্দটা সম্ভবত নায়ক শব্দেরই রূপান্তরিত রূপ। কেরলের ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভকাল থেকে এবং সম্ভবত তারও আগে থেকে কেরলের সব সম্পত্তির মালিক ছিলেন নাম্বুদিরীরা। এ মালিকানা বর্তায় পরশুরামের পরশুর ঈশ্বরিক তেজ থেকে!

নায়াররাও মূলতঃ দাস হলেও কেরলের মাটিতে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই তাদেরও হয় নতুন প্রতিষ্ঠা নতুন সম্মান। মূলত তারা দাস হলেও কেরলের বিজিত অধিবাসীদ্বারা সৃষ্ট নূতন দাসদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য চিহ্নিত হতে বিলম্ব হয়নি। এই দাসদের উপর খবরদারী করার পদে উন্নীত হয় নায়াররা। নাম্বুদিরীদের পরই তাই সমাজে আসন নির্দিষ্ট হয় নায়ারদের।

নায়ারদের পরিচালনাধীনেই ছিল নাম্বুদিরীদের ঐহিক সম্পদ। নাম্বুদিরীদের সকল কাজকর্মের দেখাশুনার ভার ছিল নায়ারদের উপর। দৈহিক শ্রমের দায়টা ছিল চেরুমর পুলয়র প্রভৃতি দেশীয় জাতির

লোকদের উপর। এই সব দেশীয় মানুষদের সম্মান ক্রীতদাসের অধিক ছিল না। তারাই এককালে দেশের সব সম্পত্তির মালিক ছিল। আবার মালিকানা পুনর্দখলের সংগ্রাম পাছে সুরু করে দেয় এই ভয়ে তাদের উপর প্রভুত্বের মাত্রাটা উগ্র থাকাই স্বাভাবিক।

নাম্বুদিরীদের বলা হত জন্মী বা ভূস্বামী আর তাদের কাজ করত যারা, তাদের বলা হত কুট্টিয়ান বা আসামী। এই সব কুট্টিয়ানদেরই প্রত্যক্ষ অধীনে থাকত দাসেরা। হিন্দু কোড বিল পাশ হবার আগে পর্যন্তও কেরলে যে ভূমিব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তার নাম 'জন্মী-কুট্টিয়ান বিল'—যা প্রকৃতপক্ষে উপরে বর্ণিত ব্যবস্থারই ঈষৎ সংস্কৃত রূপ।

কেরলে নাম্বুদিরী অধিকারের সুরু থেকেই নাম্বুদিরীরা কেরলের সবচেয়ে উপরতলার মানুষ, কেরলের সমগ্র বৈভবের মালিক। কেরলের বিভিন্নমুখী বিকাশ সাধনে নাম্বুদিরী সম্প্রদায়ের দানও তাই অপরিসীম। প্রচুর বিত্ত, অখণ্ড অবসর, বাধ্যতামূলক বিদ্যাভ্যাস এবং 'তারওয়াঢ়' বা একান্নবর্তি পরিবারের স্বচ্ছল নিশ্চিন্ততা এঁদের কাব্য সাহিত্য, দর্শন, চিত্রকলা, ভাস্কর্য প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তির দিকে আকৃষ্ট করে। বিচিত্র কারুকার্যমণ্ডিত মন্দির, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি সূক্ষ্ম রসাশ্রিত এবং তীক্ষ্ণধী পাণ্ডিত্যপূর্ণ মৌলিক সৃষ্টির ক্ষেত্রে এঁদের দান নিঃসন্দেহে কেরলকে মহিমান্বিত করেছে।

নাম্বুদিরী ব্রাহ্মণরা অধিকাংশই ঋগ্বেদী। যজুর্বেদীদের সংখ্যাও নেহাত নগণ্য নয়। তবে সামবেদী ব্রাহ্মণের সংখ্যা এঁদের মধ্যে খুবই অল্প। উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণদের মত তাঁদেরও বিশ্বামিত্র, কাশ্যপ, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, কণ্ব প্রভৃতি বিভিন্ন গোত্র।

আগেই বলা হয়েছে এককালে কেরলের সব সম্পত্তির মালিক ছিলেন নম্বুদিরীরা। তাঁদের পরিবার থাকত একান্নবর্তি। পারিবারিক সম্পত্তিকে চিরস্থায়ী করার জন্য বিচিত্র আইন কানুন তাঁরা প্রণয়ন করে নিয়েছিলেন।

পরিবারের একমাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্রদেরই অধিকার ছিল নাম্বুদিরী মেয়ে

বিয়ে করার। যেহেতু প্রকৃতি এই অনুপাত হারকে আমল না দিয়ে নিজের অনুপাত হার মেনে চলাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেছিল সেহেতু জ্যেষ্ঠ পুত্রদের অধিকার দেওয়া হল চার-পাঁচটা বিয়ে করার। জ্যেষ্ঠ পুত্র ছাড়া অন্যান্য ছেলেরা বিয়ে করত নায়ার তনয়াদের। আপাত দৃষ্টিতে ব্যাপারটা খুব সহজ সরল না হলেও তেমন বড় ধরণের ঘোরপ্যাঁচ আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু ঘোরপ্যাঁচ আছে তো বটেই এবং সেটা এতই জটিল যে ভেবে আশ্চর্য হতে হয় কতগুলি উর্বর মস্তিস্ক কতদিন ধরে কত রকমের অংক কষে তবে নিয়মটিকে আবিষ্কার করেছিল !

আর্য নাম্বুদিরী সমাজে নিঃসন্দেহে পিতৃপ্রাধান্য ছিল। কিন্তু উত্তরভারতের যে আর্যরা দুষ্কুলাদপি স্ত্রীরত্ন আহরণের নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং সেই দুষ্কুলাগতা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানদের নিকষ আর্য বলে মেনে নিতেও ইতস্ততঃ করেন নি তাঁদেরই এক শাখা নাম্বুদিরী ব্রাহ্মণরা এই ব্যবস্থাটা শুধুমাত্র গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেন নি এমন নয়। তবে এই গ্রহণ করার ভিতরেও ছিল অর্থশাস্ত্রের সূক্ষ্ম হিসাব। নাম্বুদিরীরা নায়ারদের মধ্যে প্রচলিত মাতৃধন-উত্তরাধিকার-ব্যবস্থার সুযোগ নিয়েছিলেন। নায়ারকন্যার গর্ভজাত নাম্বুদিরী-তনয়ের সন্তানদের কোন দায়-দায়িত্বই জনককে নিতে হত না। এই সব সন্তানদের নাম্বুদিরী বলে গণ্যও করা হত না। তারা হত নায়ার। ফলে নায়ার সমাজে প্রচলিত মাতৃধন-অধিকার-ব্যবস্থার দৌলতে তারা হত মাতুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। বাপের উপাধি তারা ব্যবহার করত না, করত মায়ের। মায়ের পরিচয়েই তাদের পরিচয়।

এখন অন্যদিক থেকে চিন্তা করলে মনে হওয়া অসম্ভব নয় যে নাম্বুদিরীদের জ্যেষ্ঠেতর ছেলেরা নায়ারকন্যা বিবাহ করার ফলে নায়ারদের মধ্যে নিজেরা বিবাহ করার উপযোগী কন্যার হার হ্রাস পেত। ফলে বহু নায়ার বিবাহ থেকে বঞ্চিত থাকতে বাধ্য হত। আপাতদৃষ্টিতে এমন মনে হলেও আসল ব্যাপারটা ছিল খানিকটা অন্য ধরনের। কেরলের সৈন্যদল গঠিত হত মূলতঃ নায়ারদের নিয়ে। ফলে দেশরক্ষার

জন্য এবং অন্যান্য যুদ্ধে প্রাণ দিত নায়াররাই। তাছাড়া নাবিকও ছিল তারাই। এভাবেই অবস্থা কখনো বিপজ্জনক জটিলতার সৃষ্টি করেনি। সেদিনকার মত আজও ভারতীয় সৈন্যদলে নায়ারদের বীরত্ব বিশ্বখ্যাত।

নাম্বুদিরী সমাজে বেদাভ্যাস অবশ্য কর্তব্য ছিল। তবে 'যাত্রা নাম্বুদিরী' নামক যুদ্ধ ও রাজনীতিতে অংশগ্রহণকারী, নাম্বুদিরী সম্প্রদায়ের অংশবিশেষের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সন্ধ্যাহ্নিক ছাড়া ধর্মীয় আর সব কর্তব্য থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছিল। বেদাভ্যাসের বদলে বাল্যকাল থেকেই তাদের শিখতে হত রাজনীতি এবং অস্ত্রবিদ্যা।

কেরলের মূল নাম্বুদিরী সম্প্রদায় দেশগত কারণে পরবর্তিকালে দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একভাগ বৈদিক যাগযজ্ঞ, বেদাভ্যাস, বৈদিক আচার অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে ঐতিহ্যের ধারক থাকেন। আরেক ভাগ দ্রাবিড় ব্রাহ্মণদের ভাষা বেশভূষা প্রভৃতি গ্রহণ করেন এবং ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, পূজা অর্চনা সবক্ষেত্রেই বৈদিক ঐতিহ্য ত্যাগ করে দ্রাবিড় ব্রাহ্মণদের অনুরূপ হয়ে পড়েন। আজকালও এঁদের দেখা যায়। মন্দিরের পৌরোহিত্য অথবা হোটেল পরিচালনাই এঁদের মুখ্য উপজীবিকা। এঁরা এম্প্রান্তিরী। এই এম্প্রান্তিরী ব্রাহ্মণদের উদ্ভব সম্পর্কে মহাকবি উল্লুর বলেছেন, 'উত্তরে গোকর্ণ থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে নাম্বুদিরীরা চৌষট্টিটি গ্রামের পত্তন করেন। পেরুমপুষা নদীর উত্তরে বসবাসকারীদের ভাষা ছিল তুল্লু আর দক্ষিণের মানুষদের তামিল। শেষ পর্যন্ত এঁরা দুটি ভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যান। আচার ব্যবহারেও পার্থক্য এসে যায়! উত্তর দেশের নাম্বুদিরীরা দ্রাবিড় ব্রাহ্মণদের বেশভূষা পরতে সুরু করেন এবং নিজেদের এম্প্রান্তিরী বলে পরিচয় দিতে আরম্ভ করেন কিন্তু দক্ষিণ অঞ্চলের নাম্বুদিরীরা নিজেদের আচার বিচার নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে থাকেন।'

শিক্ষার ক্ষেত্রে নাম্বুদিরীরা এককালে খুবই অগ্রসর ছিলেন। শিক্ষাব্যবস্থার সুষ্ঠু রূপায়ণে তাঁদের চেষ্টা এবং অধ্যাবসায় সন্দেহের

অবকাশ রাখে না। কেরলের বিভিন্নস্থানে তাঁরা টোল-জাতীয় শিক্ষামন্দির খুলেছিলেন আপন সম্প্রদায়ের ছাত্রদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে। টোলগুলিতে হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের বড় বড় পণ্ডিত শিক্ষাদান কার্যে নিযুক্ত থাকতেন। উল্লুরের বিবরণ থেকেই জানা যায়, কেরলে আঠারোটি বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় টোল ছিল। প্রত্যেকটিতে বহু ছাত্রের পঠন পাঠনের ব্যবস্থা ছিল। এমন দুটি শিক্ষামন্দির এখনো ত্রিচূর আর তিরুনাওয়াতে রয়েছে। এখানে এখনো বেদ অধ্যয়নের ব্যবস্থা আছে।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে ভগবান শংকরাচার্য ত্রিচূরে চারটি টোল খোলেন। পরে এক সময় এইসব টোলের পরিচালকদের মধ্যে ঝগড়া গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। ফলে একদল বেরিয়ে গিয়ে তিরুনাওয়াতে একটি নতুন টোল খোলেন। এই শিক্ষানিকেতনে বেদ অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনার ব্যবস্থা রয়েছে। ঋগ্বেদের বাৎসরিক পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে কটবল্লুর মন্দিরে। পরীক্ষাটি 'কটবল্লুর অন্যেহন্যম্' নামে বিখ্যাত। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের নাম্বুদিরী সমাজে প্রভূত সম্মান।

সেকালে মন্দির প্রতিষ্ঠার মূলে যে চিন্তা কাজ করে তা হচ্ছে ঈশ্বরোপাসনা এবং সমাজের বিভিন্ন বর্গের নরনারীর মধ্যে ধর্মীয় প্রভাব সঞ্চারিত করা। সমাজের কল্যাণেই মন্দির। এক একটা মন্দিরকে কেন্দ্র করে এক এক ধর্মীয় গোষ্ঠীর সাধন ভজন, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবনের বিকাশ। কেরলের মন্দিরগুলি প্রতিষ্ঠার মূলেও ভিন্ন কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু বহু মহৎ উদ্দেশ্যই শেষ পর্যন্ত অন্ধবিশ্বাস এবং যুক্তিহীন ভক্তির চোরাগলিতে পথ হারিয়ে ফেলে। মন্দিরের দেবতার চেয়ে ভক্তের মনে মন্দিরের মোহান্তই অধিক গুরুত্ব পায়। এক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয়নি। মন্দিরগুলি তাই কালক্রমে নাম্বুদিরীদের সম্পত্তিতে পরিণত হয়। কেরলের তামাম দেবমন্দিরের মালিক হয়ে পড়ল নাম্বুদিরীরা। এইসব মন্দিরের অগাধ ধনসম্পত্তির মালিক হয়ে নাম্বুদিরী সমাজে নেমে এল আলস্য এবং কল্পনাবিলাসের প্রবল স্রোত। সেই স্রোতে ধুয়ে মুছে গেল আধ্যাত্মিক জীবন সম্পর্কে আন্তরিক অনুসন্ধিৎসা। তার

বদলে সম্ভোগ চর্চায়ই তাঁদের নজর গেল বেশী করে। যে জীবনকে এতদিন মায়ামোহ বলে প্রচার করত সেই জীবনটাকে চেটে-পুটে ভোগ করতেই কাটতে লাগল তাদের জীবন। নেমে এল সাধনালব্ধ জ্ঞানের পরিবর্তে অজ্ঞানতার অন্ধকারজাত কুসংস্কার। আর মন্দিরের চত্বর থেকে সেই অন্ধকারকেই ঈশ্বরের জ্যোতি বলে সমাজের চারিভিতে ছড়িয়ে দেওয়া হতে লাগল। সাধারণ মানুষের ভক্তির ক্ষেত্রে সৃষ্টি করা হল কুজ্ঝটিকা। তারই আড়ালে বসে শ্মশানচারী পিশাচের মত ধর্মের গলিত শবকে পরমতৃপ্তিতে উপভোগ করতে লাগল নাম্বুদিরী সমাজ।

কিন্তু সব বিনষ্টিই নতুন সৃষ্টির বীজ বহন করে। ভূমিলীন মহীরূহের গলিত দেহ থেকেই তরুণ অংকুর জীবনরস আহরণ করে বেড়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয় নি। বাংলার অভিজাত সমাজ যখন বেশ্যাবিলাসে ডুবে আছে তখনই দেখি সেই দুর্গন্ধময় পঙ্কিল আবহাওয়াতেই নতুন বসন্তের ধ্বজা উড়িয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বসন্তসখারা। তাঁরা এনেছিলেন নতুন জীবনে উত্তরণের সংবাদ, নতুন জীবনের স্বাদ। কেরলেও নাম্বুদিরী সমাজে এই জ্ঞানদৈন্যের দিনে তাই দেখি কিছু সার্থক কবি এবং সাহিত্যিককে। এঁদের শিরোমনি ছিলেন কবি বেণমণি নাম্বুদিরী। এই সব সাহিত্যরথীদের রচনায় তৎকালীন সমাজের সুন্দর ও সত্যনিষ্ঠ চিত্র পাওয়া যায়।

বাংলার মনসা দেবী খুব বেশীদিন সর্বজন পূজ্যা হয়ে ওঠেন নি। কেরলের 'আয়িল্লম' নিঃসন্দেহে মনসার চেয়ে অনেক আগে জাতে উঠেছেন শুধু জাতেই ওঠেন নি তিনি আবার নিত্যপূজার হকদার। নাম্বুদিরী এবং নায়ারদের প্রত্যেকটি 'তারওয়াড়ের' (একান্নবর্তী পরিবার) 'ইল্লমে' (বাড়ীতে) একপাশে আম কাঁঠাল নারকেল সুপারী ঘেরা কুঞ্জের মধ্যে দেখা যায় কাববু বা সর্পনিকুঞ্জ। প্রতিদিন বাংলার তুলসী-মঞ্চের মত কেরলের সর্পকাবব তেও সন্ধ্যাদীপ জ্বালান হয়। এ ছাড়া

বিশেষ বিশেষ উৎসব উপলক্ষ্যেও সর্পপূজার বিধান আছে কেরলের নাম্বুদিরী আর নায়ার সমাজে।

সর্পপূজা নিঃসন্দেহে আর্যদের মধ্যে অনার্য সংস্কার অনুপ্রবেশের ফল। হলেই বা মূলত অনার্যদের উপাস্য, বাংলায় এবং কেরলে মনসা ঠাকরুণ ব্রাহ্মণ্য সমাজের বুকে হাঁটু দিয়ে নিয়মিত খাজনা আদায় করে ছাড়ছেন।

কেরলে সর্প বাস্তুদেবতার সম্মান আদায় করে ছেড়েছে। বাংলায়ও বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান মারফত বাস্তুসাপকে দুধ কলা দেওয়ার রেওয়াজ দেখা যায়। গ্রাম বাংলায় এমন মানুষ এখনো অজস্র পাওয়া যায় যাঁদের বিশ্বাস প্রত্যেক বাড়ীতেই একটি করে বাস্তুসাপ বাস করে। সেই বাস্তুসাপ মেরে কবে কে কোথায় নিবংশ হয়েছে বা ঘরে আগুন লেগে উৎসন্নে গেছে তার খবরও তাঁদের জিহ্বাগ্রে। কেরলেও এমন বেশ কিছু গল্প প্রচলিত আছে। কেরলে তারওয়াড়ে যদি কোন সাপ দেখা যায় তবে ধরে নেওয়া হয় যে সর্পপূজায় কোনরকমের ত্রুটি হওয়ার ফলে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন সর্পদেবতা। সঙ্গে সঙ্গে কাব্বুতে স্পেশাল দুধ-কলা চড়াবার ব্যবস্থা!

আজকালকার নতুন আইনের ফলে কেরলের একান্নবর্তী পরিবার ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। এই সব কাব্বুর অধিষ্ঠাতা আয়িল্লমদের হাল হয়েছে বাংলার কুলদেবতাদের মত। কাব্বু ভেঙ্গে ফেলে তার ওপর দিয়ে চলেছে পাটোয়ারীর চেন। টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে তারওয়াড়ের ভিটের মাটি। ভাঙ্গা কাব্বুর উদ্বাস্তু আয়িল্লম মূর্তিগুলির পুনর্বাসন শিবির নির্ধারিত হয়েছে গ্রামের মন্দির প্রাঙ্গণস্থ বটতলার বেদী। দলে দলে আয়িল্লম আসছে ভিটেমাটি ছেড়ে। পূজা অর্চনার ব্যবস্থা এখানে পাইকারী।

এই সর্পপূজার অধিকারিনী ছিলেন নাম্বুদিরীরা। বৈদিক কট্টরতার উপর এটা নিঃসন্দেহে লোকদেবতার বিজয় নিশান!

সর্পপূজার অধিকার ঠিক কবে থেকে নাম্বুদিরীদের একচেটিয়া হয়ে

ওঠে জানা যায় না। তবে আজকাল নায়ররাও এই অধিকার ভোগ করছে। মন্ত্রতন্ত্র, ঝাড়ফুঁক প্রভৃতিতে সাপ বশ হয় কী না, সাপের বিষ নামে কী না, এ ব্যবসায়ে যারা পুরুষাক্রমে বেশ দুপয়সা করে আসছে তারা সুনিশ্চিত ভাবে বলতে পারলেও বলে না। তবে এসব গুহ্যবিদ্যার 'মনোপলী' রক্ষার আটঘাট বাঁধা সুব্যবস্থার প্রভাব পড়ে পেশাগত ওঝা শব্দ বংশের উপাধির রূপ নেয়। কেরলেও সর্পচিকিৎসা বা সর্পপূজার জন্য বিশেষ বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত দুটি নাম্বুদিরী বংশ আছেন। এঁরা হচ্ছেন 'আমেটমংগলম' আর 'মেক্কাটু নাম্বুদিরীপাদ'।

নাম্বুদিরী সমাজের স্বজাতি বিবাহ, বহুবিবাহ আর বিজাতি বিবাহ এই তিন বিবাহ-রীতি নিঃসন্দেহে যদি প্রত্যক্ষ ভাবে নাও হয় তবু পরোক্ষভাবে নাম্বুদিরীদের পারিবারিক সম্পদ বৃদ্ধিরই এক দেশব্যাপী রাজসিক ব্যবস্থা। যথারীতি এই তিনরীতির বিবাহ ব্যবস্থার ধর্মীয় ব্যাখ্যাও আবিষ্কার করতে হয়েছিল সমাজের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্ভাব্য বিক্ষোভ যাতে রূপ নিতে না পারে সেজন্য। আপনাপন ধনসম্পদ রক্ষা এবং বৃদ্ধির কুবেরবুদ্ধির বিকাশের ফলে নাম্বুদিরী সমাজে নিঃসন্দেহে কূপমণ্ডুকত্বের বিকাশও চরমে ওঠে। নতুনকে তারা ঘৃণা করতে, সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে। কোথায় যায় আধ্যাত্মিক জীবনের মননিষ্ঠা, কোথায় যায় নতুন দেশে এসে নতুন সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনের প্রাক্কালীন তীক্ষ্ণধী মেধা!

নাম্বুদিরী সমাজ এবং তাদেরই পৃষ্ঠপোষিত জমিদার শ্রেণীর সীমাহীন লোভের সুযোগ নিয়েছিল সদ্য কেরল দখলকারী বৃটিশ রাজশক্তি। এই দুমুখী আক্রমণের চাপে পড়ে কেরলের চাষী, কুড়িয়ান, ভূমিকৃষাণ প্রভৃতি মানুষ হয়ে ওঠে বেপরোয়া। দৈন্য এবং বঞ্চনার মুখ্য কারণ খুঁজে না পাওয়ার এবং দারিদ্র্যের উৎস সূত্রের সন্ধান না পাওয়ায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আন্দোলনের রূপ ধরে তাদের ক্ষোভ ফেটে পড়ে। কেরলে তারই ফলশ্রুতি পৌনপুনিক মোপলা কৃষক অভ্যুত্থান, হরিজন

আন্দোলন, মন্দির প্রবেশধিকারের আন্দোলন। এসবের মাঝেই আবার কুরূর নাম্বুদিরীপাদ নামে জনৈক সমাজসংস্কারক নাম্বুদিরী সমাজের ভিত্তিমূল ধরেই নাড়া দিলেন বুঝি। প্রগতিপন্থী কিছু নাম্বুদিরী ত্রিচূরে 'যোগ-ক্ষেম-সভা' নামে এক সমিতি প্রতিষ্ঠিত করলেন। কুরূর নাম্বুদিরীপাদ এঁদের মধ্যমণি। তিনিই হলেন প্রধান পরিচালক। আজ থেকে কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশ বছর আগে যোগ-ক্ষেম-সভার প্রতিষ্ঠা। মূল উদ্দেশ্য কালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাম্বুদিরী সমাজকে আবার ঢেলে সাজা। যোগ-ক্ষেম-সভায় এসে সামিল হলেন অনেক দিকপাল নাম্বুদিরী। পরিচালক মণ্ডলীর অন্যতম সভ্য ছিলেন ভারতের স্বনামখ্যাত নেতা এবং স্বাধীন ভারতের প্রথম কম্যুনিষ্ট প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী কেরলের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী কমরেড ই. এম. এস. নাম্বুদিরীপাদ।

যোগ-ক্ষেম-সভার সভ্য ও বক্তারা দেশের বিভিন্ন স্থানে সভাসমিতি করে নাম্বুদিরীদের বোঝাতে থাকেন যে প্রাচীন নিয়ম কানুন, আচার অনুষ্ঠান এবং বহুযুগের সঞ্চিত জঞ্জাল কুসংস্কার যা বর্তমান যুগের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে কোনমতেই সক্ষম নয় তাই আঁকড়ে ধরে থাকলে নাম্বুদিরী সমাজের উন্নতি তো দূরের কথা দ্রুত অবনতির অতল গহ্বরে তালিয়ে যেতে হবে। সমাজের শিরোমনির আসন আজও অটল রাখতে হলে নেমে আসতে হবে, সবার নীচে সবার পিছে সবহারাদের মাঝে। সমাজের অন্যান্য মানুষকে যদি মানুষ বলে, ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির অংশ বলে স্বীকৃতি দিতে নাম্বুদিরী সমাজ এখনও ইতস্ততঃ করে, কুণ্ঠিত হয় তবে সেই সমাজই করবে নাম্বুদিরীদের একঘরে। ব্রাহ্মণেতরদের যদি মন্দির প্রবেশের, বিশ্বমাতার উপাসনার অধিকার দেওয়া না হয়, মন্দিরের গুপ্ত কুঠুরীতে যদি দেশের সম্পদকে কুবেরের মত স্তূপীকৃত করাই চলতে থাকে তবে গণনারায়ণের অভিসম্পাত নিপাত করবে পূজ্য পূজারী উভয়কেই। মহাকালের মন্দিরা শুনেও না শোনার ভাণ সামূহিক অমঙ্গলই বর্ষণ করবে।

পুঁথিতে পড়া ব্রহ্মকেই কেবল সত্য বিশ্বাস করে জগত আর জীবনকে উপেক্ষা করলে বাস্তবজগত এবং সম্ভাবনাময় জাবনের ব্রহ্মপ্রাপ্তিই ঘটবে। সাত বছর বয়স থেকে তোতাপাখীর মত ঋগ্বেদ মুখস্থ করাকেই জীবনের সার মনে করলে চলবার দিন বিগত হয়েছে অনেক আগেই। এখন শিখতে হবে ইংরাজী জানতে হবে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিকশিত বিভিন্ন শাখাকে। কর্মকে ঘৃণা করা, কর্মকে নিন্দা করার বারোশো বছরের প্রাচীন অভ্যাস ছাড়তে হবে আর নয় তো জীবন কাটবে মৃত্যুযজ্ঞের পূর্ণাহুতি হবার জন্য, কালের উপযোগিতা এবং প্রকৃত শিক্ষার অভাবে, সৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে। ভুললে চলবে না যে এ যুগটা শংকরাচার্যের নয়।

দিকে দিকে যুবক নাম্বুদিরীদের মধ্যে নতুন প্রাণের জোয়ার জাগল। জাগল নতুন উদ্দীপনা। কবিতা লেখা হল, গান বাঁধা হতে থাকল, নতুন নতুন নাটক লিখে অভিনয় হতে থাকল। সবকিছুরই বিষয়বস্তু নাম্বুদিরী সমাজের অন্ধকার দিক—বহুবিবাহ, স্ত্রীজাতির প্রতি অবিচার আর উৎপীড়ন, বৈধব্যের জ্বালা। হাজার হাজার বছরের পুরাণো ভিত ধরে নাড়া দিলে যোগ-ক্ষেম-সভা। ঝর ঝর করে ঝরে পড়ল জীর্ণ প্রাসাদের কার্ণিশ, প্লাস্টার, ছাদ, দেওয়াল। ছুড়ে ফেলে দিল হাজার হাজার বছরের পুরাণো কাঁথা, কম্বল, কলকে, কমণ্ডলু শুদ্ধিযজ্ঞের আহুতি রূপে। সুরু হল সেখানে নতুন মন্দির রচনা। নতুন তার পরিমিতি, নতুন মালমশলা, কারিগররা নতুন মন্ত্রে দীক্ষিত। টগবগে রক্ত তাদের ধমণীতে। জীর্ণ পুরাতনকে তারা কুলোর বাতাসে উড়িয়ে দিচ্ছে। কণ্ঠে তাদের মাভৈঃ মন্ত্র, বাহুতে অমিত বল, অজেয় প্রতিজ্ঞা-শুদ্ধ অন্তর!

আজ নাম্বুদিরী সমাজের সবকিছু যাচ্ছে ওলটপালট হয়ে। যে নাম্বুদিরী মেয়ে যুগ যুগ ধরে মধ্যযুগীয় মুঘল হারেমের মেয়েদের মতই থেকেছে অসূর্যস্পর্শা সেই মেয়েই আজ পুরুষদের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে জীবনের সর্বক্ষেত্রে চলেছে এগিয়ে!

শক্তিপূজার দেশ কেরল, মাতৃপূজার দেশ কেরল—এতদিনে বুঝি খুঁজে পেয়েছে তার ভদ্রকালীকে, তার দূর্গাকে !

প্রাচীনপন্থীরা কেঁপে উঠেছে আতংকে। তাদের সাজান বাগান জাগ্রত যৌবনের প্রখরতায় ঝিমিয়ে পড়ছে, শুকিয়ে যাচ্ছে। কাল-বৈশাখার প্রথম দমকায়ই তাদের তাসের প্রাসাদ লণ্ডভণ্ড। কত হিসেবনিকেশ করে নাম্বুদিরীদের জন্য অর্থকরী বিবাহ ব্যবস্থা প্রচলিত করা হয়েছিল, অর্বাচীনরা দিল সব ভণ্ডুল করে !

আজ নাম্বুদিরী ছেলেরা সবাই অর্জন করে নিয়েছে নাম্বুদিরী মেয়ে বিয়ে করার অধিকার, তাছাড়া একাধিক বিয়েতে তাদের মোটেই রুচি নেই আজকাল। যে মেয়েরা কোনদিন সাত চড়েও রা কাড়ত না আজ তাদেরই বা কী দাপট! শ্বশুরের ছোট ছেলেটির বৌ না হয়ে ভাসুর ঠাকুরের পঞ্চম স্ত্রী-রূপে বেদ ব্রাহ্মণে অচলা নিষ্ঠা রেখে স্থবির স্বামীর সেবাদাসী বা মৃতের বিধবা হয়ে জীবন উৎসর্গ করাটাই জন্মগ্রহণের উদ্দেশ্য বলে মেনে নিচ্ছে না।

যোগ-ক্ষেম-সভা আজ আর নেই কিন্তু জগন্নাথের রথের জং ধরা চাকায় সে যে গতি দিয়েছে তার ফলে কেরলের নাম্বুদিরী জনজীবন নতুন দিগন্তের সন্ধান পেয়ে সেই দিকেই ধাবিত হচ্ছে।

এখন নাম্বুদিরী জনসংখ্যার দারুণ বাড় বাড়ন্ত। টান পড়েছে গোলার ধানে। এখন বাড়ীর বড় ছেলে ব্যতীত আর সব ছেলেদের নায়ার বা অন্যজাতের মেয়ে বিয়ে করে তাকে বাড়ির বৌয়ের মর্যাদা দেবার কোনও দায় বা তার এবং তার সন্তানদের দুধ সাবু ভাত কাপড়ের কোন দায়িত্ব নেওয়ার তোয়াক্কা না রেখে কেবল মুখে –

'শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং।
নো চে দেবং দেবো ন ভবতি কুশলঃ স্পন্দিতুমপি ॥'

(শক্তি বিযুক্ত নির্গুণ ব্রহ্ম শক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে স্পন্দনেও অসমর্থ)—

আউড়েই দায় সারলে চলছে না।

শংকরাচার্য কেরলেরই সন্তান। তিনিই নারীকে বলেছিলেন, নরকের দ্বার।

বৈদিক ঐতিহ্যের ধ্বজাবাহী সমাজে পুরুষ প্রাধান্যের অমোঘ, চরম এবং নির্মম পরিণতি। এই নারীবিদ্বেষই প্রাচীন গ্রীক সভ্যতাকে পাতালগামী করেছিল, ভারতও গিয়েছিল রসাতলে।

অবশ্য একথাও বহুলাংশে সত্য যে ইতিহাসের পথভ্রষ্ট হয়ে এবং অপব্যবহারের ফলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম যখন কেরল তথা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে নির্বীর্য, নিষ্প্রাণ এবং গতিহীন হয়ে একদিকে বৈষ্ণব লোকায়ত অপর দিকে বৌদ্ধধর্মের সহজ সরল দৃঢ়মতের চাপে পিস্ট এবং চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল তখন শংকরাচার্যের দীক্ষায় অনুপ্রাণিত উদ্যোগী এবং নিরলস তরুণ পণ্ডিত গোষ্ঠি ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুত্থানের জন্য যা করেছিলেন ইতিহাসের বিচারে সেটাই ছিল বৈপ্লবিক। বৌদ্ধমতের মূলমন্ত্রে ব্রাহ্মণ্যধর্মের নামাবলী চাপিয়ে তাকে দিয়েই বৌদ্ধমতের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করিয়েছিলেন শংকরাচার্য।

জীবনযাত্রা নিশ্চিন্ত এবং জীবনধারণের উপকরণ নাম্বুদিরীদের ক্ষেত্রে অনায়াসলভ্য হওয়ায় কেরলের নাম্বুদিরী সমাজ মননশীল সৃষ্টির উল্লেখযোগ্য এক ঐতিহ্য রচনা করে। বাস্তব জীবনে চাল-নূন-জ্বালানীর চিন্তা না থাকায় পরশ্রমজীবি, উদ্বৃত্তভোগীসুলভ লোকাতীত আধ্যাত্মিক চিন্তার ধারা বেয়ে অগ্রসর হতে থাকে তাদের বাস্তব বিমুখ সৃজনীশক্তি। ভারতের কাব্যদর্শন, শিল্প, ভাস্কর্যের তালিকায় নতুন নতুন সংযোজন হতে থাকে। জীবনের সর্ব অবস্থায়ই সজীব মন সৃষ্টি করে চলে নিজেরই খোরাক মিটাবার জন্য। মনের খোরাক জোগাবার তাগিদের অনুশীলনলব্ধ ফল কাব্যসাহিত্য দর্শন প্রভৃতি। প্রাচীন শিল্প ও সাহিত্যের উৎপত্তি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় জীবনধারণের সুসংবদ্ধ সংগ্রামই ধর্ম। এই ধর্ম রক্ষার জন্য সামাজিক ধ্যানধারণা অনুযায়ী লিপিবদ্ধ বা ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ডে অনুবদ্ধ কৃত্যই শিল্প সাহিত্য। জ্যামিতি

এবং ত্রিকোণমিতির জন্মও যজ্ঞবেদীর প্রয়োজন মেটাতে। বেদের জন্মও অনুরূপ কারণে। জীবনধারণই মৌল উদ্দেশ্য। কিন্তু তারপরই ধীরে ধীরে উদ্বৃত্তভোগীদের আবির্ভাব হয়েছে এবং প্রয়োজন হয়েছে পরস্বভোগের স্বপক্ষে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। স্বরু হয়েছে কার্যকারণ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। জন্ম নিতে স্বরু করেছে নতুন নতুন দর্শনের শাখা, ধর্মমত এবং সেইসব নতুন মতকে প্রমূর্ত করতে মানুষ সৃষ্টি করেছে দেবমূর্তি মন্দির, গুহাচিত্র, কাব্যনাট্য প্রভৃতি।

জীবনের মৌলিক প্রয়োজনের অনিবার্য তাগিদই মানুষকে বাস্তবমুখী করে আর তার অভাবেই জন্ম নেয় ভাববাদী আধ্যাত্মিকতা। আধ্যাত্মিকতার নিশ্চিত পরিণতি সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি। আধ্যাত্মিকতা চোরাগলি বিশেষ। পথ তার এক জায়গায় বন্ধ হয়ে যায়। স্বরু হয় অভেদ্য প্রাচীরে মাথা কোটা অথবা পিছু হটা। তার বিকাশের সুযোগও সীমাবদ্ধ। তবুও এই সীমাবদ্ধতার মাঝেই জীবন উদ্ভাসিত হওয়ার উপকরণ খুঁজে পায়। খুঁজে পায় যতক্ষণ সে চলার সুযোগ পায় ততক্ষণই। চলমান জীবন স্বভাবসুন্দর!

কেরলের নাম্বুদিরী সমাজের বিকাশের ইতিহাস তাই অনেকাংশে কেরলের আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক ভাবধারা, কাব্যদর্শন প্রভৃতির ক্রমবিকাশের ইতিহাস।

উত্তর ভারতের মন্দিরগুলির অন্তরে তীর্থ এবং দেবতা। কিন্তু দক্ষিণ ভারত বিশেষ করে কেরলের মন্দিরগুলির অন্তরাত্মা বুঝি শিল্প এবং ধর্ম, দর্শন এবং প্রতিমা। এখানে দ্রাবিড় বৈদিক এবং পাশ্চাত্য চিন্তার মহামিলন ঘটেছে খৃষ্টজন্মেরও অনেক আগে। কেরল আত্মা এখনো মন্থন করে চলেছে গণমানসের আকাংখার সমুদ্রকে—অমৃত তার চাই-ই। সে বিশ্বাস করে 'নাল্পে সুখমস্তি'! কেরল এখনো চামচ নেড়ে চলেছে নতুন নতুন উপকরণের স্বাদ এবং সুরভিতে জনজীবনকে মহীয়ান করে তুলতে।

কাব্য শিল্প প্রভৃতি সুকুমার রচনার ক্ষেত্রেও নাম্বুদিরী সমাজের

দান কম নয়। তাদের প্রারম্ভিক জীবনের আত্মম্ভরিতা এবং গোঁড়ামীকে আজকের আলোকে পর্যালোচনা করতে গেলে ভুল করতে হবে। সেটাই হবে তাদের প্রতি, ইতিহাসের ধারার প্রতি এবং কেরলের প্রাচীন সংস্কৃতির (বর্তমান পর্যায়ে উপনীত হওয়া পর্যন্ত) বিকাশধারার প্রতি সবচেয়ে বড় অবিচার। ভুল দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে দৃষ্টবস্তুর প্রকৃত রূপ জানতে পারা সম্ভব নয়।

একথা অস্বীকার করাটাই গোঁড়ামী যে কেরল-সংস্কৃতির বিকাশ-ধারার গোমুখী ও দেশের মন্দিরগুলি। সংস্কৃত ভাষাকে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মত কেরল ব্রাহ্মণদের জন্য একচেটে করে রাখতে পারে নি। সমগ্র দেশে জেগেছিল সৃজনী শক্তির তুফান আর সেই তুফানে কৃত্রিম বাধানিষেধ সবই প্রায় গিয়েছিল ধুয়ে মুছে। গণক, বৈদ্য, বাস্তুকার প্রভৃতিরা আপনাপন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞতা লাভের জন্য সংস্কৃত পড়তেন। গণিত, আয়ুর্বেদ, বাস্তুকলায় পারদর্শিতা লাভের জন্য সেকালের সর্বোন্নত ভাষা এবং সেই ভাষাশ্রিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সহায়তা নিতেই হত। তবে বেদে ছিল নাম্বুদিরীদেরই একচেটিয়া অধিকার।

নাম্বুদিরীরা কেরলের সব সম্পদের অধীশ্বর থাকলেও তাদের জীবনযাপনধারা ছিল খুবই সরল এবং অনাড়ম্বর। মূল্যবান দ্রব্যের ব্যবহারের প্রতি কোন আকর্ষণই তাদের দৈনন্দিন জীবনে ছিল না। সম্পদ স্তূপীকৃত হত মন্দির বা তারওয়াড়ের গুপ্তকক্ষে। তারা করত লক্ষ্মীর শবসাধনা। অর্জিত অর্থ পরিণত হত কালো টাকায়। যে টাকা নতুন সম্পদ উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হতে পারত না। ফলে দেশের সাধারণ মানুষের অবস্থা হয়ে পড়েছিল উত্তরোত্তর শোচনীয়।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে অর্থবান নাম্বুদিরীদের জীবনযাত্রা এখন আর অনাড়ম্বর নয়। আজকের নাম্বুদিরীরা আর কেরলের বিশেষ সম্প্রদায় নয়। তাদের পরিচয় কেরলবাসী ভারতীয়। কেরল

তথা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের মত তাদের সুমুখেও বিশ্বনিখিল এসে দাঁড়িয়েছে দাবী নিয়ে। সে দাবী কালের দাবী, যুগের দাবী, আগামী দিনের উজ্জ্বল প্রভাতকে ত্বরান্বিত করার দাবী। সে দাবীকে একপাশে ঠেলে সরিয়ে রাখতে পারে না বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্যের স্রষ্টা নাম্বুদিরী রক্ত। মানবজাতির অগ্রগতির সুসংহত ও সংকল্পনিষ্ঠ মিছিলের তারাও আজ শরিকদার। নাম্বুদিরী যুবকের মাথার টিকি অন্তর্হিত। ট্রেন বাসের ভিড় ঠেলে স্কুল কলেজ অফিসে দৌড়াচ্ছে নাম্বুদিরী মেয়েরা, হাতের ছাতা তারা ছুড়ে ফেলে দিয়েছে স্বনিয়োজিত কূপমণ্ডুক সমাজপতিদের মুখের উপর। ছত্রহীন হাতে পথ চলতে এখন আর তাদের নেই অপমানের জ্বালা। আছে যুগযুগ সঞ্চিত বন্দীত্ব যন্ত্রণার নিরাময় উল্লাস। আজ কেরল কণ্ঠেই বিশ্বমানবতা প্রার্থনা জানাচ্ছে—

'সমানো মন্ত্রঃ সমিতি সমানী সমানং মনঃ সহচিত্তমেযাম্।
সমানং মন্ত্রিমভি মন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি ॥'

[ঋক্ ঃ ১০ ঃ ১৯১ ঃ ৩]

(মন্ত্র, সমিতি, মন, চিত্ত সবই সমান হোক। মন্ত্রণার মন্ত্রও হোক একই। একই ঘৃতে হোক তোমাদের হোম)।

এখানে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টান, ইহুদী সব হাতে হাত ধরে এক শক্তিতে দাঁড়িয়েছে প্রতিক্রিয়ার অচলায়তনকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে নতুন তৈরী সমভূমির ওপর নতুন সমাজ-ব্যবস্থার সৌধ গড়ে তুলতে। নতুন তার মালমশলা, নতুন তার স্থপতি। নাম্বুদিরী ছেলেরাও পিছিয়ে নেই, পিছিয়ে থাকতে পারে না। তারাও এখন দৌড়াচ্ছে বিশ্বের যে কোনও প্রান্তে। এজন্য কোন সমাজই তাকে ভ্রষ্টাচারী মনে করছে না। ঋগ্বেদীপ্রধান নাম্বুদিরী তারুণ্য এখন ঋগ্বেদের প্রকৃত ভাষ্য রচনায় ব্যস্ত প্রতিটি মুহূর্তে। রচিত হচ্ছে নতুন উপনিষদ।

জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে এখন আর পুরাণো 'ওতিক্কনের'

(পুরোহিত এবং গুরু) নির্দেশ মানা প্রয়োজন বোধ করছে না কেউ। নাম্বুদিরী ব্রাহ্মণ এখন আর পঞ্চাশোর্ধ্বে পৌঁছে 'স্বামীয়ারু'[১] হওয়ার কথা ভাবেন না।

নাম্বুদিরীদের জীবনেও এসেছে নতুন বর্ষার ঢল। আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে তাদের প্রাচীন ঐতিহ্যগত রূপে। অধুনালুপ্ত যোগ-ক্ষেম-সভার দুর্বার প্রভাব এবং বাস্তব জীবনের প্রয়োজন ও প্রয়োজনের তাগিদ গত বিশ পঁচিশ বছরের মধ্যে নাম্বুদিরীদের একাকার করে ফেলেছে কেরলের অন্যান্য অধিবাসীদের সঙ্গে। কেরলের শহরে বন্দরে তো বটেই ভারতের অন্যান্য অংশ বা তার বাইরেও তাদের পরিচয় যে কোনও মিঃ মেনন, মিঃ পিল্লাই, মিঃ জর্জ বা মিঃ ইসমাইলের মতই মিঃ নাম্বুদিরীপাদ, মিঃ বর্মা। তবে কেরলের কিছু কিছু সুদূর গ্রামের কথা কিছুটা স্বতন্ত্র। সেখানে এখনো চলেছে জীর্ণ বস্ত্রটুকু আঁকড়ে ধরে থাকার প্রাণান্ত প্রয়াস।

একান্নবর্তী পরিবার (তারওয়াড়) ভেঙ্গে পরিবারের যৌথসম্পদ ভাগ হয়ে যাওয়ার ফলে প্রত্যেক নাম্বুদিরীই এখন জীবনের যে কোনও ক্ষেত্রে আপন স্থান করে নিতে তৎপর। এই ব্যস্ততা, এই প্রয়োজনবোধ ব্যষ্টিকে সমষ্টিভুক্ত করে সমষ্টিকেই শক্তিশালী করছে। শত পুষ্পকে আজ আর আলাদা করে চিনে নিতে দিচ্ছে না। তারা সার্থক হচ্ছে শত পুষ্পের মাল্যের মনোহারিত্বের অন্তরে। সমাজের হৃদস্পন্দন এড়িয়ে দূরে দাঁড়িয়ে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার স্মরণাতীত কাল অবধির অভ্যাস নাম্বুদিরীদের দ্রুত কেটে যাচ্ছে। এখন তারাও

১। স্বামীয়ারু ব্যবস্থা বাণপ্রস্থেরই প্রকারভেদ। স্বামীয়ারুরা বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানীরূপে পরিগণিত হতেন। জীবনের যে কোনও ক্ষেত্রে তাঁদের বিধান ছিল সবার উপর। ত্রিচুরের ব্রহ্মস্ব মঠে এখনো কয়েকজন স্বামীয়ারু আছেন। স্বামীয়ারুরা গৃহত্যাগী কৌপীনধারী। মাথা ন্যাড়া করতেন, উপবীত ত্যাগ করতেন তাঁরা। একখানা গেরুয়া রংএর উত্তরীয় থাকত ঊর্ধ্বাঙ্গ আবরণের জন্য। সেটা উত্তরীয়ই—কোনও অবস্থাতেই তদ্দ্বারা অর্ধোঅঙ্গ আবরিত করার বিধান ছিল না।

এসে সামিল হচ্ছে গণমানসের মন্দির প্রাঙ্গণে সবার সাথে একই পংক্তিতে। নিজেদের তৈরী শৃংখল নিজেরাই কাটছে, নিজেদের তৈরী কারাপ্রাচীর নিজেরাই ভাংছে। নিজেদের তৈরী গুটিকা নিজেরাই ছিন্ন করে অনন্তমুক্তির আকাশে রঙ্গীন পাখনা মেলে ভেসে পড়ার উদ্যোগ আয়োজনে সক্রিয়।

নাম্বুদিরীদের পরই কেরল সমাজে প্রভাবশালী গোষ্ঠি নায়ার। নায়াররা ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রের মিশ্রিত রক্তে উদ্ভূত শূদ্র। নাম্বুদিরীদের সেবাদাসরূপে কেরলে এলেও কেরলে পৌছাবার সাথে সাথেই, বিজয়ী নাম্বুদিরীদের সম্পর্কে, কেরলীয় সমাজে তাদের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল নাম্বুদিরীদের পরই। সামাজিক প্রভাব প্রতিপত্তি সব কিছুতেই তাদের স্থান ছিল দ্বিতীয়। নাম্বুদিরীদের সর্বকর্মের কোটাল ছিল নায়াররা। নাম্বুদিরীদের বিষয় সম্পত্তি দেখাশুনা, রক্ষণাবেক্ষণ, দেশরক্ষা. দেশশাসনের বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে নায়াররা ছিল অপরিহার্য। রক্ষাপুরুষদের সেনাবাহিনী ছিল নায়ার সেনায় পুষ্ট এবং দুর্জয় সর্বকালেই কেরলের সেনাবাহিনীতে নায়ারদের বীরত্ব ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।

নায়াররা পরবর্তিকালে পদধিকারনির্দেশক উপাধিগুলি বংশ নির্দেশনী হিসাবে ব্যবহার করতে থাকে। আজ আমরা যে মেমন, অচ্চন, পানিক্কর, কুরুপ্পু নাম্বিয়ার প্রভৃতিদের দেখি এঁরাও নায়ার। এইসব উপাধিগুলি প্রাচীন সেনাবাহিনীর পদমর্যাদা সূচক।

নায়ারবাহিনীর বীরত্ব এবং বিক্রম ঐতিহাসিক সত্য এবং অগণ্য কিম্বদন্তীর উৎস। নায়ার বংশোদ্ভুতরা বরাবরই সুদূরের পিয়াসী। আজ নায়ার বংশোদ্ভুতদের দেখা যাবে পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে, জীবনের যে কোনও ক্ষেত্রে। শিক্ষাদীক্ষা, রাজনীতি, রণনীতি, রণবিদ্যা, ব্যবসায় বাণিজ্য, কাব্য সাহিত্য, শিল্প দর্শন—সর্বত্রই এঁরা সহজ সুন্দর ও স্বচ্ছন্দ। ইংরাজ আমলেও দেখা গেছে নায়ার সেনার

প্রভূত আদর এবং সম্মান। ভাস্কো-দ্য-গামার ভারত আগমনের বিবরণেও দেখা গেছে তৎকালীন রাজসভা থেকে সুরু করে সর্বত্র নায়ারদের প্রচণ্ড প্রভাব প্রতিপত্তি। ভাস্কো-দ্য-গামার প্রথম আগমনেই স্থানীয় ভূস্বামীর সঙ্গে একটা গণ্ডগোল বেধে ওঠে। বেশ কিছু অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটে যায় সেই সূত্রে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে ভাস্কো-দ্য-গামা কর্তৃক অন্যান্য পনেরো জন স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে ছ'জন নায়ারকে একটা নৌকা সহ বন্দী করা। এই দুষ্কর্মের সূত্র ধরে ঝাঁক ঝাঁক নৌকা বিদেশীর জাহাজ আক্রমণ করবার জন্য বন্দর থেকে বেরিয়ে এল। ভাস্কো-দ্য-গামা খবর পেলেন যে গোয়াতেও তাঁকে ধ্বংস করার জন্য সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। কালিকট থেকে গোয়া পর্যন্ত সমগ্র উপকূল ভাগে প্রত্যেকটি খাড়ি-নালা-নদীর মধ্যে পর্য্যন্ত সব নৌকায় দাঁড় খাটানো হয়েছে তাঁকে আক্রমণ করার জন্য। তখন বন্দীদের ছেড়ে দিয়ে কোন রকমে প্রাণ নিয়ে পালানো ছাড়া আর কোনও রাস্তা তিনি দেখতে পান নি। বীরবিক্রমে কেরল নৌবাহিনী তাঁকে বিতাড়িত করে দিয়ে এসেছিল গোয়ার কোল পর্যন্ত। কেরল নৌবাহিনীও ছিল নায়ার সেনায় সমৃদ্ধ।

প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত কেরল সংস্কৃতির প্রতিটি স্তরে, প্রতিটি শাখায় নায়ারদের কীর্তিস্তম্ভ। কেরলের রবীন্দ্রনাথ স্বর্গত কবি ভাল্লাত্তোল নারায়ণ মেনন, জ্ঞানপীঠ এবং সাহিত্য আকাদমী পুরস্কার বিজয়ী কবি জি. শংকর কুরুপ্পু নায়ার বংশেরই সন্তান। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন উপন্যাস 'চম্মীন' এর লেখক 'তকষি' নামে পরিচিত তকষি শিবশংকর পিল্লাইও নায়ার।

বাস্তবজীবনে নায়াররা বরাবরই একনিষ্ঠ প্রগতিবাদী। জীবনকে জীবনের ব্যবহারিক অর্থে মেনে নিতে তাদের কোনদিনই ইতস্ততঃ করতে দেখা যায় নি। নায়ার কেরলের আত্মার অঙ্গীকার, কেরলের বীর্য। আবার কেরলের বিভূতিও এই নায়াররাই।

নাম্বুদিরী এবং নায়ারদের পরই কেরলের হিন্দুদের মধ্যে ঈষওয়র আর তীয়্যরদের নাম উল্লেখ করতে হয়। পণ্ডিতদের অনুমান এঁরা আসলে কেরলের প্রতিবেশী সিংহল দ্বীপের মানুষ। এঁরাও সম্ভবতঃ চেরমন পেরুমল ভাস্কর রবিবর্মার আমলে কেরলে এসে বসতি স্থাপন করেন। কেরলে সর্বাপেক্ষা অধিক বিদেশী চেরমন পেরুমলের আমলেই সম্ভবতঃ কেরলের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান। বিচিত্র তাঁদের ধর্ম, বিভিন্ন তাঁদের আচার ব্যবহার, বৈচিত্র তাঁদের পেশায়। সিংহল দ্বীপের এই ঈষওয়র এবং তীয়্যররাও তার ব্যতিক্রম নন। তাঁদের ছিল নারিকেল চাষে ঐতিহ্যগত নিপুণতা এবং পুরুষানুক্রমিক অভিজ্ঞতা। কেরলের অনুকূল জলহাওয়ায় তাঁরা আপন পেশায় পুনর্বসিত হওয়ার প্রচুর সুযোগ পেয়েছিলেন এবং পুনর্বসিত হয়েও ছিলেন। হয়ত আদর্শ শাসক চেরমন পেরুমল দেশের উন্নতির জন্য এঁদের কেরলে এসে বসতি স্থাপনে উৎসাহিত করেছিলেন, তাঁদের উপনিবেশ স্থাপনের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। স্বর্ণপ্রসূ কেরলের মাটিতে তাঁরা আত্মীয়তার আহ্বান শুনেছিলেন। এককালে নারিকেল চাষকে কেন্দ্র করেই ছিল এঁদের জীবিকা। আজও এঁদের উপজীবিকা নারিকেল চাষ। অতি সুস্পষ্ট কারণেই উপজীবিকার অন্যান্য ক্ষেত্রেও এঁরা প্রবেশ করেছেন। সংখ্যায় ঈষওয়র আর তীয়্যররা নায়ারদের চেয়েও বেশী। ঐশ্বর্যশালী এবং বিদ্বান লোকের অভাব নেই এঁদের মধ্যে। শিক্ষা প্রভৃতির ক্ষেত্রেও এঁরা কেরলের জনসংখ্যার আনুপাতিক হিস্যাদার।

ধীবর সম্প্রদায় কেরল জনসংখ্যার এক উল্লেখযোগ্য অংশ। আরব সাগরের বুক থেকে মাছ ধরা, শুকানো এবং রপ্তানী করাই এদের মুখ্য পেশা। পেশার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই সুদীর্ঘ উপকূলভাগে এদের বেশীর ভাগই বাস করে। কেরলের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে এরাও শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমানে সমান ধাপে এগিয়ে চলেছে। এদের মধ্যেও হচ্ছে দ্রুত শিক্ষা বিস্তার। অশিক্ষার অন্ধকার কেরল থেকে ঝাঁপ দিতে চলেছে

আবার সাগরের অতল গহ্বরে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে কেরলে দ্রুত সার্বজনিক শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে, দেশে মাতৃভাষা মালয়ালম শিক্ষার প্রবর্তনের ক্ষেত্রে গীর্জার দান অনেকখানি। গীর্জা কর্তৃপক্ষই সর্বপ্রথম কেরলে পাঠশালা জাতীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় খুলে ধর্ম সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল শিশুর পক্ষে মালয়ালম এবং ইংরাজী শিক্ষালাভ সম্ভব করে তোলেন। হতে পারে তাঁদের এই শিক্ষাসত্র খোলার পিছনে সাধারণ্যে ধীরে ধীরে খৃষ্টধর্ম প্রসার করাই উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু একথা কেউই বোধ হয় অস্বীকার করবেন না যে খৃষ্টান মিশনারীদের আগে কেরলে কেউ কোনদিন সার্বজনিক বিদ্যালয় খোলার কথা ভাবেন নি। খৃস্টান মিশনারীরা এই সব বিদ্যালয় খোলার ফলে দেশের সাধারণ মানুষ মাতৃভাষা শিক্ষার সহজ সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইল না। গীর্জা সংলগ্ন শিক্ষায়তনগুলি ভরে উঠল সর্বধর্ম এবং সম্প্রদায়ের বিদ্যার্থীতে। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই সাধারণ মানুষের মধ্যে গীর্জা পরিচালক মিশনারীদের প্রভাব বিস্তার লাভ করতে আরম্ভ করল। আর তাই লক্ষ্য করে রাজা মহারাজা এবং সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিরাও গীর্জার অনুকরণে মালয়ালম এবং ইংরাজী শিক্ষার বিদ্যায়তন খুলতে থাকেন। বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনার জন্য বিভিন্ন সমিতিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানও গড়ে ওঠে নানাস্থানে। আজ কেরলে বিদ্যালাভের হরিহরছত্র মেলা। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক। ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারী অনুযায়ী কেরলের জনসংখ্যার শতকরা ৫৪.১৮ ভাগ এবং মেয়েরা শতকরা ৩৮.৪৪ ভাগ শিক্ষিত। ভারতের যে কোনও প্রদেশ এবং পৃথিবীর বহু তথাকথিত উন্নত রাষ্ট্রের শিক্ষার হার এর চেয়ে অনেক কম।

পেরুমলরা নির্বাচিত হতেন পাশের তামিলভাষী অঞ্চলের ক্ষত্রিয় রাজাদের মধ্য থেকে। পেরুমলদের আমলে তাই পাশের তামিল ভাষী অঞ্চলের বহুলোক কেরলে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস সুরু করে। তাঁদের বংশধররাও রয়েছেন কেরলে। কেরলের মোট জনসংখ্যায়

তাঁদের হারও বড় কম নয়। এঁরা তুলু বা কন্নড় ভাষায় কথাবার্তা বলেন। সমাজের সর্বক্ষেত্রে পেশাগত কারণে এঁদের দেখা যায়। তবে মজদুরী কৃষি এবং ব্যবসায়ই এঁদের মূল উপজীবিকা। কালের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এঁরা কেরলের অন্যান্য অধিবাসীদের মতই জীবনের এবং জীবিকার সর্বক্ষেত্রে, সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ছেন।

কেরলে দেখা যায় পর্তুগীজদের ধর্মান্ধ অত্যাচারের শিকার গোয়া প্রভৃতি অঞ্চলের উদ্বাস্তু কংকনী ব্রাহ্মণদের। পর্তুগীজ অত্যাচারের ফলে যখন আপন ধর্মকর্ম বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল তখন এঁরা নেমে এলেন কেরলে। কেরলের বিভিন্ন বন্দরে এই সব উদ্বাস্তুদের বহন করে অর্ণবপোত এসে নোঙ্গর করতে থাকল। স্থলপথেও এলেন অনেকে। তদানীন্তন হিন্দু জামোরীনরা তাঁদের সাদরে অভ্যর্থনা করলেন, তাঁদের বসবাসের জন্য প্রচুর জায়গা দান করলেন। তাঁদের জন্য আলাদা মন্দির তৈরী হল, মন্দিরের ব্যয়ভার বহন করতে লাগল জামোরিনদের রাজকোষ। ক্রমে এইসব কংকনী ব্রাহ্মণরা ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতিও করতে থাকেন। এঁরাও কেরল জনসংখ্যার এক উল্লেখযোগ্য হিস্যাদার।

এতক্ষণ কেরলের হিন্দুদের সম্পর্কে একটা স্থূল রেখাচিত্র আঁকবার চেষ্টা করা হল এবার অন্যান্যদের সম্বন্ধে দুকথা বলে কেরলের অধিবাসীদের সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করে নিতে চেষ্টা করা যাক। ভারতের সবচেয়ে ঘন বসতিপূর্ণ প্রদেশ কেরল প্রকৃতির শোভায় যেমন বিচিত্র তেমনই বৈচিত্র্য তার অধিবাসীদের আচার বিচার ধর্মে কর্মে। তবুও জীবনের মৌলিক আবেদনে তারা সাড়া দিতে পারে একযোগে।

আন্তর্জাতীয়তার মৌলিক প্রাথমিক সর্ত সুস্থ জাতীয়তাবাদ। সুস্থ জাতীয়তাবোধহীন মানুষ আন্তর্জাতীয়তার নাগাল পায় না। মালয়ালীদের জাতীয়তাবোধ ধর্ম সম্প্রদায়ের কাঁটাবেড়া ডিঙ্গিয়ে আন্তর্জাতীয়তার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট আসনের অধিকারী।

আরবরাই যে কেরলে আগত প্রথম বিদেশী এ বিষয়ে আজ আর কোনও সন্দেহই নেই প্রায়। খৃষ্ট জন্মের বহু শতাব্দী আগে থেকেই কেরল তার উৎপন্ন সামগ্রী বহির্বিশ্বে রপ্তানী করে এসেছে। কেরলের বহির্বাণিজ্য চলত আরব ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে। পরে গ্রীক রোমান এবং ফিনিশীয়রা ঐ একই স্বার্থে আরবদের অনুসরণ করে কেরলে এসে পৌঁছায়। প্রাচীন কেরল ছিল এলাচ, লবঙ্গ, দালচিনি গোলমরিচ, আদা প্রভৃতি মশলা এবং হাতীর দাঁত ও চন্দন কাঠের জন্য প্রসিদ্ধ। কেরলের উৎপন্ন দ্রব্যের পশরায় জাহাজ ভরে নিয়ে মিশর গ্রীস প্রভৃতির বাজারে পৌঁছে দিত আরব ব্যবসায়ীরা। প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম পীঠস্থান মিশর এবং গ্রীসে তখন ঐ সব মশলার প্রচুর সমাদর।

সুদূর আফ্রিকা বা ইউরোপের ঘাট থেকে নোঙ্গর তুলে কেরলের বন্দরে বন্দরে নোঙ্গর ফেলত ব্যবসাদারদের বাণিজ্য বহর। তাছাড়াও হয়ত সিন্ধু সভ্যতার মহাপীঠ মাহেন-জো-দারো এবং হরপ্পার পথ চেয়ে ভারতের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তের এই অঞ্চলটিতে নেমে আসত আরব ব্যবসায়ীদের ক্যারাভ্যান। কেরল ছিল তখনকার মধ্য এশিয়ার মানুষের কাছে সুপরিচিত সমৃদ্ধ স্থান। তখনকার দিনে ইউরোপ আফ্রিকায় 'মেড ইন ইন্ডিয়া' এই পরিচয়টুকুই আগমার্ক এবং শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক। ইন্ডিয়ায় ছিল লক্ষ্মীর আঁচল বিছানো আবার এই ইন্ডিয়াই ছিল কুবেরের ধনাগার। পৃথিবীর সব স্বর্ণ মণিমুক্তা এসে ভারতে জড় হত তারপর আশ্রয় নিত অন্ধকারে। তারা আর সূর্যের মুখ দেখত না কোন দিনও। যুগ যুগ ধরে স্তূপাকারই হত শুধু।

ইস্রায়েলে ইহুদীদের দ্বিতীয় সিনাগগ ধ্বংস হওয়ার পর ধর্ম এবং প্রাণ দুটোই বজায় রাখার তাগিদে ৬৮ খৃঃ অব্দে বহু ইহুদী উদ্বাস্তু এসে নোঙ্গর করে কেরলের বন্দরে। ইহুদীরা যখন আপন জন্মভূমি চিরকালের জন্য ছেড়ে ভারতভূমির উদ্দেশ্যে জাহাজে পাল খাটিয়ে দিয়েছিল তখন নিশ্চয়ই তাদের মনে বদ্ধমূল বিশ্বাস ছিল যে ভারতে তারা পাবে সম্মানিত আশ্রয়, উদার আতিথ্য। কেরলের

মানুষের পরধর্ম সহিষ্ণুতার খবর পৌঁছে গিয়েছিল তদানীন্তন সভ্য জগতের দিকে দিগন্তরে, এই দিনটির অনেক যুগ আগেই নাবিক, সদাগর এবং তাদের কর্মচারীদের মারফত। নিশ্চিন্ত আশ্রয় সম্বন্ধে, নিরুপদ্রবে স্বধর্ম পালন এবং জীবনযাপন সম্পর্কে কতটা নিশ্চিন্ত থাকলে আজ থেকে প্রায় দু হাজার বছর আগে হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার সহ চিরকালের মত জন্মভূমি ত্যাগ করে সম্ভাব্য আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে ভেসে পড়া যেত তা আজকের দিনে কল্পনা করাও সহজ নয়। কট্টর ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুগামী এবং নাম্বুদিরী প্রধান কেরল একে একে ইহুদী, খৃষ্টান, ইসলাম, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্মকে সাদরে আপনভূমিতে সম্মানিত আসন প্রদান করতে ইতস্তত করে নি। পঞ্চম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত কেরলের কোটংগল্লুর বন্দরের আশেপাশের অঞ্চল জুড়ে ছিল ইহুদীদের আপন রাজত্ব। সেখানে তাদের মধ্য থেকেই তারা নিজেদের শাসক পর্য্যন্ত নির্বাচিত করত।

ইহুদী উদ্বাস্তুদের প্রথম দলটি এসে পৌঁছেছিল মালাবারের ক্র্যাংগনোর বন্দরে। প্রথম দল এসে কেরলে পুনর্বাসিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইহুদী উদ্বাস্তুদের বন্যা নেমে এল কেরলে। সারা ইয়োরোপ এবং মধ্য এশিয়া থেকে এই ধারা বহে এল অনেকদিন পর্যন্ত। ইহুদীরা এল আরব, সিরিয়া, বাগদাদ থেকে—এল রাশিয়া, জার্মানী, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড থেকে।

কালে কেরলের ইহুদী সম্প্রদায় এতই প্রতিষ্ঠিত এবং বিখ্যাত হয়ে ওঠে যে ইহুদী কবি জুডা হালভে একাদশ শতাব্দীতে কেরলের ক্র্যাংগনোর বন্দরে এসে পৌঁছান। ক্র্যাংগনোর বন্দরই প্লিনীর 'প্রাইমম এম্পোরিয়ম ইণ্ডিয়া'—মুজিরিস বন্দর। এই বন্দরে বিদেশী জাহাজ এসে ভিড়ত সোনা ভরে নিয়ে ফিরত গোলমরিচ, এলাচ, দালচিনির সওদা নিয়ে, হাতীর দাঁতের পসরা ভরে।

ইহুদীরা কোচিনে সিনাগগ (মন্দির) তৈরী করে। চেরমন পেরুমল ভাস্কর রবি বর্মা তাদের বন্দরের শুল্ক আদায়, বংশ পরম্পরায়

পালকী ব্যবহার করার অনুমতি এবং অন্যান্য কর আদায়ের সুবিধা সহ ৭২ দফা সুযোগ সুবিধা যে দিয়েছিলেন এমন প্রমাণও পাওয়া গেছে। ইহুদীরা ক্রমে ক্রমে কোচিন রাজ্যের অনেক অঞ্চল জুড়ে আপন পত্তনী কায়েম করে। এর্ণাকুলম, ওয়েনট (ত্রিবাংকুর), পেরুর প্রভৃতি স্থানে তাদের সিনাগগের চূড়া মাথা তুলে ভারতের আকাশ থেকে মানবতার শ্বাস নিয়ে হাঁফ ছাড়ে। কিন্তু পর্তুগীজ বোম্বেটেদের জাহাজ এসে ভারতে নোঙ্গর ফেলার কিছুদিন পরই শান্তিপ্রিয় এবং নিরুপদ্রব ইহুদীদের উপর নেমে আসে ধর্মধ্বজী গোঁড়ামীর নিষ্ঠুর মুষল। আবার চঞ্চল এবং ত্রস্ত হয় ইহুদীরা। কোচিনের ইহুদীদের শান্তির নীড়ে পড়ল বাজপাখীর ছোঁ। কোচিনের সিনাগগ ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয় পর্তুগীজ বোম্বেটেরা। খৃষ্ট ধর্মের দোহাই দিয়ে পর্তুগীজরা ইহুদীদের ঘরদোর ভেঙ্গে তছনছ করে পথে বার করে দেয়। তবে ১৬৬২ খৃঃ অব্দে ইতিহাসের চাকা ঘোরে। ডাচেরা এসে উপস্থিত হয় কোচিনে। বাজারের জন্য লড়াই সুরু হয়। অমৃতভাণ্ড নিয়ে আসুরিক মত্ততা। আর এই মত্ততার মাঝেই ইহুদীরা খুঁজে পায় প্রত্যক্ষ শত্রুকে দমন করার সিধা পথ। তারা সাগরপারের দুই বিদেশী শক্তির দ্বন্দ্বে ইন্ধন জোগায় ডাচদের পক্ষে খোলাখুলিভাবেই। তারা পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে ডাচদের সাহায্য করে। আবার নতুন সিনাগগ মাথা তোলে কোচিনের আকাশে। সেটা ১৬৬৪ খৃঃ অব্দের কথা।

নদী যত দীর্ঘ পথ চলে ততই বেশী ক্লেদ তার ধারায় মিশ্রিত হওয়ার সুযোগ করে নেয়। ইহুদীদের বেলায় এর ব্যতিক্রম হয়নি। নিশ্চিন্ত অনুকূল পরিবেশের মধ্যে থেকেই একদিনের বিপ্লবী চেতনা ধীরে ধীরে প্রতিক্রিয়ার কোলে ঢলে পড়ে। সব ধরণের গতিরই একটা প্রবণতা আছে গতিহীনতার অন্ধকূপমুখা। সেই প্রবণতার প্রভাবই আজকের বিপ্লবীকে আগামীদিনের জঘন্য প্রতিবিপ্লবী করে তুলতে পারে। অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা এবং সামাজিক প্রতিপত্তি একচেটে করে রাখার জন্য বংশধারার মাহাত্ম্যকীর্তনের আবির্ভাব। মহাভারতের

কর্ণ বলেছিলেন, দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তং হি পৌরুষম্। কিন্তু এই দৈবায়ত্ত জন্মই ভবিষ্যৎ জীবনের ধারাকে নির্দিষ্ট করে আসছে আজ পর্যন্ত। কৌলিন্য নির্দিষ্ট করে চলেছে এই জন্মই। কুলীন অকুলীন, শ্বেতকায় অশ্বেতকায়, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য, হিন্দু মুসলমান, উচ্চকুলোদ্ভব নীচকুলোদ্ভব, ব্রাহ্মণ হরিজন—আরো কত হাজার ধরণের বিভেদ। ইহুদীদের মধ্যেও এই কাসুন্দী কম ঘাঁটা হয়নি। সেখানেও শ্বেতকায় এবং অশ্বেতকায় দ্বন্দ্ব মাথা চাড়া দিয়ে উঠে ফুলে ফলে কদর্যরূপ পরিগ্রহ করে। রংএর লড়াই—চামড়ার বর্ণের লড়াই। সাদা আর কালো। এছাড়াও আর একটা মধ্যপন্থী দল আছে। তাদের বলা হয় মেস্যুয়ারোরিম। কবর নিয়ে ঝগড়া, ঝগড়া মন্দির নিয়ে। এরা বলে, ওরা নাস্তিক। ওরা বলে, বললেই হোল! তাহলে তোরা কী?

প্রগতিশীল চিন্তাধারার প্রসারের সাথে সাথে কেরলের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত ইহুদীদের মধ্যে থেকেও এই আদিম অন্ধকার কেটে যেতে সুরু করেছে।

কেরলের ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইহুদীদের হিস্যা অনেকখানি। ইহুদীরা সাধারণতঃ সম্পদশালী। কেরলের বিভিন্ন বন্দর থেকে পাল তুলে ভারত মহাসাগর, বঙ্গোপসাগর, আরব সাগর যে সব জাহাজ চষে বেড়াত সেগুলোর মালিক এককালে ছিল এই ইহুদীরাই। আর সেই সব জাহাজের মধ্যে এমন অনেকগুলি ছিল আকৃতি এবং ঔৎকর্ষে যার তুলনা তদানীন্তন ইউরোপেও মিলত না।* সে সব জাহাজ তৈরী হত দাক্ষিণাত্যেরই বন্দরে ভারতীয় কারিগরদের দক্ষকুশল হাতে।

ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইহুদীদের আছে সহজ দক্ষতা। বিদেশী

---

* "A Sixteenth Century Italian noted that some of the ships built in the Deecan ports were longer than any in Europe........"

H. N. Mukherjee—"India's struggle for freedom" pp 14.

ব্যবসাদারদের সঙ্গে মেলামেশা এবং লেনদেনে এদের ছিল অপূর্ব নৈপুণ্য। ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এজেন্ট রূপে কেরলে ইহুদীরা ছিল অপরিহার্য। এদের বিভিন্ন ভাষায় দখল ছিল। অপরের রুচি এবং সংস্কৃতি এদের ব্যবসায়ের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে নি। এরা খানদানী ব্যবসাদার।

কেরলবাসী ইহুদীরা মালয়ালম ভাষাভাষী। পোষাক আষাকের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট কারণেই পাশ্চাত্তের ঢেউ লেগেছে।

বর্তমানে কেরলে ইহুদীদের তিনটি সম্প্রদায়ের মিলিত লোক সংখ্যা হাজার পাঁচেকের মত কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর সুরুতে এই সংখ্যা ছিল প্রায় ষোল হাজার। নতুন ইস্রায়েল লোকতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর ঘরের ছেলেমেয়েরা ঘরে ফিরেছে। ফিরেছে প্রায় দুহাজার বছর প্রবাস যাপনের পর। তারা গেছে বটে কিন্তু কেরল ইতিহাসের কয়েকখানা পৃষ্ঠা তাদের স্মরণ করবে। স্মরণ করবে যেমন ঘর ছাড়া ভাইকে ভাই স্মরণ করে, যেমন ঘরের মেয়েকে শ্বশুর ঘরে পাঠিয়ে সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে আসতে দেখলেই মা স্মরণ করে। প্রার্থনা করবে, অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু।

ইহুদীদের অনেক আগে কেরলে এসেছিল আরবরা।

খৃষ্ট জন্মেরও অনেক আগের ঘটনা এটা।

সে সময়ে ফিনিশীয় এবং আরবরা মশলার ব্যবসার সূত্র ধরে আফ্রিকা ইয়োরোপ এবং মধ্য এশিয়াকে, সেখানকার সভ্যতা এবং কৃষ্টিকে ভারতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। জাহাজঘাটেই হয় পূর্ব আর পশ্চিমের শুভদৃষ্টি।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আরবীয়রা কেরলের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য চালাছিল। একটা সৌহার্দ্রের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এই উভয় অঞ্চলের লোকেদের মধ্যে এই উপলক্ষে। সেদিনকার বাণিজ্য খুব সম্ভবতঃ জল এবং স্থল উভয় পথেই চলত। কারণ সিন্ধু সভ্যতার যুগেই

পশ্চিম এবং উত্তর পশ্চিম ভারতের সঙ্গে মধ্য এশিয়া এবং ইয়োরোপের যোগাযোগ ছিল এমন বিশ্বাস সৃষ্টি হওয়ার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান রয়েছে। সিন্ধু সভ্যতার যুগে মাহেন-জো-দারোয় গোলমরিচ এলাচ প্রভৃতি মশলা ব্যবহারের নিদর্শন নাকি পাওয়া গেছে। এছাড়া ভাষা এবং লিপির দিক থেকেও পণ্ডিতরা দাক্ষিণাত্য এবং আর্য্যাবর্তের তদানীন্তন ঐক্যের বেশ কিছু নজীর খুঁজে পেয়েছেন। আজ নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয় আরবীয়রা কেরলে স্থলপথে অথবা জলপথে সর্বপ্রথম আসে। এ সম্পর্কে পরবর্তিকালে অনেক কিম্বদন্তীর সৃষ্টি হয়েছে। তবু একথা কতকটা অবিসম্বাদিত সত্য যে ইয়োরোপের অধিকাংশ ভূভাগ যখন অসভ্যতার অন্ধকারে অচেতন তখন কেরল ভূমিতে সভ্যতার সূর্য পূর্ণজ্যোতিতে ভাস্বর।

আরবদের মধ্যে ইসলাম ধর্ম নতুন প্রাণবন্যা নিয়ে আবির্ভূত হয়। নতুন বেশে নতুন নতুন দেশে আরবরা বহে নিয়ে যায় সদ্যজাত ঐশলামিক রাষ্ট্র এবং ধর্মমতের বিজয় বৈজয়ন্তী। আরব জাহানের নতুন যাত্রা সুরু হয়। যদিও এই যাত্রা প্রায় সব ক্ষেত্রেই হয়েছে রণজয়ীর বেশে তবু অন্ততঃ একটি ক্ষেত্রে ইসলাম মুক্ত তরবারীর ঝলসানীতে ত্রাস সৃষ্টি করে, ঘোড়ার খুরের ধূলায় আকাশ আচ্ছন্ন করে হাজির হয় নি। আর সেটাই হচ্ছে কেরল। কেরলে ইসলাম ধর্ম সরাসরি আরব থেকে সমুদ্র ডিঙ্গিয়ে আসে। পরবর্তি মোগল যুগের কাহিনী এখানে অবান্তর কারণ সে অনেক পরের ঘটনা এবং মোগলের দক্ষিণ ভারত অভিযান দিল্লীর তখত্-এ-তাউস্ এর দক্ষিণভারতের দিকে সাম্রাজ্যবাদী থাবা প্রসারণেরই দৃষ্টান্ত। আর সে থাবা কোনদিনই দাক্ষিণাত্যে গভীর ভাবে দাগ কাটতে পারে নি। তবুও মোগলদের দক্ষিণ-ভারত অভিযানকে ব্যাপকার্থে বৈদেশিক আক্রমণ বলে চিহ্নিত করা ভুল হবে। মোগলরা ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের পর নিজেরাই তো মনে প্রাণে ভারতীয় হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য ভারতীয় নামে কোন জাতি তখন ছিল না যদিও

সমগ্র দেশটাকে ভারতবর্ষই বলা হত। ভারতীয় জাতীয়তাবোধের উদ্ভব অনেক পরে—ইংরাজদের ভারত অধিকার পুরাপুরী কায়েম হওয়ার পর।

কেরলে ইসলাম ধর্মের প্রথম প্রবেশ সম্পর্কে নানামুনির নানা মত। 'কেরলোলপতির' বিবরণ অনুযায়ী শেষ চেরমন পেরুমলের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের সাথে সাথেই কেরলে ইসলাম ধর্ম প্রবেশ ও প্রসারলাভ করে। কেরলোলপতির সাক্ষ্য অনুযায়ী, শেষ চেরমন পেরুমল ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তীর্থ পর্য্যটনে মক্কা যান এবং হজরত মুহম্মদের আশীর্বাদ লাভ করেন। দেশে ফিরে আসবার পথে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং আরব্য উপকূল নগরী 'শহর মুখ্‌ল্' এ মারা যান। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর উত্তরাধিকারীদের কাছে আবেদন জানিয়ে যান যেন তাঁরা কেরলে ইসলাম ধর্ম প্রচারের সব সুযোগ সুবিধা করে দেন। কেরলে ইসলাম ধর্ম প্রচারের ভার দিয়ে যান জনৈক মুসলমান দরবেশ মালিক-বীন-দিনার এর ওপর।

অনুমানিক ৮৩৯ খৃঃ অব্দে মোল্লা মালিক-বীন-দিনার এসে কেরলে পৌঁছান এবং তদনীন্তন কেরলাধিপতিরা তাঁকে ইসলাম ধর্ম প্রচারের সবরকম সুযোগ-সুবিধা করে দেন। তাঁরা কোটংগল্লুরে একটি মসজিদ তৈরী করিয়ে দেন এবং মসজিদের পরিচালনার সব ব্যয়ভারও বহন করতে থাকেন।

তবে কেরলোলপতির চেরমন পেরুমলের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কাহিনী ধোপে টেঁকে নি। শেষ চের সম্রাটদের রাজত্বকাল যে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে শুরু হয়েছিল এসম্বন্ধে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। কিন্তু হজরত মুহম্মদ দেহত্যাগ করেন খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে। সুতরাং শেষ চেরমন পেরুমলের সঙ্গে হজরত মুহম্মদের প্রত্যক্ষ সাক্ষাতকার নিঃসন্দেহে কল্পিত কাহিনী।

লোগান তাঁর 'মালাবার ডিস্ট্রিক্ট ম্যানুয়াল' এ বলেছেন যে সোলেমান নামক এক আরব ব্যবসায়ী খৃষ্টীয় ৮৫১ খৃঃ অব্দে কেরলে

তাঁর বাণিজ্য বহর নিয়ে আসেন। তিনি কেরলে কোন মুসলমান দেখেন নি। তুহ্ফাতুল মুজাহিদীর লেখকও কেরলোলপতির গল্পটা ধর্তব্যের মধ্যেই আনেন নি। বিখ্যাত পর্যটক ইবন বতুতা বহুদিন কেরলে বাস করে গিছলেন কিন্তু তাঁর কেরল বা কেরলের মুসলিম অধিবাসী সম্পর্কিত বিবরণীতেও কেরলোলপতির গল্পের ধারকাছ দিয়েও যান নি।

তবে একথা নিশ্চিত রূপ প্রমাণিত হয়েছে যে কেরলের সামন্ত রাজাদের কোনও একজন ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন এবং মক্কায়ও গিয়েছিলেন। মক্কা থেকে ফেরার পথে তাঁর মৃত্যু হয়। শহর মুখ্‌ল্‌ এ যে কেরল নরেশের কবরের ক্ষোদিত বিবরণ থেকে এ তথ্য জানা যায় তা শেষ চেরমন পেরুমলের কবর নয়, এই সামন্ত রাজার কবর।

প্রাপ্ত তথ্য থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে ইসলাম ধর্ম কেরলে ১৫০ হিজরীতে আবির্ভূত হয়। গজনীর ভারত অভিযানের প্রায় দুশো ত্রিশ বছর আগের ঘটনা এটা।

কেরলে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসার হিন্দু রাজা এবং সমাজ-নেতাদের সপ্রশ্রয় আনুকুল্যেই চলতে থাকে। বহু হিন্দু ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। ভারতের প্রথম মসজিদ তৈরী হয় কোটংগল্লুরে হিন্দু রাজাদের অর্থানুকুল্যে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে কোটং-গল্লুরই হিন্দু ইসলাম এবং খৃষ্ট ধর্মের ত্রিবেণী সঙ্গম ঘটিয়েছে ভারতের মাটিতে। কোটংগল্লুরেই ভারতের প্রথম গীর্জাও প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দু রাজার অর্থে মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ারও কয়েক শতাব্দী আগে, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতেই।

ভারতের প্রাক বৃটিশ ইতিহাস বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষের মধ্যে সম্প্রীতির ইতিহাস। রাজ্যের ভাঙ্গাগড়া, সিংহাসনের মালিক বদল কোন কিছুই সাধারণ মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করতে পারে নি। কারণটা অর্থ নৈতিক। রাজা রাজড়ার উত্থান পতনে সাধারণ মানুষের

অর্থনৈতিক কাঠামোর বিশেষ ইতর বিশেষ হয় নি ইতিপূর্বে কখনও। ফলে তাদের মধ্যে প্রতিবেশী সুলভ সৌহাদ্রের্রও অভাব ঘটে নি। কেরলেও হিন্দুদের সঙ্গে খৃষ্টান মুসলমান এবং ইহুদীদের বসবাস তাই সার্বজনিক সাম্প্রদায়িকতার বিষদুষ্ট হতে পারে নি ইংরাজ শাসনের শেষ প্রহরের আগে পর্যন্ত। মুসলমানরা ছিল আরব আগত এবং ধর্মান্তরিত দেশীয় এই দুই শ্রেণীর। কিন্তু তাদের বিচ্ছিন্ন ভাবে চিহ্নিত করার কোন প্রয়োজনই দেখা দেয় নি কোনদিন। আরবাগত মুসলমানরাও কালে কেরলবাসীই হয়ে গিয়েছিলেন এবং ক্রমে বৈবাহিক সম্পর্কের প্রসাদে একদেহেই লীন হয়েছিলেন দেশীয় মুসলমানদের সঙ্গে। কেরলে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রভাব বরাবরই উচ্চাসনের দাবীদার। হিন্দু সামুতিরীদের (জামোরিন) সভায়ও ছিল তাদের অখণ্ড প্রতিপত্তি এবং সম্মান।

কেরলে ইসলাম ধর্ম প্রসারের মূলে ছিল চেরবংশীয় রাজাদের প্রত্যক্ষ সহায়তা। এ থেকে অন্ততঃ এইটুকু বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে কেরলে ধর্মীয় বৌদ্ধিক দ্বন্দ্ব থাকলেও তা সেদিন গোঁড়ামীর পর্য্যায়ে নেমে যায় নি। ধর্মীয় বৌদ্ধিক দ্বন্দ্ব সীমাবদ্ধ ছিল মুষ্টিমেয়ের মধ্যেই। দেশের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে সে দ্বন্দ্বের কোন প্রভাবই ছায়া বিস্তার করতে পারত না। একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে হিন্দুধর্মের ধ্বজাবহনের অধিকার যাদের হাতে ছিল সেই মুষ্টিমেয় সমাজপ্রধানরা সরাসরি নিজেদের গায়ে আঁচ না লাগা পর্যন্ত স্বীয় ধর্মের দার্শনিক ব্যাখ্যাকে জটিল থেকে জটিলতর করার কাজেই নিজেদের ব্যাপৃত রাখতেন। এদিকে হিন্দু জনসাধারণ ধর্মকে নিত্য নূতন পরিবেশানুগ ব্যবহারিক রূপ দিয়ে থাকেন। হিন্দু ধর্মের দেশাচার এবং লোকাচার তাই এত বিভিন্ন, এত বর্ণাঢ্য। হিন্দুধর্ম সাধারণ্যে প্রবহমান নদীর মত। গ্রহণ বর্জনের পরিমিতিবোধ সাধারণের জীবনে পরধর্ম সহিষ্ণুতা, এবং জীবন থেকে বাস্তব শিক্ষা-লাভের দাক্ষিণ্যই হিন্দুধর্মকে বিশ্বের ধ্রূপদী সংস্কৃতির পর্যায়ে নিয়ে যেতে

সক্ষম হয়েছিল। যা হতে পারত পণ্ডিতের কচকচি ভরা নিরস দুর্বোধ্যতা তাই হয়েছিল সাধারণের জীবনে প্রাণের স্পন্দন, রূপরসের প্লাবন।

কেরলের ইতিহাস ঘাঁটলে মুসলমান ধর্ম প্রসারের এমনই এক চমকপ্রদ খবর মেলে যা পৃথিবীর অন্য কোনও ধর্ম প্রসারের ক্ষেত্রে কল্পনা করাও সম্ভব নয়। কোষিকোড বা কালিকটের হিন্দু রাজাদের সৈন্যদলে মুসলমান (মোপলা) সৈন্যরা বীরত্ব আনুগত্য রণনৈপুণ্য প্রভৃতি গুণের জন্য এতই নির্ভরযোগ্য ছিল যে কোন এক রাজা আইন করে দিছলেন যে হিন্দু ধীবর সম্প্রদায়ের প্রতিটি পরিবারের অন্ততঃ দু' একজন পুরুষ সন্তানকে ছেলেবেলা থেকেই মুসলমান হতে হবে। কারণ স্থলযুদ্ধে যেমন নায়াররা জলযুদ্ধে তেমনই মোপলা নৌসেনারা ছিল দুর্ধর্ষ, রণকুশলী এবং দুর্জয় আর তাই অপরিহার্য। কালিকট জেলায় তাই বোধ হয় মুসলমান জনসংখ্যার হার শতকরা চল্লিশ। কেরলের কোন জেলায়ই মুসলমান জনসংখ্যার হার এত বেশী নয়।

পরবর্তী যুগে ভাস্কো-ড্য-গামা যখন কালিকট বন্দরে এসে পৌঁছায় তখন স্থানীয় সমাজ এবং রাজসভায় মুসলমানদের অগাধ প্রতিপত্তি। জনসাধারণের মধ্যে মুসলমান অধিবাসীরা বিশেষ সম্মান-ভাজন অংশ। স্থানীয় অধিবাসীদের এক উল্লেখযোগ্য অংশকে ইসলাম ধর্মাবলম্বী দেখে গামা সাহেবের মাথা গরম হয়ে যায়। কারণ মুসলমানদের প্রভাব তখন সারা সভ্যবিশ্বে। বিশেষ করে গামা সাহেবের দরজা পর্যন্ত মূরদের বিজয় রথ পৌঁছে গিছল। ইয়োরোপের সর্বদেহে তখনও মুসলমান ক্ষাত্রশক্তির দ্বারা ধর্ষণের সুস্পষ্ট চিহ্ন বিদ্যমান। ইতিমধ্যে পর্তুগীজরাও জলদস্যুপণায় বেশ দুর্নাম অর্জন করেছে। তবুও ভাস্কো-ড্য-গামার পক্ষে মুসলমানদের দেখে জলাতঙ্ক রোগীর মত চমকে ওঠাই স্বাভাবিক ছিল। সিঁদূরে মেঘ দেখা ঘরপোড়া গরুর মত উচ্চকিত লাফালাফিও করতে

কসুর করেনি ভাস্কো-দ্য-গামা। তার প্রথম আগমনেই তাই স্থানীয় রাজশক্তি এবং সম্মানীত নাগরিকদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিল। যে কেরল স্মরণাতীত কাল থেকে বিদেশী বণিকদের আপন ভূমিতে স্বাগত জানাতেই অভ্যস্ত সেই কেরলই বিরক্ত এবং অপমানিত বোধ করল ভাস্কো-দ্য-গামার ব্যবহারে। অতিথির সম্মানই প্রথম লাভ করেছিল গামা। সেই আতিথ্যের অবমাননা করতেও আটকায় নি তার। আর এই অপমানে প্রথমটায় হয়ত থমকে গিছল কেরলের মানুষ। 'কিন্তু পর্তুগীজ দম্ভের উত্তর দিতে কেরলের নৌবাহিনীর ধাবিত হতে বিলম্ব হয় নি। কালিকটের রাজকীয় নৌবাহিনী পর্তুগীজ বহরকে তাড়া করে গোয়া পর্যন্ত খেদিয়ে দিয়ে এল। এই জলযুদ্ধের নায়ক ছিলেন কুঞ্জালি মারক্কর— একজন মোপলা বা কেরলবাসী মুসলমান। ভারতের স্বাধীনতা-লাভের পর বহু জলযুদ্ধের বীর সেনাপতি এই কুঞ্জালি মারক্করের নামে নামকরণ করা হয়েছে কেরলের কোলাবা নৌ-ঘাঁটিটির! এখানে বলে রাখা ভাল যে স্বাধীন ভারতে গোয়া দমন দিউ থেকে চিরতরে পর্তুগীজদের উৎখাত করার সময় ভারতের দেশরক্ষা মন্ত্রী এবং এই যুদ্ধের সেনাপতি উভয়েই ছিলেন কেরল সন্তান।

১৯২১ খৃষ্টাব্দের মোপলা কৃষক অভ্যুত্থান ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। বৃটিশ রাজশক্তি এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট জমিদারদের (যাঁরা প্রায় সকলেই হিন্দু ছিলেন) মিলিত প্রচেষ্টা এই কৃষক অভ্যুত্থানকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পরিণত করতে এবং সেইভাবে চিত্রিত করতে সব রকমের চেষ্টাই করেছিল। কিন্তু 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস' গ্রন্থের রচয়িতা, এই অভ্যুত্থানে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী শ্রীমাম্মারথ শংকরণ এবং 'দি কংগ্রেস এ্যাণ্ড কেরালা' গ্রন্থের রচয়িতা শ্রী এ. কে. পিল্লাই এই অপবাদ যুক্তি-প্রমাণসহ খণ্ডন করেছেন। আরো বহু মনিষীই বলেছেন যে মোপলা কৃষক অভ্যুত্থান নিপীড়িত কৃষকদের, মাটির মানুষদের সাম্রাজ্যবাদী রাজশক্তি এবং

তাদেরই পৃষ্ঠপোষক দেশীয় জমিদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম, আপন অস্তিত্ব বজায় রাখার সংগ্রাম। জাগ্রত চেতনার বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। ১৯২১ এর মোপল কৃষক অভ্যুত্থান বিদেশী শাসন এবং সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রায় শতবর্ষব্যাপী আন্দোলনের এক বিশেষ পর্যায়ের পরিসমাপ্তি এবং নবপর্যায়ে উত্তরণ। ১৮৩৬ এর অভ্যুত্থানের পর ১৯২১ সাল অবধি কেরলের কৃষকরা বারবার আঘাত হেনেছে শোষণ এবং অত্যাচারের অচলায়তনকে গুঁড়িয়ে দিতে। নির্বিচার হত্যা লুণ্ঠন এবং আনুষঙ্গিক সব ধরণের উৎপীড়নও এই গণ-বিক্ষোভকে স্তব্ধ করতে পারে নি। সাম্রাজ্যবাদ পৃষ্ঠপোষিত সামন্ততন্ত্র এবং সুদখোর মহাজনদের বিরুদ্ধে সারা ভারতবর্ষব্যাপী একের পর এক যে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন এবং অভ্যুত্থান বিদেশী শাসনের নাগপাশ থেকে দেশকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে সংগঠিত এবং পরিচালিত হয়েছে উনবিংশ শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দীরও অনেকখানি জুড়ে। সেই আন্দোলন এবং অভুত্থান সমূহকে জাতীয় কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ উভয়েই প্রতিযোগিতা চালিয়ে আপনাপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির খাতে বইয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিল। জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকা ভারতীয় জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে অনেকখানি। ভারতের বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন অঞ্চলকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধিকার রাজনৈতিক ভাবে একত্র গ্রথিত করে। আর সেই গ্রন্থণার ফলেই ভারতের সকল অঞ্চলের সমস্যাই রূপ নেয় একই ধরণের। মূলতঃ একই সমস্যার শরিকদার অঞ্চলগুলি তাই রাজনৈতিক চেতনার ক্ষেত্রে একই কদমে পা ফেলতে থাকে। বিদেশী শাসনের অবসান—এই মৌলিক প্রয়োজনবোধই তাদের একাত্ম করে তোলে। এই একাত্মতাই পরবর্তিকালে জাতীয়তাবোধ নামে পরিচিত হয়। ভারতীয় জাতীয়তাবোধ মূলতঃ পরাধীনতারই শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি। তবু এই জাতীয়তাবোধ ভারতের সকল মানুষকে স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে একাগ্র করে তুলতে পারে নি। না পারার একমাত্র কারণ বৃটিশ শাসনের পরে যে কী

সে সম্বন্ধে কোন পরিষ্কার ধারণাই কারো ছিল না। নেতাদেরও এ সম্পর্কে কোন রকমের স্পষ্ট ধারণা যে ছিল না তা পরবর্তিকালেই প্রমাণিত হয়েছে।

বৃটিশ অধিকারের অব্যবহতি পর থেকেই বৃটিশ রাজশক্তিকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে বিভিন্ন আন্দোলন এবং অভ্যুত্থান দমন করার জন্য। এই আন্দোলন এবং অভ্যুত্থানগুলি প্রথম দিকে ছিল বিক্ষিপ্ত। প্রচণ্ড শক্তিতে বৃটিশ রাজশক্তির উপর আঘাত হানলেও একটা সংগ্রামের সঙ্গে অপরটির তত্ত্বগত, আত্মিক বা প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল না অধিকাংশ ক্ষেত্রে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে এক সংগ্রাম অপর সংগ্রামকে প্রেরণা জুগিয়েছে। এই সব সংগ্রামের বেশ অনেকগুলিই ছিল মৃত সামন্ততন্ত্রের পুনরুজ্জীবনের জন্য। কিন্তু ইতিহাসের চাকা পিছনে ঘোরে নি। বরং সামন্ততন্ত্রের পুনরুজ্জীবনের পাশাপাশি যে সব কৃষক অভ্যুত্থান ঘটেছে সেগুলি শ্রেণীসংগ্রাম বলেই দীর্ঘ উল্লম্ফনে চরমসাফল্যের দিকে অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছে অগ্রগতির রথটিকে। দেশব্যাপী কোন সংগঠন না থাকায় এবং শত্রুর প্রকৃতি এবং পরিচয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় এই সব ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অথচ প্রচণ্ড অভ্যুত্থান বৃটিশ রাজশক্তিকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুলেছিল। সম্পদশালিনী ভারতবর্ষকে কুক্ষিগত রাখার দুশ্চিন্তায় বৃটিশ কর্তাদের চোখে সব সময়ই যেন বিভীষিকার দৃশ্য ফুটে উঠত। ১৮১৪ খৃঃ অব্দে Metcalfe সরকারী নথিতে লিখেছিলেন, ভারতে আমাদের অবস্থা সব সময়ই সংকটজনক হয়ে রয়েছে....একটা ঝটকা বাতাসে আমরা যে কোনও সময়ই উড়ে যেতে পারি। আমরা মূল বিহীন।* ইংরাজের অবস্থা যখন ভারতভূমিতে এমন এক সংকটজনক পরিস্থিতির মধ্যে তখন বৃটিশ রাজনীতিকরা বসে ছিলেন না। তারা ব্যস্ত ছিলেন এমন কোনও এক মুস্কিল-আসান পন্থার সন্ধানে যদ্বারা

* H. N. Mukherjee, 'India's struggle for freedom' PP. 46.—Quoted.

এদেশে বৃটিশ শাসন নিরংকুশ এবং কায়েম হতে পারে। এবং সে সূত্রের সন্ধান পেতে খুব দেরী হয় নি। বৃটিশ ভারত অধিকার করে মূলতঃ এবং প্রধানতঃ মুসলমান শাসকদের পরাভূত করে। দেশের সাধারণ মানুষ (হিন্দু মুসলমান এই দুই প্রধান সম্প্রদায়ের) ইতিপূর্বে কোন দিনই রাজা বদলে বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি। কারণ তাদের অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটে নি তাতে। এক শাসক শাসনদণ্ড কেড়ে নিয়েছে অন্য শাসকের হাত থেকে এবং আনুগত্য দাবী করেছে প্রজাদের নিকট আর তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পেয়েছেও। রাজা-রাজড়ার যুদ্ধ, উত্থান পতন দেশের সাধারণ মনুষের অবস্থার বিশেষ কোন তারতম্য ঘটায় নি। সামন্তশোষণ চলেছে একইভাবে প্রজাপালনের নামে। সে ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমানে কোন ভেদাভেদ ছিল না আওরঙ্গজেব প্রমুখ দু-একজন ধর্মোন্মত্ত নৃপতির শাসনকাল ছাড়া। দেশের রাজনীতিতে হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের উচু মহলের মানুষদের ছিল সমান হিস্যা। বরং বলা ভাল যোগ্যতানুগ হিস্যা। দেশাত্মবোধ ইত্যাদি ছিল ঐ উচু মহলেরই নিজস্ব। এই দেশাত্মবোধ ছিল রাজানুগত্যে সীমাবদ্ধ। আর রাজানুগত্যও নির্ধারিত হত কতখানি সুবিধা ব্যক্তিগতভাবে রাজার নিকট থেকে নেওয়া যায় তারই ওপর। কিন্তু বৃটিশ শক্তি ভারত অধিকার করার সাথে সাথেই হিন্দু-মুসলমান অভিজাতদের হাত থেকে সেই অধিকার কেড়ে নিল। ফলে ক্ষুণ্ণ হল উভয়েই। ইতিমধ্যে দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে বৃটিশ কোম্পানী প্রবর্তিত উচ্চহার রাজস্ব এবং অন্যান্য ব্যাপারে পুঞ্জিভূত ক্ষোভ বিভিন্ন স্থানে ফেটে পড়তে থাকে। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, তিতু মিঞার সংগ্রাম, মৈমনসিংহের হাজং বিদ্রোহ, কেরলে পৌনপুনিক মোপলা বিদ্রোহ প্রমুখের মাধ্যমে বৃটিশ সরকার এবং তার নব প্রবর্তিত জমিদারীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কল্যাণে সৃষ্ট জমিদারদের শোষণ এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সাক্রিয় এবং সোচ্চার হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর সবটুকুই প্রায় মোপলারা লড়াই করে গেছে

ইংরাজ রাজশক্তি এবং জমিদারদের সম্মিলিত আক্রমণের বিরুদ্ধে। একটি অভ্যুত্থান দমন করে হাঁফ ছাড়বার অবসরটুকুও দেয় নি। ইতিমধ্যে অপর একটি অভ্যুত্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে গেছে এবং অভ্যুত্থান ঘটেছে।

"যতদূর জানা যায়, মোপলাদের প্রথম অভ্যুত্থান ঘটে ১৮৩৬ সালে। পরবর্তি আঠারোটি বছরে অভ্যুত্থান ঘটে মোট বাইশ বার। ১৮৪৯ সালের অভ্যুত্থানে লড়াই চলে শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত। পুলিশ আর সৈন্যের বিরুদ্ধে এক তীব্র খণ্ডযুদ্ধে ৬৪ জন মোপলা শহীদ হন। ১৮৫১-৫২ সালে এখানে সেখানে আবার আগুন জ্বলে উঠল।"*

সরকার বসে ছিল না। 'দুর্বিনীত' 'স্বভাব দুর্বৃত্ত' প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করে মোপলাদের নির্মূল করার কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। পুলিশ বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি করা হল। মোপলাদের নিরস্ত্র করা হল। গ্রেপ্তার এবং বিভিন্ন ধরণের সাজা দেওয়া হতে লাগল পাইকারী হারে।

মোপলা কৃষকদের অসন্তোষ এবং বিক্ষোভ ছিল জন্মী (জমিদার) এবং মহাজনদের বিরুদ্ধে। তাদের সংগ্রামও সুরু হয় এদের অত্যাচারের অবসান ঘটাবার সংকল্প নিয়ে। কিন্তু সবিস্ময়ে তারা দেখল যে রাজশক্তি এসে দাঁড়িয়েছে সেই অত্যাচারী ও লোভী জমিদার মহাজনদের আড়াল করে। রাজশক্তির স্বরূপ চিনতে তাদের বিলম্ব হল না। বুঝতে অসুবিধা হল না যে তাদের ন্যায্য অধিকার অর্জন করতে হবে এই রাজশক্তিকে পরাভূত করে তবেই। আসল শত্রুকে চিনে নিতে অসুবিধা হল না। ১৮৫৫ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর একদল মোপলা আক্রমণ করল কালেকটর মিঃ কনোলীর আবাস। তাকে হত্যা করল। এবং ফেরার পথে পুলিশ এবং সৈন্যবাহিনী কর্তৃক বেষ্টিত হয়ে পড়ল। নিষ্ক্রমণের যে কোন পথ নেই তাদের বুঝতে অসুবিধা হয় নি। তবু আত্মসমর্পন তারা করে

* L. Natarajan—Peasants' uprising in India.

নি। সোজা রাস্তাটাই বেছে নিয়েছিল। বিপ্লব চেতনায় উদ্বুদ্ধ সংগ্রামী শক্তির পক্ষে যা করা সম্ভব তাই-ই তারা করেছিল। সাতদিন নিরবসর যুদ্ধ করে সদলে শহীদ হয়েছিল।

১৮৩৬ খৃঃ অব্দ থেকে ১৯২১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ কাল পৌনঃপুনিক সংগ্রামের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় সংগ্রামী মোপলা কৃষকদের শ্রেণীচেতনার উন্মেষ। প্রথমতঃ তাদের সংগ্রাম ছিল জমির সংগ্রাম, জমির স্বত্বাধিকারের সংগ্রাম, প্রচলিত ভূমিব্যবস্থার পরিবর্তনে উদ্ভুত ক্ষতির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার সংগ্রাম। সেই সংগ্রামই তাদের শেষ পর্য্যন্ত দেশের স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামের বিস্তীর্ণ সমরাঙ্গনে সামিল করেছিল। "১৯২০-২১ সালে মধ্য এসিয়ার পরাধীন নিপীড়িত জাতিগুলি জারের স্বৈরাচারী শাসন, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র এবং অত্যাচারী শাসকদের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিল—রুশ নবেম্বর বিপ্লবের গৌরবোজ্জ্বল সাফল্য আমাদের দেশের জনগণের সামনে মুক্তির সম্ভাবনাকে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিল।"*

"১৯২১ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রগতি অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনের প্রবল উত্তেজনা, উদ্দীপনা এবং উৎসাহ আসমুদ্র হিমাচল আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল ১৯২১ সালে সারা ভারতে চাঞ্চল্যকর বহু ঘটনা ঘটিয়া চলিল। ১৯২১ সালে মে মাসে আসাম রেলওয়েতে শ্রমিকদের ধর্মঘট।........মোপলা বিদ্রোহ, আকালী আন্দোলন, ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলে দীর্ঘদিনব্যাপী শ্রমিক ধর্মঘট ;.... ..."*

অসহযোগ এবং খিলাফত আন্দোলন যুগপত প্রমূর্ত হয়েছিল ১৯২১ এর মোপলা অভ্যুত্থানে। সাধারণ কৃষক অত রাজনীতির মার প্যাঁচ বোঝে না। সে বোঝে সোজা হিসাব—'আমার হক

---

* আব্দুল হালিম: দেশহিতৈষী ১৯৬৪ নবেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী সংখ্যা থেকে ১৯৬৭ গণশক্তি নবেম্বর বিপ্লব বার্ষিক সংখ্যায় উদ্ধৃত রচনা।

পাওনা আদায় করার হকদার আমিই। এবং এই হক পাওনা আদায়ের সংগ্রামে হাজার হাজার সংগ্রামী মোপলা কৃষক কুণ্ঠাহীন ভাবে প্রাণ দিয়েছিল। অভিজাতদের রাজনীতি সেদিন হতবুদ্ধি হয়েছিল এই নিঃশেষে আত্ম বলিদানের রাজসূয় যজ্ঞ দেখে। আতংকে শিউরে উঠেছিল সংগ্রামের সুস্থ এবং সূক্ষ্ম শ্রেণীচেতনার উন্মেষ দেখে। অন্ধকূপ হত্যার কাহিনীকার বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কালিকট থেকে মাদ্রাজ পর্য্যন্ত নেওয়ার জন্য একটা রেল ওয়াগনে ১০০ জন বন্দাবীরকে ভরে দেয়। পোদানুর রেলষ্টেশনে ওয়াগনের দরজা খুলে দেখা গিছল যে বন্দাদের মধ্যে ৬৬ জন তৃষ্ণা এবং শ্বাসবায়ুর অভাবে মারা গেছে। এই ঘটনার নামই 'ওয়াগন ট্রাজেডী'। এ নিষ্ঠুরতার নজির পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

একথা সত্যি যে মোপলা বিক্ষোভ বরাবরই জমিদার এবং তাদের রক্ষক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল। জমিদাররা প্রায় সকলেই ছিল হিন্দু। বহু হিন্দু মন্দিরের অধিকারেও ছিল অনেক জমিদারীর মালিকানা। এবং কুট্টিয়ান বা কৃষকরা ছিল প্রায় সকলেই মোপলা বা কেরলী মুসলমান। এই অভ্যুত্থানকে তদানীন্তন কংগ্রেসের মঞ্চ থেকেও ধিকৃকৃত করা হয়েছিল। ভৎ'সনা করা হয়েছিল গান্ধীজীকেও। কারণ তিনি সংগ্রামী মোপলাদের সম্পর্কে বলেছিলেন, 'সাহসী ঈশ্বরভীত মোপলারা'। স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহল থেকে মোপলা কৃষকদের অভ্যুত্থানকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কেরলজীবনে সাম্প্রদায়িকতার অনুপ্রবেশ ঘটে অনেক পরে মুসলিম লীগের কল্যাণে।† সে নেশা প্রায় কেটে গেছে। আবার মোপলারা অন্যান্য সম্প্রদায়ের নিপীড়িত এবং শোষিত ভায়েদের সঙ্গে একযোগে সাধারণ শত্রুর খোঁজ করছে। আজ কেরলের কৃষিক্ষেতে কফি এবং রবার বাগিচায়, পাহাড়ে কন্দরে, সমতলে উপকূলে নতুন

† India's Struggle for Freedom—*Hiren Mukherjee* pp. 150

দিনের নতুন মুয়াজ্জিনের আজান শোন যাচ্ছে—হাইয়া আলাল ফালাওয়হ্ !

আরব সাগরের তরঙ্গে তরঙ্গে জাগছে তার প্রতিধ্বনি—হইয়া আলাল ফালাওয়হ্ ! শীঘ্র মঙ্গলের জন্য এসে সমবেত হও।

সহ্যাদ্রি পর্বতমালার শিখর ডিঙ্গিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে সেই ধ্বনি।

আজকের শংকরাচার্যদের হাতেও নতুন ভাষ্য। এ ভাষ্য জীবনের, এ ভাষ্য পরমার্থের। তারাও যেন ঋগ্বেদের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে বেরিয়েছে নতুন সমাজ গঠনে। তারাও বলছে :

যো বঃ সেনানীর্মহতো গণস্য
রাজা ব্রাতস্য প্রথমো বভূব।
তস্মৈ কৃণোমি ন ধনা রুণধ্মি
দশাহং প্রাচীস্তদৃতং বদামি ।।

[ঋগ্বেদ : ১০ : ৩৪ : ১২]

তারা সকলকে দিয়েই বলিয়ে ছাড়বে : দশাহং প্রাচীস্তদৃতং বদামি—আমি দশ আঙ্গুল বিস্তৃত করে সত্য বলছি, ন ধনা রুণধ্মি—ধন রোধ করছি না। যে ধনে সবার অধিকার কেবল আপন ভোগের জন্য তা রোধ করছি না।

যূপকাষ্ঠে বদ্ধ অনুশোচনায় ভেঙ্গে পড়া এতদিনকার শোষকাত্মাও গণদেবতার কাছে আকুল আবেদন জানাতে বাধ্য হবে :

বাধস্য দূরে নিঋর্তিঃ পবাচৈঃ
কৃতং চিদেন প্রমুমুগ্ধ্যস্মৎ ।।

[ঋগ্বেদ : ১ : ২৪ : ৯]

সত্যহীনতা থেকে আমাদের দূরে রাখ। কৃত পাপের মোহ থেকে আমাদের মুক্ত কর।

সেই যূপকাষ্ঠকে পরিবেষ্টিত করে চির অগ্রসরমান কেরল আত্মা হাঁকছে :

হাইয়া আলাল ফালাওয়হ !

মনুর সমাধি প্রস্তুত। সমাধির কিনারায় দাঁড়িয়ে মনু প্রলাপ বকছে :

তফাৎ যাও! তফাৎ যাও! ভুলে যেও না জগদ্‌গুরু শংকরাচার্য তোমাদেরই বলে গেছেন প্রাকৃত জন। বিশ্বপ্রেমিক জওহরলাল তোমাদের ধন্য করেছেন, 'চিন্তাশক্তিহীন' 'মূঢ় জনতা' বলে অভিহিত করে। তোমাদের জন্য আমার ব্যবস্থাপত্র :

উচ্ছিষ্টমন্নং দাতব্যং জীর্ণানি বসনানি চ।
পুলকাশ্চৈব ধ্যান্যানাং জীর্ণাশ্চৈব পরিচ্ছদাঃ॥

চিটে ধানের উচ্ছিষ্ট অন্ন খাদ্য, জীর্ণবস্ত্র পরিধেয়। তার বেশী তোমরা চেয়ো না। তার বেশী তোমরা পাওয়ার যোগ্য নও। সে অধিকার আমি তোমাদের কখনই দেব না!

পশ্চিম সাগরের বাতাস নারকেল পাতার মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় খিলখিল করে হেসে ওঠে।

নতুন দিনের ঋত্বিক সকলকে আহ্বান করে, চরৈবেতি, চরৈবেতি। এগিয়ে চল, এগিয়ে চল। বিগত দিনের প্রেতাত্মাকে নিয়ে বৃথা নষ্ট করার সময় হাতে নেই। সমবেত গর্জনে আকাশ বাতাস শস্যক্ষেত্র পুলকে শিহরিত হয় : চরৈবেতি চরৈবেতি! আগে বাঢ়ো!

কেরলে হিন্দু এবং মুসলমানদের সঙ্গে মিশে রয়েছেন খৃষ্টানরা।

মোট জনসংখ্যার শতকরা কুড়িভাগ এঁদের দখলে। সমগ্র জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিত বিচারে সংখ্যাটি আদৌ নগণ্য নয়।

কেরল জীবনের সর্বক্ষেত্রে দেখা যায় সব ধর্মাবলম্বী মানুষকে। যেমন আজ ঠিক তেমনই দূর অতীতেও। নায়ার এবং মোপলা সৈন্যের পাশে দাঁড়িয়েছে খৃষ্টান সৈন্যরা, তৈরী হয়েছে প্রাচীন কেরলের দুর্ধর্ষ বাহিনী। লড়াই করেছে এক সঙ্গে একই স্বার্থে, একই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে। মেরেছে, মরেছে। কখনো জয়োল্লাসে নেচেছে কখনো কপালে জুটেছে পরাজয়ের কালিমা। সব লাভ ক্ষতিই নিয়েছে সহযোদ্ধার সাথে সমান ভাগে ভাগ করে।

কেরলের খৃষ্টানদের ইতিহাসও বড় কম বিচিত্র নয়। বিদেশে কোথায় ধর্মের আকৃতিগত বা প্রকৃতিগত ভাঙ্গচুরের লড়াই হয়েছে তার ঢেউ এসে আছড়ে পড়েছে কেরলের উপকূলেও। অবশ্য এই হাঙ্গামা সুরু হয়েছে মাত্র সেদিন—কেরলে পর্তুগাল অধিকারের সময় থেকে। যা এতদিন ছিল অবিভক্ত এবং একক তাই-ই হল শতধা বিভক্ত। পর্তুগাল অধিকারের পর থেকে কেরলের খৃষ্টান সম্প্রদায় টুকরো টুকরো হয়ে গেল ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে। রোমান ক্যাথলিক চার্চ, নোষ্টারিয়ন চার্চ, এ্যাংগ্লীকান চার্চ, জ্যাকোবাই সিরিয়ন চার্চ, মার্তোমা সিরিয়ন চার্চ, বাইবল্ ফেথ্ মিশন, স্যালভেশন আর্মি, লুথেরেন মিশন—আরো অনেক আছে। এদের প্রত্যেকটির সঙ্গে বিদেশী কোন না কোনও ধর্মীয় গোষ্ঠির সম্পর্ক।

কেরলে খৃষ্টধর্মের প্রথম আবির্ভাব হয় ৮২ খৃঃ অব্দে—এমনই অনেকের বিশ্বাস। সেণ্ট্ টমাস মুজিরিস বন্দরের আশেপাশে কোথাও এসে নেমেছিলেন। তাঁর প্রভাবে অনেক স্থানীয় অধিবাসী খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। এঁদের মধ্যে নাকি জনকয়েক নাম্বুদিরীও ছিলেন। পরবর্তিকালে অবশ্য অনেক নাম্বুদিরীই খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হন কিন্তু খৃষ্টিয় প্রথম শতাব্দার পরিপ্রেক্ষিত বিচারে জনকয়েক নাম্বুদিরীর খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়া নিঃসন্দেহে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। কিন্তু যতই বিস্ময়ের উদ্রেক করুক, যতই অভাবনীয় মনে হোক আশ্চর্য হবার কোন কারণ নেই এতে। কেরলের প্রাচীন ইতিহাস ঘাঁটলে পরধর্মসহিষ্ণুতা এবং ধর্মীয় উদারতার ভুরী ভুরী উদাহরণ উদ্ধৃত করা যায়। বিদেশী রাজশক্তি রাইফেল উঁচিয়ে ধর্মের ধ্বজা ঘাড়ে করে এসে যতক্ষণ না শান্তির কুলায় উপদ্রব সৃষ্টি করেছে ততদিন শান্ত সমাহিত এবং 'আপনাতে আপনি বিকশি' ছিল কেরলের জনজীবন। দেশের মাটিতে সগুজাত ধর্মমতের একজন প্রচারক এসে নামলেন তারপর একের পর এক গীর্জা প্রতিষ্ঠা করে চললেন কেবলমাত্র ধর্মমতের জোরে এ ব্যাপার সে যুগে এমন কী এ যুগেও

কখনোই সম্ভব হত না যদি রাজশক্তি এবং সেখানকার উপস্থিত ধর্মীয় সম্প্রদায় উদার না হত। কেরলের রক্তে যে বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রবাহ আছে তা-ই ইসলামকে, খৃষ্টধর্মকে, বৌদ্ধ এবং জৈনধর্মকে আহ্বান করেছে, আলিঙ্গন করেছে নিজের ধর্ম বলে। আবার যখনই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বদ্ধ জলে গতিধারা হারাবার উপক্রম করেছে, নিজের অস্তিত্বকে বিপন্ন করেছে তখনই জনসাধারণের অন্তরের বিশ্বাস এবং উপলব্ধির উপরই প্রতিষ্ঠিত করেছে আপন ধর্মকে যুক্তি বিচার এবং বিশ্লেষণের ভিত্তিতে। ব্রহ্মজ্ঞানী পণ্ডিত লিখেছেন গীতার নতুন ভাষ্য, মেনে নিয়েছেন বিষ্ণুর অবতারত্ব। নিরাকার ব্রহ্মকে দেখেছেন রক্তমাংসের মানুষের রূপে।

জেরুজালেম, বাগদাদ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে যে সব ইহুদী পরিবার খৃষ্টীয় ৩৪৫ অব্দে কেরলে পাকাপাকীভাবে বসবাস করার জন্য আসে তাদের সঙ্গে ছিল শ' চারেক খৃষ্ট মতাবলম্বী। তাদের আগমনের পর কেরলে খৃষ্টানদের সংখ্যা বৃদ্ধি হল। খৃষ্টানরা রূপ পেল একটা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের।

দ্বিতীয় চের সম্রাটদের রাজত্বকাল নির্ণীত হয়েছে ৮০০ খৃঃ অব্দ থেকে ১১০২ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত। এই তিনশো বছরেরও অধিককাল কেরলের খৃষ্টানদের দেখা যায় প্রতিপত্তিশালী ব্যবসাদার রূপে। খৃষ্টানদের প্রতিপত্তি এবং প্রভাব তখনই সমাজজীবনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে নিয়েছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কেরল নৃপতি খুশী মনে কোন রূপ চাপে না পড়েই খৃষ্টানদের দিয়েছেন বিশেষ বিশেষ সুযোগ সুবিধার সনদ। রাজশক্তির প্রত্যক্ষ সহযোগিতা এবং রক্ষণাধীনে খৃষ্টধর্ম কেরলে শাখাপল্লব বিস্তারের অনুকূল পরিবেশ পেয়ে যায়। লক্ষ্য করবার বিষয় যে, হিন্দু সামন্ত রাজাদের পক্ষছায়ায় যে খৃষ্টানরা শান্ত নিরুপদ্রব এবং নিশ্চিন্ত জীবনযাপন করতেই অভ্যস্ত ছিল তারাই ব্যতিব্যস্ত, অশান্ত এবং চাঞ্চল্যের শিকার হয় পর্তুগীজ, ডাচ এবং ইংরাজ রাজত্বকালে। বিগত দুই শতাব্দীকাল কেরলের খৃষ্টানদের বহু ওলটপালট, ঝড়ঝঞ্ঝা এবং

বিক্ষুব্ধ আবহাওয়ার মধ্যে দিন কাটাতে হয়েছে। স্বীয় ধর্মমতের চৌহদ্দীতে যত অশান্ত অবস্থাই থাক না কেন সাধারণভাবে কখনো প্রতিবেশী হিন্দু বা মুসলমানদের সঙ্গে তাদের সামাজিক সম্পর্কে বড় রকমের কোন ফাটল ধরতে পারে নি। দেড়হাজার বছরের সাহচর্য এবং সহাবস্থানের সংস্কার বিশেষ ক্ষেত্রে এবং বিশেষ অবস্থায় সাময়িক বিকারগ্রস্থ হতে পারে কিন্তু মৌলিক কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারে না সমস্বার্থের জন্য সংগ্রামরত সহযোদ্ধাদের মধ্যে। নিজেদের মধ্যে বহু গীর্জার বহুমত থাকলেও কেরলের খৃস্টান মেহনতী জনসাধারণ অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতিবেশীর সঙ্গে সমান ধাপে প্রগতি এবং জীবনের সংহত বিকাশের ক্ষেত্রে এগিয়ে চলেছে।

কেরলের শিক্ষিতের হার ভারতের অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে বেশী হবার মূলে খৃষ্টীয় মিশনগুলির ভূমিকাই প্রধান। যে কোনও গীর্জার সঙ্গে আগের দিনেও দেখা যেত মালয়ালম শিক্ষার পাঠশালা। সেই পাঠশালার দ্বার ছিল সকল সম্প্রদায়ের সব ধর্মাবলম্বী বিদ্যার্থীদের জন্য উন্মুক্ত। আপন ধর্মমত প্রচারের এবং বিস্তারের সুচিন্তিত অন্যতম পদ্ধতি রূপে এই বিদ্যাদান ব্যবস্থা ব্যবহৃত হলেও মাতৃভাষা শিক্ষার লোভে অন্যান্য সম্প্রদায়ের ছেলেরাও এসে ভিড় করত সেই সব বিদ্যালয়ে। এইসব গীর্জা সংলগ্ন বিদ্যালয়ের অনুকরণে হিন্দু সামন্তরাজা, জমিদার এবং ধর্মীয় সংস্থা প্রভৃতি দ্বারা নতুন নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এক প্রতিদ্বন্দিতার ভাব পরিলক্ষিত হয় কেরলভূমিতে। শিক্ষার আলোকের সন্ধান পেয়ে সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষ মাথা এগিয়ে দিয়ে বিকশিত হতে চায়। ফলে শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি পেতে থাকে উল্লেখযোগ্যভাবে। যে শিক্ষা ছিল মুষ্টিমেয়ের লভ্য তা সাধারণ মানুষেরও আয়ত্তের অনেক কাছে এসে যায়।

কেরলের খৃষ্টীয় সমাজ জন্ম দিয়েছে অনেক সুবিখ্যাত পাণ্ডিতের। ভূরী ভূরী রাজনীতিক, দার্শনিক, কবি প্রভৃতি জন্মেছেন কেরলের খৃষ্টীয় সমাজে। ভারতের প্রথম মহিলা বিচারপতি কেরলের এক খৃষ্টান

পরিবারেরই দুহিতা। যে সংস্কৃত এককালে নাম্বুদিরীদেরই প্রায় একচেটে অধিকার ছিল আজ তা কেরল জনগণের প্রিয় সম্পদ। পাণিণী ব্যকরণের ভিত্তিতে লেখা 'পাণিণী প্রত্যোতম্' নামক গ্রন্থের রচয়িতা সাহিত্য আকাদামী পুরস্কার প্রাপ্ত সংস্কৃত ভাষার সুখ্যাত পণ্ডিত আই সি, চাকো একজন খৃষ্টান তনয়। জোসেফ মুণ্ডেশরী, ডাঃ শ্রীমতী পুন্নন লুকাস্, প্রফেসর পুথন কবিল, ম্যাথু ভার্গিস প্রভৃতির নামে নিঃসন্দেহে কেরলীয় খৃষ্টান সম্প্রদায় তথা সংস্কৃতপ্রেমী ভারতীয় জনগণ সর্বকালেই গর্ব অনুভব করতে পারে।

কেরলের আজকের গান, জীবনের গান—নতুন সামগান। যজ্ঞবেদীর চারিদিকে আহুতি নিয়ে দাঁড়িয়েছেন নাম্বুদিরী, মোপলা (মহাপিলা = মহানাত্মা), নায়ার, খৃষ্টান, আলওয়র প্রভৃতি সর্ব সম্প্রদায়ের নিপীড়িত মেহনতী জনগণ। তাঁদের আহুতিতে উত্থিত যজ্ঞধূমই বর্তমান কেরলের প্রতিচ্ছবি, অগ্নিশোধিত ভবিষ্যৎ কেরলের প্রতিশ্রুতি!

কেরল জীবনের বীজমন্ত্রই হচ্ছে—চরৈবেতি চরৈবেতি!

এগিয়ে চলাই তার ধর্ম তার হৃদয়ের স্পন্দন। সবার আগে চলাই তার ঐতিহ্য! সেই ঐতিহ্যেরই নবরূপায়ণ হচ্ছে তার মাঠে বাগিচায়, গ্রামে বন্দরে, মন্দিরে মসজিদে, গীর্জায় রাজ্য বিধান সভায়।

গীর্জার ঘণ্টা বাজছে—

আজান হাঁকছে মুয়াজ্জিন—

বেদস্তোত্র উঠছে মন্দিরে—

একযোগে। পাশাপাশি।

অবিশ্বাসী এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে ধন্য হতে পারেন ত্রিবান্দ্রম শহরের ঠিক মাঝখানে 'পালয়ম' নামক স্থানে।

এ দৃশ্য কেরল জনজীবনেরই সার্থক এবং অকপট প্রতীক।

কেরলে এককালে বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মেরও ছিল প্রচুর দাপদপা। বর্তমানে কেরলে বৌদ্ধ নেই বললেই হয়, জৈনের সংখ্যাও খুবই নগণ্য।

এই নগণ্য সংখ্যার এক বড় রকমের অংশ উত্তরভারতাগত বণিককুলের। 'মৌ, পিয়াসী অলির ঝাঁকের' মত তারা ভিড় করেছে কেরলের ব্যবসার বাজারে।

পুরীর জগন্নাথদেবের মত কেরলেরও "অনেক মন্দিরের সঙ্গে বৌদ্ধ বিহারের নাম যুক্ত হয়ে রয়েছে। অনেক মন্দিরকে আবার জৈন মন্দিরেরই রূপান্তর বলে মনে করা হয়। রামানুজ ভরতের মন্দির নামে প্রসিদ্ধ 'কুণ্ডল মাণিক্কম্' মন্দির রয়েছে ত্রিচুর জেলায়। বর্তমানে এটি একটি প্রসিদ্ধ হিন্দু মন্দির। পণ্ডিতদের মতে আসলে এই মন্দিরটি এক জৈন দিগম্বরের মন্দির। এমনও অনুমান করা হয়েছে যে মন্দিরটির দেবতা বিখ্যাত জৈন ধর্ম প্রচারক ভরতেশ্বর থেকে অভিন্ন। ভরতেশ্বরের একটি মন্দির মহীশূরের শ্রাবণ বেলগোলায় পাওয়া গেছে। হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থান কালে কেরলের জৈন সম্প্রদায়ের উপর হিন্দু দর্শনের নব পর্যায় প্রভাব বিস্তার করেছিল এটা স্বীকৃত মত। সাধারণ মানুষ যারা বেশ কিছুদিন জৈন ধর্মমতে বিশ্বাসী ছিলেন এবং শ্রদ্ধাবান ছিলেন তাঁদের সেন্টিমেণ্ট এবং সংস্কারে যাতে আঘাত না লাগে সেজন্যই সম্ভবতঃ অনেক ভেবে চিন্তে এটাকে হিন্দু পৌরাণিক দেবতা ভরতের মন্দিরে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। রইল ত ভরতেরই মন্দির। এজন্য জৈন দিগম্বরকে আপাতদৃষ্টিতে 'ঈশ্বর'ত্বটুকুই ত্যাগ করতে হল। বাদবাকীটার দঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে সাধারণ মানুষের খুব বেশী একটা অসুবিধা হয়েছিল বলে মনে করার কোন প্রমাণ আজ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

জৈনধর্মের বিখ্যাত কেন্দ্র ছিল 'মতিলকম'। মতিলকমের কেন্দ্রীয় জৈন মন্দিরের আওতায় পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহে অনেক ছোট বড় মন্দির ছিল। কালক্রমে মতিলকম মন্দিরও হিন্দু মন্দিরের রূপ পরিগ্রহ করে। পাঁচশো বছর আগেও মতিলকম মন্দিরে কোনও ব্রাহ্মণ প্রবেশ করত না। ব্রাহ্মণরা সম্ভবতঃ জৈন মন্দিরের ধর্মান্তর গ্রহণ মেনে নিতে পারেন নি, তাকে জাতে তুলতে চাননি!

এর্ণাকুলমের কল্লিল নামক স্থানে একটি প্রাচীন জৈন মন্দির দেখতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ কল্লিল এককালে জৈনদের একটা উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র ছিল। পাহাড় কেটে গুহা বানিয়ে তার মধ্যে মহাবীর তীর্থংকর, পদ্মাবতী দেবী আর পরেশনাথের মূর্তি খোদাই করা রয়েছে। এটিও পরবর্তিকালে হিন্দু দেবমন্দির রূপে ব্যবহৃত হতে থাকে। তবে এখানে এখনো দ্বৈতশাসন চলেছে। পূজা অর্চনার জন্য এখানে একজন নাম্বুদিরী ব্রাহ্মণ আছেন। হিন্দুদের কাছে এটা ভগবতী মন্দির। আবার জৈনরাও আসে এখানে পূজা দিতে। পূজা দেয় তারা আপন উপাস্যের। জৈনধর্মের পতনের সময় জৈন ধর্মাবলম্বীদের ওপর হিন্দু সংশোধনবাদীরা নিঃসন্দেহে প্রভাব বিস্তার করে এবং ধীরে ধীরে মন্দির-গুলিতে পর্যন্ত অধিকার কায়েম করে।

কন্যাকুমারী জেলায়ও এখনও রয়েছে জৈনতীর্থ। এখানে ধর্মপ্রাণ জৈন তীর্থযাত্রীরা প্রতিবছরই সমবেত হয় পরেশনাথ, মহাবীর, পদ্মাবতী এবং অন্যান্য তীর্থংকরদের পূজা করার মানসে। আজও কিছু জৈন ধর্মাবলম্বীকে দেখা যাবে আলপ্পুলা আর মট্টাচেরীতে। তাঁদের পূজা অর্চনার জন্য জৈন মন্দিরও রয়েছে ওখানে। কেরলের জৈন সম্প্রদায় ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের জৈনদের মতই ঐশ্বর্যশালী। মূলতঃ এরা প্রায় সকলেই ব্যবসাদার।

অন্যান্য ধর্মের মত বৌদ্ধধর্মও কেরলের হিন্দু রাজাদের ঔদার্য এবং প্রসাদগুণে এককালে কেরলে খুবই প্রসার লাভ করে। শ্রীমূলবাসম্ বৌদ্ধ মন্দিরের জন্য হিন্দুরাজা বিক্রমাদিত্য বরগুণ যে অনেক জমি এবং অর্থ দান করেন তা সপ্রমাণ করার মত তাম্রলিপি উদ্ধার হয়েছে। সেই তাম্রলিপিতে রাজা বরগুণ বুদ্ধ ধম্ম এবং সংঘের স্তুতি গেয়েছেন।

এত স্বত্বেও পরবর্তিকালে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মের মধ্যে সংঘর্ষ কেরলেও প্রবল আকার ধারণ করেছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী

থেকে সুরু হয়ে এই সংঘর্ষ কয়েক শতাব্দী ধরে চলে। তা চললেও স্থানীয় জনজীবনে ব্রাহ্মণ্য এবং বৌদ্ধ চিন্তাধারা পাশাপাশীই প্রবাহিত হতে থাকে। ব্রাহ্মণ্য এবং বৌদ্ধ চিন্তাধারার পরস্পর সংঘর্ষে এক ধারার সৃষ্টি হয়। দুয়ের মহামিলনে জন্মলাভ করে শংকরাচার্যের যুগান্তকারী দার্শনিক চিন্তাধারা। শংকরাচার্যকে তৎকালীন ঐশ্লামিক চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত বলেও কেউ কেউ মনে করেন! এই সিদ্ধান্তকে অনেকেই নাকচ করে দিয়েছেন তবু নিরপেক্ষ বিচার বিশ্লেষণ সম্ভাবনাটাকে একেবারে অসম্ভব বলে উড়িয়ে দিতে পারে না।

কেরলীয় জনজীবন তথা শংকর এবং তাঁর উত্তর সূরীদের মধ্যে বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাব সুস্পষ্ট। কেরল থেকে বৌদ্ধ ধর্মের বহিষ্কার কার্যত শংকর এবং তাঁর অনুগামীদের দ্বারাই হয়েছিল। শুধু ধর্মমতের বহিষ্কারই বা বলি কেন, বহু বুদ্ধমূর্তি হিন্দু মন্দিরের আশপাশ থেকে পাওয়া গেছে নাকভাঙ্গা এবং অবহেলিত ভাবে। বৌদ্ধ মন্দির দখল করেছে হিন্দু দেবতায়, অন্যবস্থ ভাস্কর্যের নিদর্শন বুদ্ধমূর্তিগুলির অঙ্গহানি ঘটিয়ে সেগুলি মন্দিরের আশপাশে আস্তাকুঁড়ে টেনে ফেলতেও ইতস্তত করে নি সেকালের উগ্র ধর্মধ্বজীরা কিন্তু আপন মুদ্রায়ই এই ঋণ পরিশোধ করতে হয়েছে কড়ায় গণ্ডায়। পরবর্তিকালে মুসলমান দিগ্বীজয়ীরা দেশজয়ের সঙ্গে সঙ্গে মন্দির কলুষিত করে এবং মন্দিরের মালমশলা দিয়ে মসজিদ তৈরী করে একই মনোবৃত্তির পরিচয় রেখে গেছে ভারতের মাটিতে।

বৌদ্ধধর্ম কালক্রমে ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে স্থান ছেড়ে দিয়ে সরে গিছল কেরল থেকে। তবু বৌদ্ধধর্মকে দলিত করার সব রকমের চেষ্টাই পরিণত হয়েছে ব্যর্থতায়। মানবমনে ধর্মের মর্মবাণী উৎকীর্ণ করাই যদি ধর্মের লক্ষ্য হয় বৌদ্ধধর্ম সে লক্ষ্যে সার্থকভাবে পৌঁছেছিল। হিন্দুধর্ম বুদ্ধকে অন্যতম অবতার বলে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল।

বর্তমান কেরলের সংস্কার আন্দোলন, তা সে রাজনৈতিক হোক

আর সামাজিকই হোক, নিঃসন্দেহে ভারতীয় দর্শনের সবচেয়ে প্রভাবশালী শাখা বুদ্ধিবাদ এর প্রপৌত্রদ্বয়—চার্বাক এবং বৌদ্ধ এই দুই দর্শনের প্রত্যক্ষ প্রভাবের প্রসাদপুষ্ট রূপ।

যদিও আজ ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মত কেরলেও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা নগণ্য, বৌদ্ধ সংস্কৃতির বৈশিষ্ঠ্য প্রত্যক্ষত প্রায় অদৃশ্য তবু একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মত এখানেও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব অন্যান্য ধর্ম এবং সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষের উপর বড় কম নয়। এখানকার হিন্দুদের আচরণ এবং ক্রিয়াকাণ্ডের অনেকখানিই বৌদ্ধধর্মের অবদান।

গ্রহণ এবং বর্জন, দেশকালের প্রয়োজনের তাগিদে সংস্কার সাধন হিন্দুধর্মকে সংস্কৃতির স্তরে নিয়ে যেতে পেরেছিল। একথা খুবই সত্য যে এই গ্রহণ এবং বর্জন, দেশকালোপযোগী করে নেওয়ার মূলে সব সময় সাধারণ মানুষই প্রধান অংশ নিয়েছে। পরে ধর্মগুরু এবং পণ্ডিতেরা নিরুপায় হয়ে এগিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন সংশোধনীর অনুমোদন দিতে। অনুমোদন দেওয়ার ব্যাপারেও কত পিপে নস্য যে উড়েছে বায়ুমণ্ডলে, কত ঝড়ঝঞ্ঝা যে যুক্তিতর্কের তুফান থেকে উঠেছে সে হিসেবটা এখানে অবান্তর। তবে হিন্দু ধর্মের সংবিধানে সংশোধনী গুলোকে বাদ দিলে যা থাকে তা আদিম সাম্য সমাজের এক নিখুঁত ছবি। সেটাকে বর্তমানে হিন্দু কেন কোন ধর্মই গবেষকের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করে না বা দেখে না। দেখে ভয়ের দৃষ্টিতে! জুজু দেখার দৃষ্টিতে!

বাংলার সত্যপীরের পরিকল্পনা এসেছিল গ্রামীন মানুষেরই শুভবুদ্ধি এবং ভ্রাতৃত্ববোধ থেকে। তাদের কাছে নারায়ণও সত্যপীর পয়গম্বর ও সত্য। তাই লৌকিক দেবতারা আজও পূজা পেয়ে আসছে হিন্দু মুসলমান উভয়েরই। কোনও ভাটপাড়া নবদ্বীপ তা বন্ধ করতে পারেনি, শরিয়তও হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। এখনো মুসলমান দরগায় ব্রাহ্মণ কন্যাকে দেখা যায় শিন্নী মানত করতে। এখনো কালীপূজার রাতে অনেক মুসলমান জননী উপবাসী থাকেন সন্তানের কল্যাণ

কামনায়। আমাদের গ্রামে গরু বিয়োলে এখনো তো দেখি গ্রামের হিন্দু মায়েরা দেড়মাইল দূরের সৈয়দ একদিল শাহর দরগায় পাঠিয়ে দেন শুদ্ধ হবার পর প্রথম দুধটুকু। বৎসরান্তিক উৎসবে গাঁয়ের সবচেয়ে গোঁড়া ব্রাহ্মণটিও পীর সাহেবের দরগার শিন্নী পাঠাতে ভুল করেন না।

ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে সর্বধর্মের সমন্বয়। যেন ধর্মান্ধদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে বলছে—দেখ, কী হয়েছে দেখ। আর লক্ষ্য কর কী হচ্ছে। তা থেকে হিসাব করে নাও কী হবে।

ধর্মের বিপণিকাররা শিউরে উঠছে ধর্মের ক্ষেত্রে তাদের একচেটে অধিকার সাধারণ মানুষের সম্পত্তি হয়ে যাচ্ছে দেখে। চুপি চুপি এককানে এসে বলছে, মিঞার দরগায় শিন্নী চড়াচ্ছ চড়াও, দুখানা বাতাসা বই তো নয়। তবে মনে রেখ ওরা যবন, ওরা ম্লেচ্ছ!

আবার অপর কানটির মধ্য দিয়ে মরমে পশিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে, এতক্ষণ টিকি নেড়ে নেড়ে ঠাকুর কী বলে গেল? ওর কথায় খবরদার কান দিও না। মনে থাকে যেন ওরা কাফের ওরা না-পাক। খোদার বিচারে রোজ কেয়ামতের দিন ওদের জন্য দোজখের দরজা খুলে দেওয়া হবে। সাবধান!

থতমত খায় বৈ কী সাধারণ মানুষ। কিছুক্ষণ বিমূঢ়ও হয়ে থাকে।

ফলে জ্বলে নোয়াখালী, জ্বলে বিহার। কলকাতার ফুলতলা বস্তী আর বরিশালের মূলাদীতে হয় নরমেধ যজ্ঞ। বাগমারীতে গ্রন্থসাহেব প্রতিষ্ঠাকে উপলক্ষ্য করে ছড়ান হয় সাম্প্রদায়িকতার বিষ!

মন্দিরে দেবতা মসজিদে খোদা শিউরে ওঠেন।

সাধারণ মানুষের ঘরসংসার পোড়ে। সেই ভস্মাবশেষ থেকে মানুষ পায় নতুন দীক্ষা। আবার দ্বিগুণ বেগে মানুষ মানবতার অগ্রগতির রথটিকে আগে চালিয়ে নিয়ে চলে।

আয়প্পন বুদ্ধের পাদমূলে স্থান পেয়ে হিন্দুর পূজার অর্ঘ্য ধন্য হয়।

কেরলের শবরিমল মন্দিরে তীর্থ যাত্রা করতে হলে অবশ্য পালনীয় আচার হচ্ছে নিরামিষ আহার, অহিংসা আর সাংসারিক সর্বপ্রকার ভোগ থেকে তীর্থযাত্রার দুমাস আগে থেকে বিরত থাকা। শুধু কী তাই? এই তীর্থযাত্রাকালে বর্ণাশ্রমের গভীর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হিন্দু সংস্কারও বর্ণভেদ জাতিভেদ মানে না। লক্ষ লক্ষ হিন্দু তীর্থযাত্রীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়, শরণম্ আয়প্পা, আয়প্পা শরণং, স্বামী শরণং! যেন সেই বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামিরই প্রতিধ্বনি পাহাড়ের তরঙ্গে তরঙ্গে নৃত্য করে।

শবরিমল মন্দিরটি কেরলের বহু শাস্তা মন্দিরেরই একটি। শাস্তা কেরলী হিন্দুদেরই দেবতা তবে তা এখন নিখিল হিন্দুদেরই দেবতারূপে পূজিত। শাস্তা হচ্ছেন মোহিনীরূপ বিষ্ণু এবং শিবের পুত্র। এই হরিহর পুত্রই হয়ত বৈষ্ণব এবং শৈবমতের সমন্বয় প্রচেষ্টার ফল। এখানে আর্য প্রকৃতি বা হরি এবং অনার্য বা শবরজাতি শিব বা পুরুষ। উভয়ের মহান মিলনের ফল শাস্তা। শাস্তার পূজা মাদ্রাজের অনেক অংশেও বিস্তার লাভ করেছে।

আবার অনেকের বিশ্বাস, শাস্তা মন্দিরগুলির সব কয়টিই বুদ্ধমন্দির। এমন কী মন্দিরস্থ মূর্তিও অনেক ক্ষেত্রে স্পষ্টত বুদ্ধের। বৌদ্ধধর্মের পড়তি অবস্থায় শৈব এবং বৈষ্ণব এই উভয় শাখার হিন্দুদের দ্বারা বৌদ্ধদের আপন জন করে নেওয়ার প্রয়াস সৃষ্ট দেবতা শাস্তা। তবে অনেক পণ্ডিত এই মত মানেন না। না মানলেও কিছুই যায় আসে না। সবচেয়ে বড়কথা হল এই সব দূর দুর্গম স্থানের শাস্তাদেব এর ভক্তদের উপর বুদ্ধদেবের প্রভাব খুঁজে বার করবার জন্য ত্রিপিটক ঘাড়ে করে বুদ্ধগয়া বা কপিলাবস্তু কোথাওই ছুটবার দরকার হয় না।

ভারতের অন্যান্য স্থানের মত কেরলেরও কোন কোন মন্দিরে মন্ত্রপূত তেল বা জল দেওয়া হয় রোগীদের। এটাও নিঃসন্দেহে বৌদ্ধ প্রভাব। কারণ হিন্দু মন্দির গুলি সুরুতে ছিল আধ্যাত্মিক

জীবনের ব্যাপারেই বেশী আগ্রহী। রোগ ঘোগের জন্য পূজা মানত চললেও সেটা এসেছিল আর্যেতর জাতি বা আর্যদেরই অনগ্রসরকালের দান হিসাবে। রোগঘোগের জন্য ছিলেন বৈদ্যরা। মন্দিরে হত রোগক্লিষ্টের জন্য শান্তি স্বস্ত্যয়ন, যাগযজ্ঞ। আর্তের সেবা করাটা একমাত্র বৌদ্ধ মন্দিরেরই অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বলে গণ্য হত। শুধু হিন্দু মন্দির নয় ভারতের বহু মসজিদেও তেল বা জল পড়া দেওয়ার রেওয়াজ আছে।

বুদ্ধের স্তব দিয়ে সুরু 'অমরকোশ' ছিল কেরলের অবশ্য পাঠ্য কোশ গ্রন্থ।

একটু লক্ষ্য করলেই চোখে পড়ে কেরলের জনজীবনে কেরলে আগত প্রত্যেকটি জাতি ধর্ম এবং সংস্কৃতির মিশ্রিত প্রভাব। কেবল মাত্র হিন্দুদের উপরই এ প্রভাব কার্যকরী হয়েছিল মনে করলে ভুল করা হবে। কেরলের খৃষ্টান এবং মুসলমান সমাজের উপরও এমন বহু প্রভাব পড়েছে যা তাদের ধর্ম বিশ্বাসেরও পরিপন্থী।

এমনই দু-একটা নিয়ম কানুনের উল্লেখ সম্ভবত অপ্রসঙ্গিক বিবেচিত হবে না।

বাংলার হিন্দুধর্মে শৈব, বৈষ্ণব এবং শাক্ত এই শাখাত্রয়ের মধ্যে বর্তমানে এমন কোনও কড়াকাড়ি নিয়ম নেই যে একে অন্যের উপাস্যের পূজা করতে পারে না। বরং দূর্গামূর্তির মাথার উপর চালচিত্রে আমরা শিবের প্রতিকৃতিটি দেখতেই অভ্যস্ত। তেমনই দূর্গা মণ্ডপের মধ্যে এক সিংহাসন নারায়ণ শিলার পূজাও হয় বেশ ভক্তি সহযোগে। কেরলেও অবস্থাটা অনুরূপ। এখানেও শক্তিপূজকের বিষ্ণু পূজায় কোন বাধা নিষেধ নেই। শক্তিপূজায় অধিকার আছে তাঁরই যিনি দীক্ষিত।

অন্যান্য ধর্মের পারস্পরিক ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা কতকটা বাংলার মতই। কলকাতার ফিরিঙ্গী কালীর মন্দিরে খৃষ্টানরা পূজা দেন সে কী আজ থেকে ?

তবে বাংলার গ্রামাঞ্চলে খৃস্টানের সংখ্যা আনুপাতিক হারে অনেক কম হওয়ার ফলে গ্রাম বাংলায় খৃস্টানদের প্রভাব তেমন দেখা যায় না। কিন্তু কেরলে হিন্দু মুসলমান এবং খৃষ্টান যেমন শহরে বন্দরে তেমনই গ্রামেও একে অপরের পড়শী।

কন্নুর জেলার প্রসিদ্ধ মুতপ্পন (শিব) মন্দিরে এখনো মুসলমান নাবিক সশ্রদ্ধ পূজা নিবেদন করে। আবার কোট্টায়ম জেলার এক মসজিদে মাথা ঠেকিয়ে যাওয়া শবরিমল শাস্তা মন্দিরের তীর্থ যাত্রীদের কাছে অবশ্য পালনীয় অনুষ্ঠানের অঙ্গ।

কেরলে নায়ার প্রভৃতিদের উত্তরাধিকার আসে মায়ের এবং মামার সম্পত্তিতে। একে বলা হয় মরুমক্কাত্তায়ম্। কিন্তু এই প্রথা কবে থেকে যে মালাবার অঞ্চলের কিছু মুসলমানের মধ্যে চালু হয়েছে তা আজ তারা নিজেরাও বলতে পারবে না। হতে পারে এই অঞ্চলের হিন্দুরা ধর্মত্যাগ করেছিলেন কিন্তু উত্তরাধিকার প্রথাটা ত্যাগ করেন নি। শরিয়তবিরোধী এই প্রথার ফলে তাঁরা মুসলমান হিসাবে পৃথিবীর অন্য কোন অংশের মুসলমানের চেয়ে কী হেয় হয়ে রয়েছেন? মাতুল ধনে অধিকারের প্রথা কেরলের কোন কোন অংশে খৃস্টানদের মধ্যেও প্রচলিত। পূর্বাশ্রমের উত্তরাধিকার প্রথা আঁকড়ে থাকায় এঁরা ধর্মে পতিত হন নি কেউই। আবার মালাবার অঞ্চলেই একদল গোঁড়া নাম্বুদিরীকে দেখি পিতৃধনের পরিবর্তে মাতৃধনেরই উত্তরাধিকারী হতে।

ঠিকুজী কোষ্ঠি? ও তো সাধারণ এবং সহজ ব্যাপার। সব ধর্মের সব জাতের কেরলবাসীই সন্তান জন্মের সাথে সাথেই জ্যোতিষীর কাছে হাজির হন নবজাতকের ঠিকুজী কোষ্ঠি তৈরী করবার জন্য!

ভারতের মাটিতে তেল আর জলের একটিই মাত্র ধর্ম এবং সেটিও খুবই সাধারণ। তা হচ্ছে তরল্য। তাই দুয়ে মিলে কখন যে এক হয়ে যায় জানা যায় না। শিলা ভারতের জলেই ভাসে।

ভারতের সংস্কৃতির বিরাটত্ব এবং ব্যাপকতা হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ

খৃষ্টান, আর্য আর্যেতর কারো একার নয়, তাদের সমবেত সাধনার ফল। এই সাধনার সার্থক রূপায়ণ দেখি কেরলে।

কেরলের সংস্কৃতি তিলোত্তমা!

বিভিন্ন সংস্কৃতির সঙ্গম কেরল।

প্রাকবৈদিক যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত প্রত্যেকটি ধাপই সেখানে সুস্পষ্ট, বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

ভাস্কর্য, স্থাপত্য, চিত্রকলা সবকিছুতেই কেরল সৃষ্টির চরম মন্ত্রটিই যেন উচ্চারণ করেছে।

প্রাচীন ভারতের নিজস্ব সম্পদ যে কর্ণাটক বা দক্ষিণ ভারতীয় শৈলীর সঙ্গীত তা এখনো কেরলের বিপুল সমাদৃত সঙ্গীত শৈলী। স্বাতী তিরুনালের মত প্রতিভাধর গীতিকার এবং সঙ্গীত শিল্পীর জন্য জগত চিরকালই গর্ববোধ করবে। বর্ণাঢ্য চিরনূতন এবং স্বর্গীয় সুষমায় মণ্ডিত অকৃত্রিম ভারতীয় কর্ণাটক সঙ্গীতের পাশাপাশি সেখানে পূর্ণমহিমায় বিকশিত হয়েছে উত্তর-ভারতীয় (আসলে মধ্য এশিয়ার প্রভাবে প্রভাবান্বিত) হিন্দুস্তানী সঙ্গীত।

কেরলে মন্দির মসজিদ গীর্জার ছড়াছড়ি। এর প্রত্যেকটিই যেন আপন ধাঁচের অদ্বিতীয় কৃতী। এসব ছাড়াও রয়েছে ইহুদীদের সিনাগগগুলি।

কেরলের হিন্দু মন্দিরগুলি প্রধানত বৈষ্ণব, শাক্ত আর শৈব এই তিনভাগে বিভক্ত। বৈষ্ণব মন্দিরগুলির মধ্যে ত্রিবান্দ্রম, তিরুবংগাট, তিরুবিল্লামলা, তৃপ্পনিতুরা, তৃপ্রয়ার, অম্পলপ্পুষা, চিট্টুর, নেল্লুবায়, কুটল মাণিক্যম্ প্রভৃতির মন্দিরগুলির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শক্তি বা দেবা মন্দিরের সংখ্যাই কেরলে সবচেয়ে বেশী। কেরলের দেবীমন্দিরের প্রাধান্য সেখানকার প্রাকআর্য এবং নায়ার সমাজের মাতৃপ্রাতৃপ্রধান্যের প্রত্যক্ষ ফল কি না সে সম্পর্কেও অনেক

মতভেদ রয়েছে। তবে বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তিগুলো কেমন যেন ভোঁতা। একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে মানুষ আদিম অবস্থা থেকে বিভিন্ন সামাজিক পর্যায় অতিক্রম করে বর্তমান সভ্যতায় উন্নীত হয়েছে বিভিন্ন পর্যায়ের কিছু কিছু নিদর্শন সঙ্গে করে বহে এনেই।

নিঃসন্দেহে এ তত্ত্ব প্রমাণিত হয়েছে যে শাক্তমতের উদ্ভবের মূলে রয়েছে সমাজে নারীপ্রাধান্য। আর এই নারী প্রাধান্যের প্রভাবেই শক্তিপূজার উদ্ভব। শাক্তমতও প্রাচীন জাতিগুলির মধ্য থেকে (সম্ভবতঃ পত্নীরূপে আগত নারীদের মারফত) পরে বৈদিক সমাজেও অনুপ্রবেশ করে। কৃষিপ্রধান সমাজের নারী প্রাধান্যের স্মারক দেবীরাও নতুন নতুন পরিচিতিসহ নতুন বস্ত্রালংকারে রমণীয়া হয়ে বৈদিক সংস্কৃতির অন্দরমহলে ঢুকে চাবির গোছা আঁচলে বেঁধে অগোছাল সংসারকে ঝাড়পোঁছ করে চলনসই-গোছের, মানুষের নিবাসযোগ্য করতে লেগে যান।

বৈদিক সমাজের জীবিকা ছিল পশুপালন ফলে সেখানে স্বভাবতই পুরুষপ্রাধান্য। বৈদিক সাহিত্যের অর্বাচীন শাখা ছাড়া সর্বত্রই দেবীরা অনুপস্থিত। পুরুষ থেকেই সেখানে সৃষ্টির উদ্ভব। প্রকৃতি থেকে নয়। পুরুষসূক্তের সাক্ষ্য এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট। এক আদিপুরুষ থেকেই সৃষ্টির উদ্ভব।

সিন্ধু সভ্যতার কালে সেখানকার সমাজ ছিল কৃষিপ্রধান। তাই সেখানে দেবী বা শক্তিপ্রাধান্য কারণ কৃষিকাজ আবিষ্কার করেছিল মেয়েরাই এবং সেটা অধিকারেও ছিল তাদেরই।

সারা ভারতের মত তাই কেরলেও দেখি নারী প্রধান ও পুরুষ প্রধান সমাজের যুগল ধারার প্রবাহ। একটি পুরুষ প্রধান বৈদিক, অপরটি নারীপ্রধান তান্ত্রিক।

কুল্লুকভট্ট তাঁর মনুস্মৃতির ব্যাখ্যায় শ্রুতিকে দুভাগে বিভক্ত বলে স্বীকার করে গেছেন—শ্রুতিশ্চ দ্বিবিধা—বৈদিকী তান্ত্রিকী চ।

এই তন্ত্রের প্রত্যক্ষ প্রভাব বাংলায়, কেরলে, আসামে, কাশ্মীরে, তিব্বতে। বৌদ্ধ ধর্ম পর্যন্ত রেহাই পায় নি এর হাত থেকে। অনার্য দেবী বা প্রকৃতি হয়েছেন জগতকারিকা। অনার্যদেবতা শিব যখন সতীর মৃতদেহ কাঁধে তুলে প্রলয়নাচন নাচতে সুরু করেছেন তখন নিষ্কৃতির অন্য কোন পথ খুঁজে না পেয়ে বেদান্তের সুদর্শন চক্র এসেছে সারা ভারত ভূ-ভাগ জুড়ে দেবীর পীঠস্থান গড়ে দেবার জন্য। তবেই শান্ত হয়েছেন শবরদেবতা শিব।

বৈদিক সমাজের জোয়াল যেখানে উৎকট ভাবে চেপে বসতে পারে নি সেখানেই ভদ্রকালী, ভুবনেশ্বরী যোড়শীদের প্রভাব।

কেরলে দেবীমন্দিরের প্রাচুর্য সাক্ষ্য দেয় নাম্বুদিরীপ্রধান বৈদিক সমাজেও মাতৃপ্রাধান্য কী ভাবে সংস্কৃতির বিজয় বৈজয়ন্তী উড়িয়েছিল। বৈদিক সমাজ অনার্য সংস্কৃতি ধর্ম এবং দর্শনকে নিঃশেষে গ্রাস করতে গিয়ে পৌরাণিক গল্পের মুনিগ্রাসী দৈত্যের মত অসুবিধাজনক অবস্থায় পড়ে গিয়েছিল। ফলে গ্রাস করেও হজম করতে না পেরে হিন্দু সংস্কৃতির রূপ নিয়েছে। হিন্দুসংস্কৃতি সর্বভারতীয় সংস্কৃতির—বলা ভাল আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির সমন্বয়ের সুষ্ঠু রূপায়ণ। এই সমন্বয় সাধন বরাবরই হয়েছে আগে সাধারণ মানুষের মধ্যে পরে সমাজপতিরা বাধ্য হয়ে মেনে নিয়েছেন। চার্বাক নমস্য হয়েছেন অনেক পরে, বুদ্ধ অবতার হয়েছেন মাত্র সেদিন। শিবকে রুদ্রের সঙ্গে পাঞ্চ করে জলচল করা হয়েছে, গণপতি দুর্গজয় করেছেন পৈতৃক মাথাটি খুইয়ে। সমাজপতিরা বুঝতে পেরেছিলেন শিবহীন যজ্ঞমাত্রই দক্ষযজ্ঞে পর্যবসিত হবে তাই সকল পূজার প্রথমেই গজেন্দ্রবদন গণপতির অর্ঘরচনার নির্দেশ জারী।

কেরলের মন্দির রচনা শৈলীতেও এর ব্যত্যয় নেই।

দ্রাবিড় ভিত্তির ওপর আর্যরীতির মুকুট।

রচনা কৌশল এবং শিল্পনৈপুণ্য কেরলস্থ মন্দিরগুলির বৈশিষ্ট্য। "দি আর্টস্ এ্যাণ্ড ক্র্যাফ্‌ট্‌স্ অব ট্রাবাংকোর" গ্রন্থ অনুযায়ী কেরলের

মন্দিরগুলির গঠন শৈলীকে মোট সাতভাগে ভাগ করা হয়েছে। পেডেস্ট্যাল, বেস, পিলাস্টার, ইনটেব্লেচার, নেক অফ দি ডোম, কুপোলা এবং পিনাক্‌ল্‌। পেডেস্ট্যাল থেকে ইনটেব্লেচার পর্যন্ত, গঠনের প্রথম চার ধাপে দ্রাবিড়শৈলী সুস্পষ্ট। উপর দিকটায় পড়েছে বিভিন্ন রীতির প্রভাব। কেরল শৈলীর মন্দিরে ছাদ সূচ্যাকার এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তামার পাত দিয়ে মোড়া। সম্ভবত প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের জন্যই এ ধরনের গঠনকৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল।

কেরল মন্দিরের গঠনশৈলীর আলোচনা এখানে অবান্তর তবে এটুকু বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, বিভিন্ন শৈলীর সংমিশ্রণে কেরল জনজীবনের প্রতীক হয়ে উঠেছে এই মন্দিরগুলি।

কেরলের দারুশিল্পও খুব উন্নতি করেছিল। দারুশিল্পের আদর্শ মাধ্যম সেগুনকাঠ কেরলে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তাছাড়া দারুশিল্পের উপযোগী অন্যান্য কাঠেরও অভাব নেই কেরলের বনে জঙ্গলে এবং পাহাড়ে।

ভারতের প্রাচীন শিল্পীদের নাম তাঁদের শিল্পকর্মে অনুপস্থিত। শিল্পের সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে আলোচনা করলেই তার কারণ বুঝতে অসুবিধা হয় না।

শিল্পীর অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র থেকে কল্পনা তার দৃষ্টি প্রসারিত করে আর সেই দর্শনই রূপ নেয় শিল্পের। আদিম অবস্থায় মানুষের শিল্প সৃষ্টির যে সব প্রয়াস বা নিদর্শন পাওয়া যায় তাতেও দেখি এই একই মনোভাব। পার্থক্য কেবল অভিজ্ঞতা এবং সেই অভিজ্ঞতাশ্রয়ী কল্পনার পরিধির বিস্তৃতির ক্ষেত্রে। আদিম মানুষের কল্পনা তাদের বাস্তব জীবনেরই অঙ্গন মাত্র ছিল।

মানুষের মনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় বিশ্বাস দানা বাঁধার অনেক আগে থেকে প্রকৃতি তাকে ভয় ভাবনা এবং নৈরাশ্যের আঘাতে বিপর্যস্ত করত। প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার মাঝেই মানুষের মনে কার্যকারণ

চিন্তার বীজ অংকুরিত হয়। প্রকৃতির বিভিন্ন বিরূপতাকে মানুষ শান্ত করতে চায় স্তব দ্বারা, অনুরোধ উপরোধ দ্বারা।

এই মনোভাবের পরিপক্কতাই শিল্প, সাহিত্য, দর্শনের জনক।

প্রকৃতির কাছ থেকে শেখা পাঠ যতই এগুতে থাকে ততই তার মনে দেবদেবী সম্পর্কিত ধারণাগুলো দানা বেঁধে বুদ্ধিগ্রাহ্য রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে। প্রকৃতির বিভিন্ন প্রকাশকে সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত করে, তাদের কৃপাদৃষ্টি এবং সহানুভূতিকে নিজের কাজে লাগাবার কথা ভাবতে থাকে মানুষ। সুরু হয় অনুষ্ঠান।

ইরাবতীর্বরুণ ধেনবো বাং মধুমদ্বাং সিন্ধবো মিত্র দুহ্রে।

ত্রয়স্তস্থুর্বৃষভাসস্তিসৃণাং ধিষণানাং রেতোধা বি দ্যুমন্তঃ॥

[ঋগ্বেদ ঃ ৫ ঃ ৬৯ ঃ ২]

—হে মিত্র, হে বরুণ তোমাদের দ্বারা নদীগুলি মধুক্ষরা, ধেনুরা দুগ্ধবতী ইত্যাদি!

এবং ঃ

আ নো মিত্রাবরুণা ঘৃতৈর্গব্যূতিমুক্ষতম্।
মধ্বা রজাংসি সুক্রতূ॥

[ঋগ্বেদ ঃ ৩ ঃ ৬২ ঃ ১৬]

হে শোভনকর্মকারী মিত্র বরুণ তোমরা আমাদের গোশালাটি ঘৃতসিক্ত কর, আমাদের বাসস্থানটি মধুসিক্ত কর!

সভ্যতার ঊষাকালের যা কিছু আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকাণ্ড, যা কিছু সাহিত্য এবং শিল্প তার সবটুকুই সমষ্টির কল্যাণে সৃষ্ট। সমাজে উদ্বৃত্ত ভোগীর উদ্ভব হওয়ার আগে পর্যন্ত চলে এই ব্যবস্থা। তারপর ধীরে ধীরে সমাজে পরশ্রমজীবির উদ্ভব। ধীরে ধীরে দেবদেবীর মধ্যেও আসে সমাজের চেতনানুগ পরিবর্তন। তারাও হয়ে ওঠে তোষামোদ প্রিয় এবং ষোড়শোপচার পূজার কাঙ্গাল। মানুষের পক্ষ থেকে নিত্যনূতন উপঢৌকন উৎসর্গীকৃত হয় বিচ্ছিন্নভাবে, বিচ্ছিন্ন স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে। দেবদেবীর দরবারে আর্জি পেশ হতে থাকে ঃ তুমি অমুক, তুমি তমুক,—

তুমি পরম দয়ালু, তুমি বাঞ্ছাপূরণকারী—তোমায় আমি এইগুলো সম্প্রদান করছি তুমি আমাকে ঐগুলো দিয়ে ফেল দিকিনি !

মন্দির, মসজিদ, গীর্জাকে তাই দেখা যায় কুবেরের কোষাগারের রূপ পরিগ্রহ করতে। বাদী বিবাদী, আসামী, ফরিয়াদী সকলেই শিন্নী চড়ায়, জয় কামনা করে !

এভাবেই দেশের সম্পদ এককালে এসে জড় হতে থাকে দেবতার পাদমূলে।

সাহিত্যিক রচনা করে সাহিত্য, দেবমাহাত্ম্য কীর্তনে তা মুখর।

নর্তকী আপন সাধনার ডালি উজাড় করে দিয়ে চলে দেবতার পাদমূলে।

বাদ্যকর তার সুর মূর্চ্ছনায় সেই অব্যক্তেরই রূপ দিতে চায়। কবি গায় বন্দনাগান।

দার্শনিকরা আপনাপন ধ্যান ধারণা অনুযায়ী ব্যাখ্যায় দেবতা এবং দেবতাসৃষ্ট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ উদ্ঘাটনে লেগে যায়।

একথা খুবই সত্য যে আজকের দৃষ্টি দিয়ে এসব সৃষ্টির ব্যাখ্যা করতে গেলে পদে পদে হোঁচট খেতে হবে ; গলদ থেকে যাবে মূলেই। সেদিনকার উপলব্ধির সত্য বিধৃত সেদিনকার শিল্প কাব্য সাহিত্য ও দর্শনে যেমন বিধৃত হচ্ছে আজকের সাধনা এবং ভাবনালব্ধ জ্ঞান আজকের শিল্প সাহিত্য দর্শনে।

সেদিনকার মত আজকের কথাও শেষ কথা নয়।

শেষ কথা কোনদিনই উচ্চারিত হবে না।

প্রাচীন শিল্পীদের সৃষ্টিকর্মে স্রষ্টার নাম বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত। কেরলের দারুশিল্পের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নেই। সেদিনকার শিল্পী চমৎকার শিল্পসৃষ্টি করেও সৃষ্টিগাত্রে আপন নাম উৎকীর্ণ করে রাখার কোন প্রয়োজনই বোধ করেন নি। পুনর্জন্মবাদী হিন্দুধর্মের এইসব পূজারীরা মনে করতেন জীবনের শেষ একজন্মেই নয়। জন্ম জন্মান্তরের সাধনার যোগফলই মোক্ষ। বৈদান্তিক মায়াবাদও

জগৎসংসার সম্পর্কে অশ্রদ্ধার ভাব সৃষ্টি করেছিল। ইষ্টদেবের চরণে উৎসর্গীকৃত হওয়াই ছিল সেদিনকার শিল্পের পরমপদপ্রাপ্তি।

সেজন্যই দেখি প্রাচীন ভারতের অতুলনীয় শিল্প ভাস্কর্য স্রষ্টার কোন হদিস দিতে পারে না। শিল্পী তাঁর শিল্পের মাধ্যমে পূজা করে গেছেন ইস্টদেবতার। কেরলের দারুশিল্পের শিল্পীদেরও নাম বা পরিচয় জানা যায় না। জানা যায় তাঁদের অন্তরের রসবোধের পরিচ্ছন্নতার কথা। বোঝা যায় তাঁদের অন্তরের ভাব ঐশ্বর্যের গভীরতা, শিল্প সম্পর্কে তাঁদের পরিশুদ্ধ জ্ঞানের কথা। পূজারীর অন্তরের শুচিতা এবং সৌন্দর্যে ইষ্টদেবতাই হয়েছেন মহিমান্বিত।

করিয়ুর মন্দিরের হনুমান মূর্তি তুলনাবিহীন। এই দারুমূর্তি ভাববিভোর হয়ে রামসীতাকে রামায়ণ পাঠ করে শোনাচ্ছেন! হনুমান মূর্তির সর্ব অবয়বের অপার্থিব সুষমায় স্রস্টার মনে শিল্প সৃষ্টিকালীন অবস্থার প্রতিরূপ সুস্পষ্ট।

শিল্পী আর শিল্প, দেবতা এবং শিল্পীমন এখানে একাত্ম, অচ্ছেদ্য।

'কঠিনম্ কুলম্' মন্দিরের গর্ভগৃহ সম্মুখস্থ নমস্কার মণ্ডপের (শ্রীকোবিল) ছাদের শিল্পকৃতী নিঃসন্দেহে একক এবং অদ্বিতীয়। এই ছাদটি নয়টি সমানভাগে বিভক্ত। মধ্যকার টুকরায় ব্রহ্মার মূর্তি এবং তাঁকে বেস্টন করে আছেন অষ্ট দিকপাল। ইন্‌জিনিয়ারিং এবং কলা এখানে একাকার। একই আধারে উভয় বিদ্যাই তুলনাহীনভাবে একে অপরকে মহিমান্বিত করে প্রকাশ করেছে আপনাপন চমৎকারিত্ব।

কেরলের দারুশিল্পীরা আপনাপন সৃজনীশক্তিকে কেবল দেবদেবীর মূর্তি গঠনের সীমাবদ্ধতার অন্ধকূপে বন্দী রাখেন নি। তাঁদের শিল্পকর্মের মধ্যে সমাজ ইতিহাস ধর্ম সবকিছুই স্থান পেয়েছে। প্রকৃতির উজ্জ্বল শিল্পরূপ ফুটে উঠেছে তাঁদের দক্ষ হাত এবং সাধনাসিদ্ধ মননের সমন্বয়ে।

জীবনের সর্বক্ষেত্রে যখন ঈশ্বর এবং ধর্মের প্রভাব ও নির্দেশ তখন জনজীবনের বহিরঙ্গেরও অলংকরণ ঈশ্বর এবং ধর্মবিশ্বাসের রং-এ।

পৃথিবীর প্রাচীন ভাস্কর্যে তাই দেখা যায় দেবদেবীদের বিভিন্ন অবস্থার বিভিন্ন মূর্তি। এমন কী মন্দির গাত্রে নগ্ন এবং আধুনিক মানুষের চোখে অশ্লীল ভাস্কর্যও দৃষ্ট হয় ভুরি ভুরি। কিন্তু যে যুগে শিল্পীরা দিনের পর দিন অসীম ধৈর্য এবং অমিত অধ্যাবসায়ের সঙ্গে সেই সব মূর্তিকে পাথর কেটে ফুটিয়ে তোলেন সেদিন ঐসব শিল্পকৃতির পিছনে এক একটা বলিষ্ট বক্তব্য ছিল, ছিল ধর্মীয় ব্যাখ্যা। আর ঐ বক্তব্য সাধারণ মানুষের সুপরিজ্ঞাত ছিল। মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ ঐসব মূর্তি দেখে কেউ মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসি চাপতে চাপতে পার্শ্ববর্তিনীকে একটা সুখদ খোঁচা দিয়ে নূপুর ঝমঝমিয়ে আড়ালে পালাত না বা 'রামচন্দ্র' 'রামচন্দ্র' বলতে বলতে খড়ম খটখটিয়ে শিল্পীর চতুর্দশ পুরুষকে নরকগামী হওয়ার শুভেচ্ছা জানিয়ে সরে পড়ত না। বিকৃত যৌন আনন্দ উপভোগ করবার জন্যও কেউ ঘুরে ফিরে বার বার সেই দৃশ্য দেখত না। বার বার দেখত, পাঁচজনকে দেখতে বলত ভক্তি গদগদ শ্রদ্ধাপ্লুত মনে। ঐ দৃশ্য তাদের মনে ভক্তি ও শ্রদ্ধা বৃদ্ধির সহায়ক হত।

কেরল শিল্পের সব কয়টি শাখাতেই আজকের রুচিবিচারেও নাক সিঁটকাবার মত কিছু নেই। দারুশিল্পের বিষয়বস্তু রামায়ণ মহাভারত বা ভাগবতের কাহিনীকুঞ্জ থেকে আহরিত।

পদ্মনাভপুরম কিঙুর, করিয়ু প্রভৃতির গোটা পাঁচিশেক মন্দির কেরলের প্রাচীন দারুশিল্পের চমৎকার এবং আশ্চর্য সম্ভার নিয়ে বিরাজ করছে। পদ্মনাভপুরমের দারুশিল্পে নবরসের অপূর্ব প্রকাশ। এই মন্দিরে রামায়ণ থেকে আহৃত বিষয়বস্তুর চুয়াল্লিশটি ফলক দেখা যায়। এগুলো সপ্তদশ শতাব্দীর কাজ। পদ্মনাভপুরম রাজপ্রাসাদে ঐ শিল্পেরই প্রায় সমসাময়িক এক অনবদ্য দারুশিল্পের সম্ভার রয়েছে। ঐ প্রাসাদের মোটা মোটা কাঠের থামগুলোর আগাগোড়া শিল্পী হাতের নিপুণ স্পর্শে প্রাণবন্ত।

ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দী কেরলের দারুশিল্পের স্বর্ণযুগ।

চূণক্করা মন্দিরে শিব এবং অর্জুনের দ্বন্দ্বযুদ্ধের দারুমূর্তিটিতে অভিব্যক্ত রৌদ্ররসকে বোধ হয় ওর চেয়ে স্পষ্টভাবে কোনকালে কোন অবস্থাতেই রূপদান সম্ভব নয়।

কেরলের ভাস্কর্য সেখানকার বাস্তুশিল্পের সমবয়সী।*

কারো কারো মতে বাস্তুকলার অলংকরণের প্রয়োজনেই মূর্তিকলার উদ্ভব। আবার ভিন্ন মত হচ্ছে আগে উদ্ভব মূর্তিকলার পরে সেই শিল্পকৃতিকে প্রকৃতির বিনাশী স্পর্শ থেকে আড়াল করার প্রয়াসে সৃষ্ট বাস্তুকলা।

কে আগে আর কে পরে এ নিয়ে যত বিতর্কই থাক না কেন একথা সর্বজনস্বীকৃত যে কেরলের মূর্তিকলা এবং মন্দিরকলা একে অপরের পরিপূরক। মন্দিরের অন্তরের স্পন্দন গর্ভগৃহস্থ দেবমূর্তি এবং দেবমূর্তির বহিরঙ্গের অপার্থিব মনোহারিত্বের প্রকাশ মন্দিরগুলি।

প্রস্তরকে মাধ্যম করে আপন মনের ভাবরূপকে ধর্মীয় কাহিনীর প্রতীকে কি ভাবে প্রকাশ করা যায় তার মনোহর নিদর্শন কেরলের প্রস্তরশিল্প। রামায়ণ, মহাভারত জাতক কোন কিছুর কাহিনীই বাদ নেই সেই অজ্ঞাতনামা ভাস্করদের কালজয়ী শিল্পকৃৎএ। রামের বনযাত্রা, হনুমানের লংকাদাহন, শ্রীকৃষ্ণের বংশীবাদন ও গোপিনীদের নৃত্য, শিবমার্কণ্ডেয় আলিঙ্গন প্রভৃতি মূর্তিগুলি প্রথম শ্রেণীর ভাস্কর্যের নিদর্শন। এ ছাড়া বুদ্ধদেব এবং পদ্মাবতী মূর্তিগুলি প্রস্তরশিল্পের প্রবীণপ্রজ্ঞার অমূল্য অবশেষ।

মন্দির গাত্র, স্তম্ভ, মন্দিরের প্রবেশদ্বার অলংকরণেও এই শিল্পীরা সমপরিমাণ মনোযোগ এবং কৃতিত্বের সাক্ষ্য রেখে গেছেন! তাঁরা যেন তাঁদের মনের কুসুমে রতনে তাঁদের উপাস্যকে সাজিয়ে রেখে গেছেন ভাস্কর্যের মাধ্যমে। ঐ কুসুম একদিন তাঁদের মনের গুলবাগিচায় সুরভি ছড়িয়েছিল, ঐ রতন তাঁদের হৃদি রত্নাকরকে জ্যোতির্ময় করেছিল।

---

* *Sculpture in Travancore*: R. Vasudev Podwal.

প্রাচীন কেরলের ধাতুশিল্প এবং হাতীর দাঁতের কাজও কম গৌরবের অধিকারী ছিল না।

আর আছে চিত্রশিল্প।

প্রাচীন যুগ থেকে এই শতাব্দীর প্রথমপাদে বিশ্ববিখ্যাত চিত্রকর রবিবর্মার কাল পর্যন্ত কেরলের চিত্রকলা অজস্র সুন্দর এবং সার্থক কালজয়ী চিত্রের জন্ম দিয়েছে। চিত্রশিল্পেও কেরলের ভাবরাজ্যের সুসংহত শান্ত এবং স্পষ্ট প্রতিচ্ছায়া।

'বিষ্ণুধর্মোত্তরম্' নামক গ্রন্থের চিত্রকলার উৎপত্তি ঘটিত সুবিখ্যাত কাহিনীটি হয়ত এখানে অপ্রাসঙ্গিক মনে হবে না।

একবার মহর্ষি নরনারায়ণের ধ্যানভঙ্গের জন্য দেবরাজ ইন্দ্র দশজন অপ্সরাকে নিয়োজিত করলেন। অপ্সরারা এসে মহর্ষির সুমুখে নেচে নেচে সর্বাঙ্গ ব্যথা করে ফেলল, ঝাঁক ঝাঁক কটাক্ষবাণ নিক্ষেপ করতে করতে এককুড়ি চোখই ট্যারা করে ফেলার উপক্রম—মহর্ষির ভাববিকার নেই। অপ্সরাদের চাকরী যায় যায় অবস্থা। তারা হয়ত তখন ভাবছে, এ কেমন ধারা শুকনো ঋষি রে বাবা! দেহে কিংবা মনে ওর কী সামান্য রসকষও নেই নাকি!

ওদের অবস্থা দেখে মহর্ষির মনে কী ভাবের উদয় হল কে জানে!

সম্ভবত কৌতুক।

মহর্ষি হাতের কাছের আমগাছটা থেকে কয়েকটা পাতা ছিঁড়ে সেগুলোর রস নিংড়ে নিয়ে নিজের উরুতে একটি নারীমূর্তি আঁকলেন।

অপ্সরাদের ত চক্ষুস্থির। এ কেমন নারী?

ত্রিভুবনে এ নারীর কোন জোড়া যে নেই এ তারা জানত। সেই অপূর্ব রূপসী নারীমূর্তি দেখে লজ্জা পেয়ে তারা ফিরে গেল দেবরাজের সভায়। ফিরে গিয়ে অকপটে স্বীকার করল যে মহর্ষির ধ্যানভঙ্গ করা তাদের কর্ম নয়। মহর্ষির মনের মণিকোঠায় যে অতুলনীয়া নারী বিরাজিতা তাকে যে ওরা দেখে গেছে সে খবরও জানাল। আনুপূর্বিক সব ঘটনা তারা ইন্দ্রকে খুলে বলল।

সব শুনে ইন্দ্র এসে হাজির মহর্ষি নরনারায়ণের তপোবনে। মহর্ষির মানসী মূর্তিকে দেখে তিনি এতই মোহিত হয়ে গেলেন যে নরনারায়ণের অনেক স্তবস্তুতি করে সেই নারীকে ভিক্ষা নিয়ে স্বর্গে ফিরলেন। স্বর্গে সেই নারীর প্রতিষ্ঠা অপ্সরাদের রাণীর আসনে!

ইনিই উর্বশী।

সাধকের উরুতে বসন্তের কিশলয়সারে এঁর জন্ম। ইনি মাতা নন, কন্যা নন, সুন্দরী রূপসী বধূও নন। ইনি 'চিরযৌবনের পাত্রে রূপের অমৃত।'

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, সে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী নয়, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী নয়, সে স্বর্গের নর্তকী, দেবলোকের অমৃত পান সভার সখী।

উর্বশী—সর্বকালের শিল্পীমনের মানসী।

সাহিত্যকলার মত শিল্পকলার উদ্ভবের মূল কথাও ঈশ্বরোপাসনা। চিত্রকলা, মূর্তিকলা, নৃত্যকলা, সংগীতকলা সবকিছুর মূলেই কখনো ভীষণা, কখনো মনোহরা, কভু অশান্ত, কভু প্রশান্ত প্রকৃতি অথবা সেই প্রকৃতির পিছনে কল্পিত ঐশ্বরিক শক্তির উপাসনা। অর্জিত জ্ঞানের চৌহদ্দীতে প্রকৃতির নিত্যনূতন রূপকে ব্যাখ্যা করে সেই কল্পিত শক্তির উপর মানবিক ধ্যানধারণা অনুযায়ী গুণ আরোপ করে তাকে সমাজ বা নিজের কাজে লাগাবার প্রয়াস।

প্রাচীন চিত্র বা মূর্তিকলায় তাই দেখা যায় প্রথমে পরিচিত প্রকৃতি, পরে সেই প্রকৃতির খবরদারী করা অপ্রাকৃত ঈশ্বরকে। সেই ঈশ্বর কখনো পুরুষ আবার কখনো নারী। কখনো প্রতিপালক, কখনো সংহারক। দেবদেবীর কল্পনায়ও তাই সর্বকালেই পড়ে সমাজের প্রচলিত ব্যবস্থার প্রভাব। পুরুষ প্রধান সমাজে জন্ম নেয় জগতপিতা, জগন্মাতার জন্ম মাতৃপ্রধান সমাজে। পিতৃপ্রধান সমাজে জগৎস্থষ্টিকারী পরব্রহ্ম, মাতৃপ্রধান সমাজে ব্রহ্মময়ী।

পিতৃপ্রাধান্য এবং মাতৃপ্রাধান্যের কাল নির্ধারণ করে দিয়েছিল আদিম সমাজের জীবিকার ব্যবস্থা। শিকার পশুপালন প্রভৃতি

পুরুষজনোচিত শ্রমসাধ্য কর্মই যখন মূল উপজীবিকা তখন সমাজে পুরুষ প্রাধান্য। আবার যখন দেখা দিল আদিম কৃষি ব্যবস্থা মূল উপজীবিকা রূপে তখন সমাজে নারীপ্রাধান্য। কারণ কৃষিকাজ মেয়েদেরই আবিষ্কার এবং কৃষিকাজের জন্য তৎকালে অর্জিত জ্ঞানটুকু ছিল নারীরই অধিকারে। পরে যখন চাষবাস শারিরীক শ্রমসংকুল কাজ হয়ে ওঠে তখন সেটা ধীরে ধীরে পুরুষের হাতেই চলে যায়। পটলক্ষেতে নারীর প্রবেশ নিষিদ্ধ করে পরোয়ানা জারি আছে এখনো বাংলাদেশের অনেক স্থানেই। মেয়েদের গায়ের বাতাস লাগলে পটলগাছ নাকি বন্ধ্যা হয়ে যায়!

পিতৃপ্রধান সমাজে জীবন ছিল কঠোর, জীবিকা আয়াসলভ্য। প্রকৃতি সেখানে নিষ্ঠুর। বন্যজন্তু ভয়ংকর। শিকার পাওয়া না পাওয়া, চারণভূমি বদলের দুরূহ অসুবিধা—সবকিছু মিলিয়ে পৃথিবীকে ভয়ংকর এবং বিরূপই মনে হত। মনে হয়, যে দুজয় এবং দুর্জ্ঞেয় অদৃশ্য শক্তি প্রকৃতিকে পরিচালিত করছে তা যেন পদে পদে মানুষের প্রতিকূলতা করার জন্যই লেগে আছে। সুতরাং সুরু হল সেই শক্তিরই স্তবস্তুতি, তার উদ্দেশে উৎসর্গ, তার তৃপ্তিসাধনে যাগযজ্ঞ জন্মাল দেবতা।

দেবীদের জন্মও ঠিক একইভাবে মানুষের জ্ঞানের সীমা পেরিয়ে অজানা অন্ধকারে। বীজ থেকে অংকুর উদ্গম, লতায় পাতায় শোভিত কৃষিস্থলী, ফুল ফল—পর্যায়ক্রমে খাদ্যশস্যে পরিণত হওয়ার আগে যে ঝড়ঝঞ্ঝা, বন্যাপ্লাবন, অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি, অজ্ঞাত কারণে শস্যহানি এ সবের মূলেও তো একজনের হাতের সূতার টান! বসুন্ধরা সেখানে জননী—যার গর্ভভেদ করে জন্মায় প্রাণের চেয়েও দামী শস্যাংকুর। বর্ষাকে কল্পনা করা হল ধরিত্রীর গর্ভধারণকাল এবং যথারীতি মানবিক নিয়মে চারদিন শুদ্ধাচারে উদ্‌যাপনের পর চষাখোঁড়া। ধরণী হল গর্ভবতী। ধানের শীষ যখন ভরে এল গাছের গলা পর্যন্ত ধরিত্রীকে খাওয়ান হল সাধ।

এমনই কত বিভিন্ন বিশ্বাস। মানুষের কল্পনায় প্রকৃতির জীবনচক্রেও মানুষের অনুরূপ আবর্তন।

এই ভাবেই প্রকৃতি হয়েছিল দেবী। এবং সেই প্রকৃতির আধ্যাত্মিক রূপই নানা দেবী কল্পনায় মূর্ত। পরে একের পর এক দেবদেবীর উদ্ভব। কেউ সম্পদের, কেউ বিদ্যার, কেউ রক্ষার, কেউ প্রলয়ের - কতরূপ কত বৈচিত্র সেই কল্পনার মালায়।

এমনই এক মাতৃপ্রধান সমাজেরই স্মৃতি বহন করে আসছে কেরলের 'কলমেযত্তু' চিত্রকলা। প্রাচীনত্ব এর সর্বজন গ্রাহ্য। পরিকল্পনায়ও রয়েছে মৌলিকত্বের সুস্পষ্ট নিদর্শন। বাংলায়ও পঞ্চবর্ণের গুঁড়ির সাহায্যে বিভিন্ন লৌকিক পূজাপার্বণে মেয়েদের বিভিন্ন ধরণের আলপনা আঁকতে দেখা যায়। কেরলের কলমেযত্তুতেও ব্যবহৃত হয় পঞ্চবর্ণের। এই পঞ্চবর্ণের গুঁড়ি সংগ্রহ করা হয় হাতের কাছে পাওয়া অকিঞ্চিতকর সামগ্রী থেকে। শ্বেতবর্ণের জন্য সাদা আতপ চালের গুঁড়ি, চূণ আর হলুদ মিলিয়ে লাল রং, একধরণের গাছের কাঁচা পাতা শুকিয়ে গুঁড়া করে তৈরী হয় সবুজ রং, হলুদ ব্যবহৃত হয় হলদে রংয়ের জন্য, ধানের তুঁষ গরম খোলায় পুড়িয়ে নিয়ে গুঁড়া করে কালো রং তৈরী করে নেওয়া হয়। হাতের দু-আঙুলের সাহায্যে এই পঞ্চবর্ণের প্রয়োগে তৈরী হয় উগ্রচণ্ডা কালীমূর্তি! সে মূর্তি যেমনই ভয়ংকর তেমনই বিচিত্র তার পূজাবিধি।

বৈদিক আর্যদের আমলে ভারতের বহু প্রাচীন জাতি বা গোষ্ঠীর মধ্যে মাতৃপ্রধান সমাজ-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। সেই প্রথারই রেশ টানছে এখনো অনেক জাতি, বিশেষ করে ভারতের শাক্ত এবং তান্ত্রিক সম্প্রদায়। মাতৃরূপের পূজায় আমাদের কত না আড়ম্বর, কত বিচিত্র ধরনের বিধিব্যবস্থা!

কেরলের নায়ার জাতির মধ্যে মাতৃপ্রধান সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য মাতৃসম্পদে বা মাতুল সম্পদে অধিকার প্রচলিত। সেই নায়ারদেরই কুরুপ্পু নামক শাখার পুরুষেরই রয়েছে কলমেযত্তু কালীমূর্তি

রচনার বংশপারম্পর্য। তারাই সেই ভীষণা মাতৃমূর্তি রচনা করে। মূর্তি রচনার সঙ্গে সঙ্গে চলে বন্দনাগান। তারপর পূজারীর প্রবেশ হয় নাটকীয় ভঙ্গিতে। সশস্ত্র পূজারী রুদ্রমূর্তিতে পূজামণ্ডপে প্রবেশ করেন। সক্রোধে তিনি অনেক কিছুই বলে যান। যেন দেবী তাঁর মুখ দিয়ে নিজের বক্তব্য বলাচ্ছেন। তাঁর উপদেশ বক্তৃতা প্রভৃতির সাথে বাদ্য বেজে চলে, চলতে থাকে গান। শেষে ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসে পূজারীর ক্রোধের অভিব্যক্তি। ভক্তজনে সর্বমঙ্গলের আশ্বাস দিয়ে পুরোহিত দেবী চিত্রের পায়ে প্রণাম করেন। পূজাও শেষ হয়ে যায় ঐ সঙ্গে। এ পূজায় লিপিবদ্ধ মন্ত্রতন্ত্রের কোন বালাইই নেই। প্রচলিত সমাজের বিভিন্ন সমস্যার হাত থেকে নিষ্কৃতির প্রত্যাশাই মুখ্যতঃ এই পূজার লক্ষ্য। গুণের দিক থেকে কলমেষত্তুর দেবী বাংলার শীতলার মাসতুতো বোন। এই পূজা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হলে গ্রামে নাকি কোন রূপেই কলেরা বসন্ত প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব হয় না এবং হয়ে থাকলে অবিলম্বে বন্ধ হয়ে যায়। কলমেষত্তু চিত্রকলা জন্মের পিছনে কোন ইতিহাস রয়েছে আজ তা নির্ণয় করা সহজ সাধ্য নয়। সম্ভবতঃ এই পূজা এককালে মেয়েদের অধিকারেই ছিল। পরে সমাজে কর্তৃত্ব বদলের সাথে সাথে তা পুরুষদের অধিকারে চলে যায়। অথবা প্রাচীন এবং পরবর্তিকালে সমাজে লুপ্ত মাতৃ-প্রাধান্যের স্মৃতি পুরুষপ্রধান সমাজের ভিত্তিগাত্র ফুঁড়ে এই উগ্রা ভয়ংকরী দেবী বেরিয়ে এসে পুরুষ প্রধান সমাজে ত্রাস সৃষ্টি করেন, পূজা আদায় করেন, পূজায় তুষ্ট হয়ে বরাভয় দেন। বাংলার ঘেঁটু, মনসা, শীতলা দেবীরাও কী একই ভাবে আবির্ভূতা হন নি? 'চ্যাং-মুড়ি কানী'রা সর্বত্রই 'দেবশূলপানির' গর্বিত ভক্তদের কাছ থেকে পূজা আদায় করে ছেড়েছেন।

কলমেষত্তু পদ্ধতির আরো কয়েকটি আলপনা জাতীয় চিত্রকলার উল্লেখ করে রাখা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বাংলার বিভিন্ন উৎসবে বিভিন্ন অর্থদ্যোতক আলপনা চিত্রের প্রচলন রয়েছে।

তারই সমান্তরাল রীতি রয়েছে কেরলেও। সর্পপাট্টু, তীয়াট্টু, পুল্লুবন পাট্টু প্রভৃতি চিত্রাংকন রীতি লৌকিক চিত্রকলার বিভিন্ন অনবদ্য অভিব্যক্তি। এগুলিও বিশেষ ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ডের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে অংকিত ও ব্যবহৃত হয়। সর্পপাট্টুতে দেখি বিভিন্ন ধরণের সাপের চিত্র অংকিত করা হয় এবং তার সুমুখে বসে স্তবস্তুতি গান গীত হয়। তীয়াট্টু চিত্রের পূজারী প্রবেশ করে প্রজ্বলিত চিতায় পুল্লুবন পাট্টুর চিত্র রচনা আরো একটু জটিল। এই চিত্রে দেখা যায় পুল্লুবন চলেছেন বীণা বাজাতে বাজাতে আর তাঁর স্ত্রী কলসী দিয়ে তৈরী এক ধরনের বাদ্যযন্ত্রসহ স্বামীর অনুগমন করছেন। সঙ্গে রয়েছে বিভিন্ন ধরণের সাপ।

কেরলীয় চিত্রশিল্পের একটি প্রাচীন শাখা মুখোশ অংকন। বলা বাহুল্য এই চিত্রশিল্পের উদ্ভবও ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ডের অঙ্গরূপে। বিশেষ ধরণের বিশ্বাসের প্রভাব এই ধর্মানুষ্ঠানের উপজীব্য। এই মুখোশ তৈরী হয় ধারণ করে নৃত্যগীত করার জন্য। মুখোশগুলো হয় সাধারণতঃ যমরাজ, কালভৈরব এবং বিভিন্ন শাস্তার সংহারমূর্তি। তাঁরা কোন সময়ে সমাজে প্রচলিত বা অনুপ্রবিষ্ঠ কোন বিপরিতধর্মী শক্তিকে সংহার করার জন্য রুদ্র মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন তা আজ বলা গবেষণাসাপেক্ষ। তবে লক্ষ্য করলেই দেখা যায় এই সব দেবতারা কেউই বৈদিক নন। শাস্তা তো নিঃসন্দেহে হরিহর পুত্র। তিনি বুদ্ধের পাঠশালার সর্দার পড়ুয়া। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে এই মুখোশচিত্র এককালে কেরলের জ্যোতিষি জাতি 'কণিয়াণ' দের দ্বারা রচিত হত।

কলমেষত্তু, মুখোশ প্রভৃতি চিত্রের পাশাপাশী বাংলার পটশিল্প জাতীয় চিত্ররচনার রীতিও কেরলে যথেষ্ট বিকাশ লাভ করেছিল। এখনো বহু হিন্দু গৃহে সেই সব শিল্প নিদর্শনের কিছু কিছু কালের কষাঘাতে জর্জরিত অবস্থায় পাওয়া যায়। বাংলার পটশিল্পীরা যেমন আপনাপন প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন বিভিন্ন ধরনের মৃৎপাত্রের

গাত্রে কেরলের প্রাচীন পটশিল্পীরাও তেমন ধনুক, বল্লম, পালকী, ঢাল, খাট চৌকি প্রভৃতির গাত্রে সহজলভ্য মৌলিক রং এবং আপনাপন পরীক্ষা নীরিক্ষার ফলে উদ্ভুত মিশ্রিত রং এর ব্যবহারে প্রতিভাদীপ্ত শিল্পকুশলতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। এই সব শিল্পকর্মে বর্ণ প্রয়োগরীতির চমৎকারিত্ব, বিষয় নির্বাচন এবং প্রকাশের মনোহর মৌলিকত্বই প্রমাণ দেয় শিল্পীপ্রজ্ঞার কোন স্তরে তাঁরা পৌঁছে গিছলেন।

কেরলের বিভিন্ন মন্দির এবং গীর্জা গাত্রের ভিত্তিচিত্রও চিত্র-শিল্পের ক্ষেত্রে ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্যের যোগ্য প্রতিভূ।

সেকালে কেরলে রাজপ্রাসাদেও ভিত্তিচিত্র আংকনের রেওয়াজ ছিল। এই সব ভিত্তিচিত্রে পড়েছে বিভিন্ন সংস্কৃতি এবং শৈলীর প্রভাব। মন্দিরগাত্র চিত্রিত করার জন্য পাশের মহীশূর প্রভৃতি অঞ্চল থেকে মাঝে মাঝে যে সব চিত্রকরদের নিয়োজিত করা হত তাঁদের দ্বারা কেরলে কাঞ্জিভরম প্রভৃতি স্থানের পহ্লবশৈলী দ্বারা প্রভাবান্বিত ভিত্তিচিত্রাবলী অংকিত হয়। এ-ছাড়া বৌদ্ধ রীতি এবং পাশ্চাত্য রীতির প্রভাবও এই সব ভিত্তিচিত্রে সুস্পষ্ট বলে অনেকে মনে করেন। কেরলের ভিত্তিচিত্রের স্বর্ণযুগরূপে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সময়কেই চিহ্নিত করা হয়েছে। সুতরাং সেখানে ইতিমধ্যেই পাশ্চাত্যের ভাবধারা, ধর্ম, গীর্জা, গীর্জার ভিত্তিচিত্র সবকিছুই এসে গিয়েছিল। তবে দক্ষিণ কেরলের তিরুনন্দিক্করা মন্দিরের ভিত্তিচিত্রের রচনাকাল অষ্টম শতাব্দীর শেষার্ধ বলে মনে করা হয় এট্টুমানুর মন্দির দ্বারে অংকিত নটরাজ চিত্রও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কেউ কেউ বলেন প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার চরমবিকাশের নিদর্শন এই চিত্রটি।

কেরলে অবস্থিত অজস্র ভিত্তিচিত্রের পরিচয় এবং ব্যাখ্যা দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। পাণ্ডিতদের কারো কারো মতে কেরলের ভিত্তিচিত্র অজন্তা, ইলোরার সমগোত্রীয়। হঠাৎ আবিষ্কারের আকর্ষণ থাকলে কেরলের প্রাচীন চিত্রশিল্পও আলোড়ন তুলতে সক্ষম হত। তবু চিত্রশিল্পে কেরলের প্রসিদ্ধির ব্যাপকতা বিদগ্ধজনবিদিত।

একালের রবিবর্মা এবং তাঁর ভ্রাতা রাজরাজ বর্মা কেরলের চিত্র-শিল্পকে আধুনিক যুগে উত্তরণ এবং বিকাশে যে যোগ্যতা এবং প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তা তাঁদের, বিশেষ করে রবিবর্মাকে ভারতীয় আধুনিক চিত্রশিল্পের অন্যতম দিকপালের আসনে বসিয়েছে। চিত্রশিল্পে রবিবর্মা এই সেদিন পর্যন্তও ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। রবিবর্মা মারা যান ১৯০৬ খৃঃ অব্দে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ছিল তাঁর প্রতিভার মধ্যাহ্ন দীপ্তি।

জাতির জীবনে শিল্পসত্যের আবির্ভাব যখন বিভিন্ন শাখায় প্রকাশ লাভ করে তখন স্বর্গের অপ্সরারাও লজ্জায় অধোবদন হয়, দেবরাজ ইন্দ্র এসে হাত পেতে দাঁড়ায় প্রসাদলাভের প্রত্যাশায়। শিল্পী সৃষ্টি করে চলে অজন্তা ইলোরায় তার ধ্যানের স্বর্গ, মোনালিসার ওষ্ঠে আপন প্রাণের শ্রেষ্ঠ কামনার হাসিটি, সৃষ্টি করে নটরাজের অনবদ্য নৃত্যরত মূর্তি।

কেরলের একদিকে ধ্যানগম্ভীর অনন্ত জিজ্ঞাসু পর্বতমালা অন্যদিকে অতল কালো সাগর। সাগরের ঢেউ এসে সগর্জনে আছড়ে পড়ে শস্যশ্যামলা কেরল সমভূমির কোলে। সেই আছাড়ি পিছাড়ি ঢেউ এর নৃত্য যেমনই ভয়াল তেমনই সুন্দর। আকাশে শান্তবীজন করে ফল ভরে বেপথু নারিকেল বীথি। কোকিল ডাকে, ফুল ফোটে, ভোমরার গুঞ্জরণ শোনা যায়, ফল হয়—সৃষ্টিচক্রের আবর্তন চলে কেরলকেও সঙ্গে নিয়ে। সন্ধ্যার কোমল সলজ্জ আলোক এসে ঠোঁঠ ঠেকায় কেরলের উন্নত চন্দন বনে! উষার চুম্বনে দিন সুরু করে দিগন্তবিস্তারী বন প্রান্তর।

সমতল আর সাগর উপকূলের জীবন এখানে পাশাপাশী। একদিকে শান্ত, ধীর অন্যদিকে অস্থির গম্ভীর। এ পাশে সন্ধ্যাপ্রদীপের স্নিগ্ধতা, ওপাশে উত্তাল সাগর-তুফানের ভয়ংকর ভ্রূকুটি। তারই মাঝে নিত্য বিকাশশীল কেরল বাসীদের জীবন, তাদের সমাজ তাদের হাসি তাদের কান্না, তাদের মিলন ও বিরহ।

নিশ্চিন্ততা এবং আতংক পাশাপাশী। প্রকৃতি এখানে কোথাও মনোহারিণী, কোথাও প্রাণহারিণী, কোথাও মাতা, কোথাও বিমাতা।

এবং এই বিপরীতধর্মী শক্তির সংঘাতেই সৃষ্ট কেরল-অগ্রগতির প্রেরণা।

এই প্রেরণা বিধৃত তার শিল্পে, তার সাহিত্যে, তার দর্শনে, তার মর্মে, তার কর্মে।

মালয়ালম সাহিত্যের ইতিহাস ভারতের অন্যান্য অংশের ইতিহাসের মতই। কেরলেও সাহিত্যের যাত্রা সুরু সংস্কৃত ভাষায় পরে মালয়ালম ভাষায় যাত্রাবদল।

সংস্কৃতই ছিল বৈদিক আর্যদের কথ্যভাষা। নাম্বুদিরীরাও মুখে সংস্কৃত বুলি এবং বগলদাবায় ঐ ভাষারই তৎকালীন সাহিত্যসম্ভার নিয়ে কেরলে আসেন সদ্যঅর্জিত রাজ্যপাটে জেঁকে বসতে। সকালের রোদ এসে ঘাসের ডগার শিশিরবিন্দুকে চুমু খাওয়ার আগেই নাম্বুদিরী পল্লীগুলি মুখর হয়ে উঠত বিদ্যার্থীদের উচ্চারিত বেদমন্ত্রে, বৈদিক আচার অনুষ্ঠানে।

ধর্মণা মিত্রাবরুণা বিপশ্চিতা ব্রতা রক্ষেথে অসুরস্য মায়য়া।
ঋতেন বিশ্বং ভুবনং বি রাজথঃ সূর্যমা ধত্থো দিবি চিত্র্যংরথম্।
[ঋগ্বেদ : ৫ : ৬৩ : ৭]

হে মিত্রাবরুণ, তোমরা ধর্ম এবং অসুরের মায়াদ্বারা যজ্ঞগুলি রক্ষা কর। এই বিশ্বভূবনকে ঋতদ্বারা প্রদীপ্ত কর, সূর্যকে তার সুশোভিত রথসহ ধারণ কর।

কিন্তু পুরুষানুক্রমে একই ধারাপাত মুখস্ত করে মানুষ তৃপ্ত হতে পারে না। নতুন নতুন উন্মেষশালিনী জ্ঞান তার বহিঃপ্রকাশের রাস্তা খোঁজ করে ফেরে। বেদাধ্যয়ন, শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকলাপ, দৈনন্দিন জীবন ও সমাজে উদ্ভূত বিভিন্ন ধরণের সমস্যা এবং নতুন জ্ঞানের

অভিজ্ঞতার মধ্য থেকেই ধীরে ধীরে নতুন উপলব্ধিকে লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন বোধ করে।

সমাজজীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে জীবিকার জন্য কোনপ্রকার কায়িক শ্রম করতে হত না নাম্বুদিরীদের। সে ভার ন্যস্ত ছিল নায়ার কুট্টিয়ান আর দাসদের উপর। এদের শ্রমস্বত্বভোজী ছিলেন নাম্বুদিরীরা। নিজেদের নিয়োজিত রাখতেন পরমার্থ সন্ধানে! অবসর ছিল নিশ্ছিদ্র, জীবনযাপন ছিল অনাড়ম্বর এবং প্রাচুর্যের প্রসাদপুষ্ট। নিশ্চিন্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল ভাবীপুরুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তাও। ইহকালটার কোন ভাবনা না থাকায় তাঁরা ব্যস্ত থাকতেন পরকাল এবং তার আনুষঙ্গিক সবকিছুরই একটা সুব্যবস্থা করে নিতে। আর সেই পরকালটা কেমন, কী তার রূপ, সেখানে দিন কাটাবার সুযোগসুবিধা কেমন ইত্যাদি চিন্তাও দানা বাঁধতে লাগল মনে। কল্পনা সেই অনুকূল হাওয়ায় পাখনা মেলে দিয়ে মননের আকাশপথে ছুটতে লাগল, আবিষ্কার করতে লাগল নতুন নতুন দিগন্ত।

গুরুকুলের শিক্ষা নাম্বুদিরীদের ক্ষেত্রে ছিল নিঃশুল্ক। টোলজাতীয় বিদ্যায়তনে সকল নাম্বুদিরী তনয়কেই সাতবছর বয়সে ভর্তি হতে হত। অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থা এবং শিক্ষকদের ছাত্রদের কাছে জ্ঞানভাণ্ডার গচ্ছিত রেখে যাওয়ার স্বাভাবিক প্রেরণা নাম্বুদিরী সমাজকে বহু দিকপাল পণ্ডিত উপহার দিতে পেরেছিল। শ্রুতি, মীমাংসা এবং তর্ক ও ব্যাকরণের বহু বরেণ্য পণ্ডিত জন্মেছিলেন কেরলে। আর জন্মেছিলেন সংস্কৃত চিরায়ত সাহিত্যের অনেক কবি এবং সাহিত্যিক।

কেরলে বৃটিশ-শাসন কায়েম হওয়ার আগে পর্যন্ত সামন্তরাজারা সকলেই সংস্কৃত অনুশীলনের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন। এজন্য রাজকোষ থেকে ব্যয়ও করতেন মুক্তহস্তে।

নাম্বুদিরী এবং নায়াররা এসেছিলেন উত্তর ভারত থেকে। সংস্কৃত ছিল নাম্বুদিরীদের মাতৃভাষা। এই ভাষার সাহায্যেই তাঁরা

ভাববিনিময় করতেন, চিন্তা এবং চিন্তালব্ধ জ্ঞানের আদানপ্রদান করতেন। বেদ ছিল তাঁদের সাতবছর বয়স থেকে অবশ্যপাঠ্য বিষয়। মাতৃভাষা সংস্কৃত আর্যদের এই বিচ্ছিন্ন অংশটির হাতে শাখাপল্লব বিস্তার করতে সুরু করল।

তৎকালীন এবং পরবর্তিকালে এই সেদিন পর্যন্তও সাহিত্যসৃষ্টির মূল প্রেরণা ছিল ধর্ম। ধর্মকে বিভিন্ন প্রতীক ও প্রতিমার সাহায্যে লোকশিক্ষার জন্য প্রচার করার প্রয়োজনীয়তা এবং চিন্তাশীলদের চিন্তার ফসলকে ধারণ করার জন্য জন্ম নিল কাব্য ও নাট্যসাহিত্য। কাব্য যে প্রেরণা থেকে জন্মলাভ করে নাটকের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম না থাকায় নাটককে বলা হত দৃশ্যকাব্য। দৃশ্যকাব্য বলেও বোধ হয় নাটকের সবটুকু তুলনামূলক পরিচয় দেওয়া সম্ভব হয় নি বলেই নাটক সম্পর্কে বলা হয়েছে নাটকান্তং কবিত্বম্।

কেরলে রচিত সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের লেখক পরিচিতিতে যে নামটি প্রথমে উচ্চারিত হয় সেটি হচ্ছে ভারত। তবে ভারত সম্পর্কে বিভিন্ন পণ্ডিতের বিভিন্ন মত। তিনি যে ঠিক কোথাকার মানুষ সেটা সুনিশ্চিত নির্ধারণের জন্য এখনো অনেক মাথা ঘামছে, যেমন ঘামছে কালীদাসের সিটিজেনশিপ সম্পর্কে।

মহাকবি কালীদাসও কবি ভারতের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন।

ভারতের পরই আসে কবি শীলভদ্রের নাম। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন কেরলের অধিবাসী। তিনি যে সপ্তাঙ্ক নাটকখানি লেখেন তার নাম 'আশ্চর্য চূড়ামণি'। এছাড়া 'কমলিনী রাজহংসম্', 'চন্দ্রকলাপীডম্' 'প্রদ্যুম্নাভ্যুদয়ম্', 'সীতারাঘবম্' প্রভৃতি নাটকের উল্লেখ করতে হয়।

দ্বাদশ শতাব্দীর কুলশেখর বর্মন রচিত 'তপতিসংবরণ' এবং 'সুভদ্রাধনঞ্জয়ম্' নাটক দুখানি ছন্দের চমৎকারিত্বের জন্য বিখ্যাত।

হাস্যরসের নাটকগুলির মধ্যে বীট বা লম্পটের একদিনের অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তুর উপকরণে রচিত নাটকগুলি তৎকালীন নাম্বুদিরী

সমাজে প্রবাহিত আনন্দ ধারার উপরই আলোকপাত করে। এই শ্রেণীর নাটকগুলির মধ্যে 'বাটনিদ্রাভাণম্' 'শৃংগারলীলাকেতু-চরিতম্' প্রভৃতি নাটকগুলির নাম উল্লেখ করা যায়। এ ছাড়া প্রহসনজাতীয় নাটকের সংখ্যাও কম নয়।

কেরলে রচিত সংস্কৃত কাব্যগুলিও সংখ্যা এবং গুণগত উৎকর্ষের বিচারে দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত তবে প্রত্যেকটি কাব্যই কালীদাস প্রভৃতি সংস্কৃত সাহিত্যের দিকপালদের দ্বারা প্রভাবান্বিত। গুরুগম্ভীর শব্দচয়ন, কৃত্রিম আভিজাত্যের ঠসক এবং বড় বড় কবিদের অনুকৃত শৈলী সেই সব কাব্যে সুপরিস্ফুট। এই পর্য্যায়ের কাব্যগুলির মধ্যে নলোদয়ম, সীতাহরণম্, ত্রিপুরদহনম্ প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থগুলি উল্লেখের দাবী রাখে।

প্রাকৃত ভাষায় রচিত কাব্যগুলির মধ্যে রামপাণিবাদএর 'কংসবহা'র নাম উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত দূতকাব্য বা সন্দেশকাব্য পর্যায়ের 'কামসন্দেশম্', 'ভ্রমরসন্দেশম্', 'হংসসন্দেশম্', 'ময়ূরসন্দেশম্', 'কোকিলসন্দেশম্' প্রভৃতি কাব্যগুলি মেঘদূতকেই স্মরণ করিয়া দেয়।

কেরলে সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চায় ছেদ পড়ে নি। কবে কেরলের নাম্বুদিরীদের মাতৃভাষা মালয়ালম্ হয়ে গেছে সেখবর আজ কোন নাম্বুদিরীই দিতে পারবে না তবে এখনো কেরলের কোন কোন মন্দিরে দেখা যায় কুটিয়াট্টম্ বা সংযুক্ত ভাষায় অভিনয়, যার উৎপত্তিকাল খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীরও আগে। কুটিয়াট্টম্ মন্দিরের ক্রিয়াকাণ্ডেরই অঙ্গ। মন্দিরের বাইরে কখনও এই অভিনয় প্রদর্শিত হয় না। কেরল মন্দিরের সংস্কৃত নাটকের প্রদর্শন সেই লুপ্তদিনের ঐতিহ্যের বাহক যেদিন সংস্কৃত ছিল আর্যসমাজের মাতৃভাষা। এই সংযুক্ত অভিনয়ের জন্য আগে যখন কেরলের শিক্ষিত মানুষের হাতে সময় ছিল প্রচুর অবসর ছিল নিশ্চিন্ত তখন বিভিন্ন নাটকের অভিনয়ে পাদপীঠ প্রদীপ্ত এবং দর্শকদের শিল্পপ্রেম পরিতৃপ্ত হত। এখন সব মন্দিরে এই অভিনয় হয় না—হয় দু একটি মন্দিরে তাও সম্পূর্ণ নাটক নয়। 'সুভদ্রাধনঞ্জয়ম্'

নাটকের প্রথম অংকটিই এই উদ্দেশ্যে অভিনীত হয়ে থাকে। আজ ঐভাবে নাটক প্রদর্শন বা দর্শনের সময় কোথায় মানুষের! এই একটি অংক অভিনয় হতেই লাগে এগারো রাত।

সংস্কৃত নাটকের অভিনয়, তা সে এক অংকেরই হোক আর যাই হোক না কেন এখনো যেমন সংস্কৃত ভারতীর মন্দিরে টিমটিমে প্রদীপ জেলে রেখেছে তেমনই সংস্কৃত সাহিত্যসৃষ্টিও চলেছে আজও। এই বিংশ শতাব্দীতেই এ, আর, রাজরাজ বর্মা দ্বারা রচিত হয়েছে "আংগ্লসাম্রাজ্যম্" নামক সুবিশাল কাব্যগ্রন্থ। গ্রন্থটি ভারতে ইংরাজ রাজত্বের উপর লিখিত। পরিচ্ছন্ন সরল অনাড়ম্বর ভাষা, স্বচ্ছন্দ প্রকাশভঙ্গী এবং অনাবিল রচনাশৈলী পুস্তকটির প্রধান গুণ।

সংস্কৃত গীতিকাব্যে কেরলের অবদান সংস্কৃত সাহিত্যের এই শাখাটিকেও সমৃদ্ধ করেছে। শৈব এবং বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব বেশীর ভাগ গীতিকাব্যেরই মূল উপজীব্য। কেরলে প্রণীত সংস্কৃত গীতিকাব্যগুলি মূলতঃ ভক্তি মার্গী। শুধু কেরলেই বা কেন সর্বদেশে সর্বকালে সর্বভাষায় গীতিকাব্যের মৌলিক আবেদন ভক্তিরসেই অভিষিক্ত। গীতিকাব্যের মূল উৎস কবিহৃদয়ের উষ্ণতায় কেরলে রচিত গীতিকাব্য-গুলি প্রাণবন্ত।

কেরলে সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনের সব কয়টি শাখারই সুগভীর চর্চা হত একদিন। সারাভারতে তখন সংস্কৃত সাহিত্যের বড় জমজমাট অবস্থা। সংস্কৃত চম্পূকাব্যও (গদ্য এবং পদ্যয় মিলিত রচনা) কেরলে রচিত হয়েছিল। চম্পূকাব্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'মানবিক্রমচম্পূ,' 'উত্তরামায়ণম্ চম্পূ' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি।

সাহিত্যের উন্নতির সাথে সাথে সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণকে এগিয়ে যেতে হয়েছে সমান তালে পা ফেলে। ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় বহু কাব্যও কেরলে রচিত হয়। কেরলে প্রচলিত ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর

সুসংবদ্ধ এবং গ্রাহ্য স্বরূপ পাওয়া যায় স্বরূপরাঘবম্, ধাতুকাব্যম্, হেত্বাভাসোদাহরণম্ প্রভৃতি গ্রন্থগুলিতে।

সংস্কৃত গদ্য সাহিত্য রচনায়ও কেরল পিছিয়ে থাকে নি। গদ্যরচনা গুলিতে প্রধানতঃ পৌরাণিক কাহিনীর সর্বজনবোধ্য রূপ দেওয়া হয়েছে। একা মেল্লুত্তুর ভট্টতিরীরই এ ধরণের রচনাসংখ্যা প্রায় ষাটের কাছাকাছি। ভট্টতিরীর কাহিনীগুলিতে প্রধানতঃ রামায়ণ মহাভারত এবং ভাগবতের বিভিন্ন কাহিনী আধারিত। অবশ্য কিছু সংখ্যক লোকগাথাও কয়েকটির উপজীব্য।

কেরলে যে সব আর্যরা সেই প্রাচীন যুগে বসবাস করতে যান তাঁদের মাতৃভাষা সংস্কৃত ছিল একথা আমরা আগেই বলেছি। বেদ ছিল তাঁদের বাস্তব জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত এবং তার অনুশীলন নিত্যকর্মাবলীর অচ্ছেদ্য অঙ্গ। নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে এবং অনায়াস জীবন-যাত্রায় আধ্যাত্মিকতার বিকাশ হতে থাকে তাঁদের মধ্যে। প্রকৃতির প্রতিটি কার্যের কারণ অনুসন্ধানে তাঁরা ব্যপৃত হয়ে পড়েন স্বাভাবিক ভাবেই। সুরু হয় দর্শনচর্চা। ভারতীয় দর্শন সম্পদের দিকে তাকালে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয় কেরলের অবদান সম্ভার দেখে। শুধু কী শাস্ত্র? সে সময় কেরল যদি শংকরাচার্য, মাধ্বচার্য এবং রামানুজের মত পণ্ডিত এবং করিতকর্মা অমিত উৎসাহী সংস্কারকদের জন্ম না দিত তা হলে বৌদ্ধধর্মের কাছে হিন্দুধর্মের আত্মসমর্পন এবং বিলীন হওয়া ছাড়া অন্য কোন রাস্তা খোলা ছিল না। ভারত থেকে বৌদ্ধধর্মের শিকড় পর্যন্ত নাড়িয়ে দিয়েছিলেন শংকরাচার্য এবং উত্তরসূরীরা। বৌদ্ধধর্মের বন্যায় বাঁধ দিয়ে শংকরাচার্য মাধ্বাচার্য, রামানুজ, প্রভাকর প্রভৃতিরা তাকে বদ্ধজলায় পরিণত করেন অন্যথায় সেই বন্যাধারায় হিন্দুধর্মের ভেসে যাওয়াই ছিল নিয়তি।

কেরলের এইসব প্রতিভাধর পণ্ডিতদের কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেওয়ার চেষ্টা করা যাচ্ছে।

মাত্র ৩২ বছর পরমায়ু নিয়ে জন্মেছিলেন জগদ্গুরু শংকরাচার্য। কিন্তু এই অত্যল্প সময়ের মধ্যে তিনি যে অসাধ্য সাধন করে গেছেন তা বুঝি পরবর্তি যুগের স্বামী বিবেকানন্দের অতিমানবীয় ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গেই একমাত্র তুলনীয়। দুজনেই দু'যুগের হিন্দু ধর্মের পুনর্জাগরণের মহান ব্রত নিয়েই যেন জন্মেছিলেন।

ভারতীয় ষড়দর্শনে অদ্বৈত বেদান্তের এক বিশেষ স্থান রয়েছে। অদ্বৈত বেদান্ত বলতেই যেন বোঝায় শংকরাচার্যকে। তিনি যে শুধুমাত্র ভারতের কোন এক বিশেষ কালের দিগ্বিজয়ী দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন তাই নয় আজো পর্যন্ত পৃথিবীর সর্বকালের আঙ্গুলে গোনা প্রথমশ্রেণীর দার্শনিকদের সঙ্গে তাঁর নামও এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হয়ে থাকে। ভারতীয় দর্শনে তিনি এক নতুন যুগ এবং নতুন দিগন্তের যবনিকা উন্মোচন করেন। শংকরাচার্যের ভাষ্যের ওপর যত ভাষ্য এবং টীকা বিভিন্ন সময়ে লিখিত হয়েছে তা আর কারো ক্ষেত্রে হয় নি। এটুকুই কেবল তাঁর পাণ্ডিত্যের গাম্ভীর্য এবং গভীরতা, মনন এবং প্রতিভার পরিচয় দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

শংকরাচার্যের আবির্ভাব কাল সনাতন হিন্দুধর্মের এক মহাসংকট কাল বলেই অনেকে মনে করেন। একদিকে বৌদ্ধধর্মের প্লাবন অন্যদিকে বৈষ্ণবধর্মের ভক্তিমার্গী রূপ— এই দুয়ের মাঝখানে পড়ে হিন্দুধর্ম তার নিজের জটে নিজেই জড়িয়ে পড়েছিল। বৌদ্ধধর্ম এবং বৈষ্ণবধর্মের আবেদন সোজাসুজি এসে সাধারণ মানুষের মনকে প্রভাবিত করতে থাকে। বৈদিকধর্মের বর্ণাশ্রম প্রভৃতির জটিল বন্ধনের বেড়া ডিঙ্গিয়ে সাধারণ মানুষের মনের কপাট খোলে না। সাধারণ মানুষ তার আপন ধর্ম বলে গ্রহণ করতে থাকে বৌদ্ধধর্মকে। কারণ সেটাই তখন শক্তিশালী সুব্যবস্থিত প্রতিষ্ঠান মারফত আপন প্রচারকার্য চালিয়ে চলেছে। প্রচারবিমুখ রক্ষণশীল হিন্দুধর্ম সেখানে কোণঠাসা হয়ে পড়ে। বৌদ্ধ, বৈষ্ণব এবং তান্ত্রিক মত লোকায়ত মননে আপন শিকড় চালিয়ে চলে অবাধ গতিতে স্বভাবনিয়মে।

এমনই এক সময়ে শংকরাচার্য এগিয়ে এলেন তাঁর তীক্ষ্ণধী বুদ্ধি বিদ্যা এবং প্রচণ্ড সংগঠন শক্তি নিয়ে।

অনেক পণ্ডিত মনে করেন তৎকালীন সমাজ জীবনের জটিলতা এবং সংকীর্ণতার সঙ্গে শংকরাচার্য রফা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ব্রহ্মবিদ পণ্ডিত কেন গীতাভাষ্য লিখতে গেলেন? অনেকে মনে করেন উদ্দেশ্যটা সুস্পষ্ট। তদানীন্তন কালে দুটি সবচেয়ে প্রভাবশালী ধর্মীয় ধারা প্রবাহিত হচ্ছিল ভারতভূমে। একটা বৈষ্ণব অন্যটা বৌদ্ধ। বৈষ্ণবধর্মে চিরকালই দাম্ভিকতা অনুপস্থিত। পাণ্ডিত্যাভিমানীও ছিল না বৈষ্ণব সম্প্রদায়। সমাজের সাধারণ মানুষের মধ্যে ভক্তি সর্বস্ব এই ধর্মমত তাই প্রচণ্ড প্রভাবের অধিকার কায়েম করে নিয়েছিল। গীতাভাষ্য লিখে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মন জয় করতে এবং আপন বৈদিক রীতির চিন্তাধারা গীতার মাধ্যমে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে সঞ্চারিত করে তাদের সঙ্গে একটা অলিখিত রফা হয়ত তিনি করে নিতে চেয়েছিলেন। প্রতিপক্ষ যখন দুটি শক্তিশালী শক্তি এবং নিজের শক্তি উল্লেখযোগ্য নয় তখন এছাড়া অন্য কোন ভাল পথও ছিল না হয়ত। ধর্মপ্রচার এবং প্রসারের ক্ষেত্রে সর্বকালেই বিভিন্ন ধরণের কূট কর্মপন্থা অবলম্বন করা হয়েছে দেখা যায়। এটাও তারই এক দৃষ্টান্ত কিনা ভেবে দেখা যেতে পারে।

এরপর তিনি সরাসরি বৌদ্ধধর্মের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রটিই তুলে নিলেন হাতে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে তার উপর থেকে টেনে খুলে ফেললেন পীত আবরণ, চাপালেন গৈরিক। নাগার্জুনের সংবৃত্তি সত্য (Ultimate truth) আর পরমার্থিক সত্য (Emperical truth) এর সঙ্গে শংকরাচার্যের অদ্বৈত মতটা মিলিয়ে দেখে অনেক পণ্ডিত এই রায়ই দিয়েছেন। তাঁদের মতে বৌদ্ধ দর্শনের মূল বীজমন্ত্রকেই শংকরাচার্য অদ্ভুত তার্কিক শক্তিতে বৈদিক বলে প্রমাণ করে ছেড়েছেন। বেদের অপৌরুষেয়তার প্রশ্নে তিনি এমনই হাবভাব দেখিয়েছেন তাঁর যুক্তিজাল বিস্তারকালে যে সেটাকে সেদিন অবিসম্বাদিত সত্য বলে তিনি দাঁড় করাতে পেরেছিলেন পণ্ডিত এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে।

তিনি এই পৃথিবী এবং জীবনটাকে এক ফুৎকারে দিছলেন উড়িয়ে। এ মায়া। এই মায়ার প্রভাবই নাকি পরমার্থ সন্ধানের পথে কুয়াশার জাল বিছিয়ে মানুষকে আড়াল করে রেখেছে।

শংকরাচার্য নিঃসন্দেহে এক সংকটময় মুহূর্তে বাতাস বুঝে ছাতা ধরে হিন্দুধর্মকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। ভারতের দক্ষিণপ্রান্তের মানুষ হয়েও তিনি ভারতের তদানীন্তন উল্লেখযোগ্য পণ্ডিতদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন তাঁদের বেশীর ভাগকেই এনেছিলেন স্বমতের আওতায়। যেটা ছিল আপন মত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অপরিহার্য। তাঁর দুর্জয় প্রতিভা, বক্তব্য উপস্থাপনার নিখুঁত ভঙ্গী, সূক্ষ্ম যুক্তিবিন্যাস দ্বারা বিপক্ষকে মোহিত করেছিলেন। তাঁর শাণিত অস্ত্রের দীপ্তিতে তাঁদের চোখ গিছল ঝলসে। আপনাপান তূণ তাঁরা শংকরাচার্যের পায়ের কাছে নামিয়ে দিয়েছিলেন অভিভূত হয়ে। এই শংকরাচার্যাই ছিলেন সমাজচ্যুতা মায়ের সন্তান। এই সমাজচ্যুতী সম্ভবত মুমূর্ষু সনাতন ধর্মের কূপমণ্ডুক সমাজপতিদের গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে সন্তানের বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়ার ফসল!

হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে শংকরাচার্যের সূত্রে সাময়িক সুফল পাওয়া গেলেও তাঁর জীবন এবং জগৎ সম্পর্কে মত এবং কর্মের প্রতি ঘৃণা পরবর্তিকালে ভারতীয় জীবনে এনেছিল আলস্য, পঙ্গুত্ব এবং কর্মবিমুখতা!

সাধারণ মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষ যারা তারা কিন্তু শংকরাচার্যের মত থেকে জীবন-যাপনের শুল্ক খুঁজে পায় নি। জগত, জীবন এবং ব্রহ্ম এই তিনের মধ্যে প্রথম দুটি মায়া এবং তৃতীয়টিই একমাত্র সত্য এই মতবাদ তাই কিছু সংখ্যক পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যের কচকচিতে পর্যবসিত হয়েছিল শেষ পর্যন্ত।

কেরলের ব্রাহ্মণ সন্তান সাত বছর বয়সে বেদ অধ্যয়ন সুরু করত গুরুগৃহস্থ বিদ্যামন্দিরে। কিন্তু শংকরাচার্য নাকি বেদের সব কয়টি শাখা মাত্র আট বছর বয়সে কণ্ঠস্থ করে ফেলেছিলেন। অনেকে

আবার বলেন, গল্পটা একটু বাড়াবাড়ি। কিন্তু তাঁরা একবারও বোধ হয় ভেবে দেখেন নি যে মাত্র ৩২ বছর বয়সের মধ্যে যাঁকে ব্রহ্মসূত্র, সমস্ত প্রধান উপনিষদগুলি এবং গীতা নিয়ে গবেষণা করে তাদের উপর ভাষ্য লিখতে হয়েছে, 'শতশ্লোকী' এবং উপদেশসহস্রী' প্রভৃতির মত দুর্লভ প্রতীভাদীপ্ত গ্রন্থরাজি রচনা করতে হয়েছে তাঁর আট বছর বয়সের মধ্যে সম্পূর্ণ বেদ তো মুখস্থ করতেই হবে। তা না হলে সময় পাবেন কখন ?

শুধু যে তিনি নিরস দার্শনিকই ছিলেন না, কেবল যে তিনি 'সর্ব সর্বেণ সম্বন্ধং, নৈব ভেদোঽস্তি কুত্রচিৎ' (আমি চেতন, সর্ব চেতন জীবেই আমি বিদ্যমান) এর মত দাঁতভাঙ্গা পাথুরে ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে ঘামাতে অকালে মারা গেছেন তা নয়, তিনি 'হরিমীড়স্তোত্রম্', 'দক্ষিণামূর্তিস্তোত্রম্', 'সৌন্দর্যলহরী', 'আনন্দলহরীর' মত গ্রন্থরাজিতে পরিচয় দিয়েছেন উচ্চশ্রেণীর কবিত্বের এবং এঁকে গেছেন আপন হৃদয়ের মধুর ভক্তিচিত্র।

একদিকে তিনি শারীরক ভাষ্য লিখে ব্রহ্মসূত্রের গোলকধাঁধাঁর জট ছাড়িয়েছেন (মতান্তরে আরো জট পাকিয়েছেন), অন্যদিকে তিনি ছুটেছেন উল্কার গতিতে ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত হাতিয়ার তুলে দিতে ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিজিত প্রায় যোদ্ধাদের হাতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বিনষ্টির জন্য। সারা ভারতের হিন্দু দার্শনিকদের কাছে তিনি পৌঁছে দিয়েছেন তাঁর যুগান্তকারী কৃতী। গড়েছেন আপন শিষ্য এবং গুণগ্রাহীদের নিয়ে ভারতের বিভিন্নস্থানে চারটি মঠ। যেগুলি থেকে পরে শত শত পণ্ডিত বেরিয়েছেন, ছড়িয়ে পড়েছেন ভারতের সকল প্রান্তে।

ভারতের তদানীন্তন প্রায় সব তীর্থই তিনি পর্যটন করেছিলেন। তাঁকে যেতে হয়েছে সেখানকার পণ্ডিতদের মধ্যে আপন চিন্তাধারা প্রবাহিত করাবার জন্য।

'শংকরবিজয়' গ্রন্থে পরবর্তিকালে তাঁর সম্পর্কে বেশ কিছু কুৎসাও

গাওয়া হয়েছে কিন্তু যার একটা জীবনে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে তারতম্য বিচার করতে হয়েছে এবং সেই গবেষণালব্ধ জ্ঞান প্রচার করার জন্য তখনকার দিনের ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত চষে বেড়াতে হয়েছে, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে দিতে হয়েছে সত্যলব্ধ জ্ঞানের বর্তিকাটি আবার বত্রিশ বছর পূর্ণ হবার আগেই মরতে হয়েছে কোথায় তাঁর অকিঞ্চিতকর ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় ? ভূমার প্রসাদ যাঁর আকণ্ঠ কোথায় তাঁর অল্পে অকিঞ্চন ? জীবন এবং জগতকে যিনি এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিলেন কোথায় তার সেই জাগতিক ব্যাপারে মোহ ?

শংকরাচার্য সংস্কৃত সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে গেছেন আপন রচনাবলীর সাহায্যে। তাঁর রচিত গ্রন্থসংখ্যা যে কত ছিল আজ আর তা বলা সম্ভব হচ্ছে না। এ সম্পর্কেও দারুণ মতভেদের কুঝটিকা।

দক্ষিণভারতে বৈষ্ণবধর্মের মূল সুরের আবির্ভাব হয় বৈদিক যুগ সুরু হওয়ার আগে থেকেই। কেউ কেউ বলেন বৈষ্ণবধর্ম মূলতঃ প্রাগৈতিহাসিক ধর্ম। ভক্তিই হচ্ছে বৈষ্ণবধর্মের প্রাণ। এই ভক্তির জন্ম ও প্রকৃতিকে চিনতে পারা জানতে পারার পর যখন তাকে আপন কাজে লাগাবার জ্ঞান মানুষ লাভ করল তখন সে ভাবল কোন এক সর্বশক্তিমান দুরন্ত প্রকৃতিকে নিয়োজিত করেছে মানবজাতির কল্যাণে। সে দেবতা শান্ত, সে দেবতা সৌম্য এবং ভক্তবৎসল। এমনই এক মানসিক উপলব্ধির মাঝেই জন্ম হয়েছিল বৈষ্ণব ধর্মের।

এ পর্যন্ত যতদূর জানা গেছে কেরলের অলওয়ার জাতিই বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক—অন্ততঃ দক্ষিণভারতে। বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক তিনজন আদিপুরুষের নাম পাওয়া গেছে—পোঁইহে, পূদত্ত আর পে। এঁরা ছিলেন অলওয়ার গোষ্ঠীরই সন্তান। এই অলওয়ার বা অরয়ররা এখন কেরলের জেলে। মাছ ধরে পেট চালায়।

মহাভারতের যুগের পঞ্চরাত্র মত আসলে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ই ছিল।

বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মের পঞ্চরাত্রমতের বিরুদ্ধে প্রচারের ফলে তা কিছুদিন নিষ্প্রভ হয়ে যায় কিন্তু শংকরাচার্য প্রমুখ পণ্ডিতদের দ্বারা ভাগবত ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা পঞ্চরাত্রমতকেও পূর্ব গৌরব ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করে।

খৃষ্টীয় অষ্টম বা নবম শতাব্দী নাগাদ এই বৈষ্ণব সম্প্রদায় বহু শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। এদের মধ্যে বিশিষ্ঠাদ্বৈতবাদও একটি শাখা। বিশিষ্ঠাদ্বৈতবাদ-দর্শনের বহু গ্রন্থই রচিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে কত যে কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে তার হদিস মেলান আজ আর সম্ভব নয়। এখনো যে সব গ্রন্থ উই, ঘূণ এবং রূপালী পোকার কৃপাদৃষ্টির প্রসাদ এড়িয়ে পাণ্ডুলিপির আকারে রয়েছে তাদের সংখ্যাও বড় কম নয়। আমরা এখন রাজনৈতিক দলবিশেষের ইতিহাস রচনায় এবং আপনাপন ঢাক পেটাতে এতই ব্যস্ত যে ওগুলোকে বিনষ্টির হাত থেকে বাঁচাবার সময় কোথায়? ভারতের প্রাচীন ভাবরাজ্যের এবং গণমানসের ইতিহাস রচনায় ওগুলো যে কোন কাজে লাগবে না একথা বলার মত নির্বোধ কী আমরা?

এই বৈষ্ণব সম্প্রদায়েরই তিরুমিড়িশি, শাঠারি, ফুলশেখর, গোন্দা, পেরিয়া, অলওয়ার প্রভৃতি গ্রন্থকর্তার নাম প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্য স্রষ্টারূপে উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে দার্শনিক গ্রন্থ রচনার ব্যাপারে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বরাবরই অরুচি। লোকহৃদয় থেকে উদ্ভূত এই ধর্মমত লোকগ্রাহ্য সাহিত্যেই করতে চেয়েছেন আপনাপন জ্ঞান এবং উপলব্ধির প্রকাশ। তাঁদের আরাধ্যকে তাঁরা পাণ্ডিত্যের পাকা সড়ক দিয়ে চতুর্দোলায় করে এনে ঘরে তোলেন না, কৃষ্ণারজনীতে নীলাম্বরীতে নিজেকে গোপন করে গাছের ছায়ায় ছায়ায় এগিয়ে যান মাধবীকুঞ্জের নিধুবনে। পায়ের নুপূর নেন খুলে—মহামিলনে সেও যে এক বড় বাধা। তাঁদের আরাধ্য তাই ভক্তিতে তুষ্ট, তাঁদের উপাসনা পদ্ধতিও তাই ভক্তিমার্গী।

রামানুজ ছিলেন প্রতিভাধর পুরুষ। তিনিই প্রথম বৈষ্ণব ধর্মকে

দার্শনিক ভাষ্যে উদ্ভাসিত করেন। শংকরাচার্যের ভাষ্য ছিল দু'চারজন পণ্ডিতের বুদ্ধিগ্রাহ্য, রামানুজ দিলেন তাকে লোকধর্মের রূপ। সাধারণ মানুষের বোধগম্য হয় এমনই সরল তার ব্যাখ্যা, তার যুক্তিবিন্যাস। তিনি শ্রুতির পরস্পরবিরোধী মতগুলোকে, শংকরের অদ্বৈত মতের সকল প্রক্রিয়ার আপন বিশিষ্ঠাদ্বৈতবাদের সঙ্গে এমন সমন্বয় সাধন করেছিলেন যে তা হয়েছিল আপামর জনসাধারণেরও বুদ্ধিগ্রাহ্য।"

মধ্বাচার্যও ছিলেন কেরলের মানুষ। তিনি ছিলেন দ্বৈতবাদের ভাষ্যকার। তাঁর রচিত ভাষ্যের নাম 'পূর্ণপ্রজ্ঞভাষ্য'। এঁরা ছাড়াও ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পণ্ডিত সংস্কৃত ভাষায় আপনাপন অনুশীলনলব্ধ জ্ঞান লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, ব্যাকরণ সর্বক্ষেত্রে কেরলে সংস্কৃত ভাষায় যে বিপুল গ্রন্থরাজি লিখিত হয়েছিল তার বিষয়বস্তু এবং উৎকর্ষ বিচার সর্বভারতীয় সংস্কৃতভাষাকেই করেছিল অলংকৃত এবং গৌরবান্বিত। সংস্কৃত ভাষায় কেরলে তৎকালীন জ্ঞানবিজ্ঞানের কোন শাখা রচিত হয় নি? কেরলের পর্বত এবং বনভূমিতে বাস হস্তীকুলের। কেরলে হস্তীপালন সম্পর্কে সংস্কৃত ভাষায় লেখা হয়েছিল 'মাতঙ্গলীলা' নামক সংস্কৃত গ্রন্থ। এখানে বলে রাখা ভাল যে কেরলের প্রায় প্রত্যেক মন্দিরেরই আছে নিজস্ব হস্তী। এছাড়া ধনী এবং জমিদাররাও হস্তীপালন করেন কেরলে এখনও। যদিও তা ক্রমশঃ কমে আসছে।

ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দক্ষিণভারতের যে অপরিসীম দান রয়েছে তার সিংহভাগ কেরলের। দক্ষিণভারত বরাবরই উত্তর ভারতের বহিঃশত্রুর আক্রমণ জনিত চাঞ্চল্য থেকে ছিল বহুদূরে। তার জীবনে ছিল না ব্যস্ততা ছিল না ঊর্ধশ্বাস পলায়নী গতি। ঘন ঘন সেখানে রাজনৈতিক পটও পরিবর্তিত হয় নি। ফলে দক্ষিণ ভারত মৌন তপস্বীর মত ধ্যানমগ্ন থেকেছে আপন সৌন্দর্য এবং প্রকৃতির দাক্ষিণ্যের কোলে।

উত্তর ভারতের ভাষাগুলো নিঃসন্দেহে সংস্কৃত ভাষা থেকে উদ্ভূত না হলেও, আদিতে ছিল দুর্বল। সংস্কৃতের অকৃপণ দান গ্রহণ করে সেগুলো সম্পাদশালী হয়ে ওঠে, ভাষার দরবারের প্রবেশ পত্র পায়। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের বিশেষ করে মাদ্রাজের তামিলভাষাই ভারতের একমাত্র ভাষা যে সংস্কৃতের পাশাপাশি বিকশিত হবার স্পর্ধা রাখত।

অনেকে অনুমান করেন দ্রবিড় শব্দটির উদ্ভবও তামিল শব্দ থেকে: আর্যদের উচ্চারণে তামিল দ্রাবিড় রূপ ধারণ করে।

কেরলের ভাষার নাম মালয়ালম্। কেরলকেই আগে মালয়ালম বলা হত কিন্তু কের বৃক্ষের জন্মস্থান বলে (কারো কারো মতে) দেশটির নাম হয় কেরল। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে কেরলের শেষ পেরুমলরা এসেছিলেন চের দেশ থেকে তাই দেশের নাম হয় চেরল এবং পরে কেরল এই বিবর্তিত রূপ পায় চেরল শব্দ। মালয়ালম ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে নানামুনির নানা মত। কেউ বলেন মালয়ালম তামিল দুহিতা আবার কেউ কেউ মালয়ালম ভাষার মাতৃত্বের অধিকার দিয়ে বসেন সংস্কৃতকেই।

কিন্তু পর্যালোচকরা মনে করেন মালয়ালম ভাষার মাতৃত্বের অধিকার সংস্কৃত বা তামিল দুটো ভাষার একটাকেও দেওয়া যায় না। সংস্কৃত মালয়ালমের সখীর সম্মানের অধিকারী আর তামিল যমজ বোনের। আসলে মালয়লম ভাষা প্রাকআর্য ভারতের সবচেয়ে উন্নত ভাষা দ্রাবিড়েরই এক শাখা। যেমন তার আরেকটি শাখা তামিল।

সংস্কৃত ভাষা যখন কেরলে আসে তখন কেরলের নিজস্ব ভাষা ছিল যথেষ্ট উন্নত। কোনও নিয়মবদ্ধ ভাষাকে অন্য কোনও ভাষা কোনকালেই কুক্ষিগত করতে পারে না। শুধু তাই নয় কোনও প্রচলিত ভাষার কাঠামো অপর এক ভাষা তা সে যত উন্নতই হোক না কেন বদল করে দিতে পারে না। সংস্কৃত এবং তামিল উভয়

ভাষারই বহু শব্দ মালয়ালম ভাষায় ভুরি ভুরি দেখতে পাওয়া যায় বলেই একথা প্রমাণিত হয় না যে সংস্কৃত এবং তামিলের মিলিতরূপ মালয়ালম। আর্যদের কেরল আগমনের পর কেরল জনসমাজে আর্যদের অনেক কিছুই অনুপ্রবিষ্ট হয়। তার মধ্যে একটি হচ্ছে প্রচুর সংস্কৃত শব্দ। ঠিক তেমনি তামিল ভাষারও অনেক শব্দ দেখা যায় মালয়ালম ভাষায়। প্রাচীন তামিল ভাষার বহু শব্দ রয়েছে মালয়ালম ভাষার বর্তমান ব্যবহারিক রূপে। কিন্তু তামিল ভাষায় সেই শব্দগুলি এখন আর ব্যবহৃত হয় না। এর থেকেও একথা প্রমাণিত হয় না যে মালয়ালম ভাষা তামিলের দুহিতা। সৃষ্টিশীল চলমান ভাষামাত্রই গ্রহণ বর্জন এবং নতুন শব্দসৃষ্টি এই প্রক্রিয়ায় সাহায্যে ক্রমশ উন্নত হয়ে ওঠে। আজকের উন্নত ভাষাগুলোর দিকে চোখ ফেরালেই একথার সত্যতা সপ্রমাণ হবে। ইংরাজীভাষা তো এখনো সারা পৃথিবী থেকে নতুন নতুন শক্তিশালী শব্দ আত্মসাত করে চলেছে। সেক্সপীয়রের আমলের রূপ খসে গেছে ইংরাজী ভাষা থেকে— তার অর্থ নিশ্চয়ই এই নয় যে ইংরাজী এক মিশ্রভাষা হয়ে গেছে। ইংরাজী ইংরাজীই আছে। ভাষার মৌলিকত্ব রক্ষা করে ভাষার আকৃতি এবং প্রকৃতি। আকৃতি এবং প্রকৃতিগুণে মালয়ালম তাই কোন ক্রমেই তামিল বা সংস্কৃতের দুহিতা নয়।

দ্রাবিড় ভাষা সারা দক্ষিণ ভারতের ভাষা ছিল এককালে। কিন্তু প্রাকৃতিক অঞ্চলগত বিচ্ছিন্নতার দরুণ এই ভাষা উত্তর এবং দক্ষিণাঞ্চল দুটি ভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে বিকাশ লাভ করতে থাকে। উত্তরাঞ্চলের ভাষা ক্রমে কন্নড় এবং তেলেগু এই দুই ভাগে বিভক্ত হয় এবং দক্ষিণ ভাগের ভাষা বিভক্ত হয় তামিল এবং মালয়ালম এই দুইভাগে। দ্রাবিড় ভাষার মৌলিক বহুগুণ এখনো রয়েছে মালয়ালম ভাষায়। দ্রাবিড় ভাষার বহুশব্দ এখনো আবিষ্কৃতরূপে পাওয়া যায় মালয়ালম ভাষায়।

পরে সংস্কৃত ভাষা এবং আর্যদের রাজনৈতিক অধিকারের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে মালয়ালম ভাষার উপর। প্রাচীন বাংলার মত মালয়ালম

ভাষায়ও সংস্কৃতবহুল শব্দযোগে সাহিত্য সৃষ্টি হতে থাকে। এই নতুন রচনাশৈলীকে বলা হয় 'মণিপ্রবালম।' মণিপ্রবালম শৈলীর প্রভাব আধুনিক মালয়ালম ভাষায় সুস্পষ্ট। এখনও বহু শব্দ তো বটেই পুরাপুরী সংস্কৃত বাক্যই অনেকক্ষেত্রে মালয়ালম ভাষার নিজস্ব সম্পদ হয়ে গেছে।

মালয়ালম ভাষায় দাক্ষিণাত্যে হায়দারালী এবং টিপুসুলতানের রাজত্বকালে এবং তারও পরতিকালে বহু উর্দ্দু শব্দ প্রবেশ লাভ করে। ঠিক একই ভাবে আরবী পারসী হিন্দী পর্তুগীজ, ইংরাজী, চীন প্রভৃতি ভাষার শব্দও স্থান করে নেয়। সজীব ভাষার লক্ষণই হচ্ছে শব্দ সম্পদ বৃদ্ধি। শব্দের আদান প্রদানের মধ্য দিয়েই ভাষা হয় শক্তিশালী আর হয় রচনায় নতুন নতুন উন্নত ধরণের ভঙ্গীর প্রয়োগ। মালয়ালম ভাষা বর্তমানে ভারতের উন্নততম ভাষাগুলির অন্যতম।

প্রায় প্রত্যেক ভাষার আদিম ইতিহাস একই ধরনের।

ঠাকমা গল্প বল। নাতীর আবদার রাখতে ঠাকমার কপোলে পড়ে কল্পনার কুঞ্চন। এই কুঞ্চন রেখাই সাহিত্য সৃষ্টির প্রথম অঙ্গ বিক্ষেপ। অবশ্য তারও আগে সৃষ্টি হয় লোকগীতি। জীবিকার্জনী শ্রমেরই অঙ্গ রূপে বেরিয়ে আসে সেই গান। যে গান কোন প্রতীক্ষারতা প্রিয়ার খোঁপায় কুরচী ফুল দুলিয়ে দিয়ে দেখতে চায় আপন কল্পনায় সেই বাঞ্ছিতার রূপ। যে গান প্রিয় প্রতীক্ষার খবর নিয়ে ছোটে পথে প্রান্তরে আকাশে বাতাসে। যে গান প্রকৃতির কাছে যাচ্ঞা করে অনুকূল আবহাওয়া শস্যের মুখ চেয়ে। যে গান চায় বাতাসকে দিয়ে পালে ধাক্কা দিইয়ে নাওখানি কূলে ভিড়াতে।

কেরলের তদানীন্তন ভাষা আজকের মালয়ামের প্রথমাবস্থা। দ্রাবিড় ভাষার দক্ষিণ শাখা তামিলকম্ নামে বিকশিত হতে থাকে। পরে অগস্ত্যমুনি রচনা করেন এই ভাষার প্রথম ব্যাকরণ। তামিল দেশে এই ভাষা নতুন রূপ ইতিমধ্যেই পরিগ্রহ করেছে। ভাষার নামকরণও হয় নতুন করে। একে বলা হতে থাকে চেন্নমিল।

কিন্তু চেন্নমিল ছিল সাহিত্য রচনা এবং পণ্ডিতদের ভাষা। দেশের অন্যান্য অঞ্চলে যে ভাষা চলতে থাকে তাকে কটুন্তমিল বলা হত। পরে মাদ্রাজের কটুন্তমিল এবং কেরলের কটুন্তমিল দুটি পৃথক রূপ পরিগ্রহ করে।

কেরলে তখন সংস্কৃত ভাষার জমজমাট আসর। সাহিত্য রচনা হচ্ছে সংস্কৃত ভাষায়। চিন্তার ফল বিধৃত হচ্ছে আর্যদের সাহিত্যের ভাষা সংস্কৃতে। এমতাবস্থায় কেরলের কটুন্তামিল ভাষা জনসাধারণের নিত্যব্যবহার এবং পল্লী কবিদের লোকগাথা এবং লোককথা রচনার মধ্যেই থাকে সীমাবদ্ধ। ইতিমধ্যে এই ভাষায় আঞ্চলিক প্রভাব পড়ার ফলে রূপান্তরও হয়ে গেছে অনেক। যত রূপান্তরই হোক না কেন, ভাষায় আঞ্চলিক প্রভাব যতই পড়ুক না কেন তবু মালয়ালম ভাষাকে দ্রাবিড় গোত্রের ভাষা রূপে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। প্রাচীন চেন্নমিল সাহিত্যের অলংকরণের জন্য সযত্নে আহরিত শব্দাবলীর অনেকগুলি এখনো মালয়ালম ভাষাভাষীদের মুখে মুখে কথ্য ভাষা রূপে চলে কিন্তু তামিলে তাদের ব্যবহার বন্ধ হয়ে গেছে অনেক আগেই।

এই চেন্নমিল ভাষায় রচিত হয় কেরলের প্রথম সাহিত্য—লোক-গীতি। লোকগাতি উদ্ভবের প্রথম কথা সর্বদেশেই এক। জীবিকার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল একদিন গান। যে গান গেয়ে মানুষ চাইত সীসে গলা আকাশ থেকে বৃষ্টিকে আহ্বান করে আনতে, উত্তাল সমুদ্রকে শান্ত করতে। চাইত জমিকে ফলপ্রসূ করতে। দ্বিতীয় পর্যায়ে এল প্রতীক্ষিত বৃষ্টি নামার উল্লাস, জমির ফসল পেকে ওঠার আনন্দ। ফসল কেটে তুলে বিশ্রামের তৃপ্তির প্রকাশ। এবং এই আনন্দলহরী স্তিমিত হয়ে আসতে না আসতেই এসে পড়ে তৃতীয় তরংগ। এই তৃতীয় তরংগে অদৃশ্য শক্তির উদ্দেশে ঝরে পড়ে কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি।

এই মৌলিক তিন ধারা ক্রমে জীবনের বিভিন্ন দিকেও প্রসারিত হয়। বনের হাতী নামে ক্ষেতে, মা শুয়ে শুয়ে ছেলের মাথা থাবড়িয়ে

ঘুম পাড়াতে পাড়াতে যেন ঐ ছেলের ভবিষ্যত জীবনের স্পষ্ট ছবি দেখতে পায়। প্রচণ্ড শক্তিধর হয়েছে তার ছেলে, বড় হয়েছে, জঙ্গলের হাতী তাড়িয়ে নিয়ে গেছে পাহাড়ের গহন প্রদেশে। চারিদিকে সবার মুখেই মায়ের খোকনের সুখ্যাতি।

লোকগীতি এগিয়ে চলে অসীম বাধাহীন আকাশে তার ডানা মেলে দিয়ে।

দিদিমা গল্প বল।

মুত্তরুশী (দিদিমা) সুরু করে, এক যে ছিল রাক্ষস—

রাক্ষস, ভূতপেত্নী, ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী—লোক কথাও তার দীর্ঘ পদক্ষেপে সুরু করে পাদপরিক্রমা। সোঁদা মাটির পথ ডিঙ্গিয়ে ঝিঙে ফুলের পরাগ কুড়িয়ে সে সৃষ্টি করে চলে নতুন নতুন কৃতী—সেই কৃতীত্বের সার্থকতাই সন্ধ্যার আঁধারের দেওয়ালে-নাচা ছায়ার আড়ালে একটি জিজ্ঞাসু মনের জীবন জিজ্ঞাসার প্রথম পাঠ দানে।

এগুলি সব ভাষার সাহিত্যেরই প্রথম পাঠ।

এই ছেলে ভুলানো ছড়া, কাজের গান আর রূপকথার গল্পই ক্রমে ক্রমে রূপ পায় দেশকালোপযোগী লোকগীতি, লোককথায়। বিভিন্ন শাখা পল্লবে সেই নতুন কর্মও জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে যায়। হয়ে যায় চিত্তবিনোদন এবং আধ্যাত্মিকতার, সমাজের বিভিন্ন জনের মধ্যে হার্দিক একাত্মতার মাধ্যম।

কেরল মূলতঃ কৃষিপ্রধান অঞ্চল। এখানে বর্ষার তাই দারুণ সমাদর। যে বর্ষার ধারার সাথে নেমে আসেন স্বর্ণঘট কাঁকালে করে লক্ষ্মী। যে বর্ষা জমিতে নামে অমৃতরূপে তার গুণগানে আর আবাহন গানে মুখর হয় গ্রামগুলি। আবার একদিকে রয়েছে নদী এবং দেশের এক প্রান্ত জুড়ে ভয়াল এবং শান্ত, ভ্রূকুটি কুটিল এবং গম্ভীর সমুদ্র। আছে পাহাড়। বনে বনে যার বন্যহস্তীযূথের বিহার।

কেরলের প্রকৃতিসম্বন্ধীয় লোকগীতিকায় দেখা যায় এই তিনেরই প্রভাব। কোনটা কারো চেয়ে কম নয়। এছাড়া ভক্তিগীতি, বিবাহ

বাসরের এবং বিবাহের বিভিন্ন ক্রিয়াকাণ্ড কালীন গীতিও কেরলের লোকগীতি তথা লোক সাহিত্যকে নবীন অবস্থা থেকে সাবালকত্বের পর্যায়ে পৌঁছে দিতে, সাহিত্যে জনজীবনের কামনা বাসনা ভয়ভীতি সুখ-দুঃখ মিলন-বিরহ প্রভৃতি অনুভূতিকে বিধৃত করতে মার্গদর্শীর ভূমিকা নিয়েছে।

কেরলে বীরগাথা বা দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের সৃষ্টিও সামন্ত যুগে কম হয় নি। কেরল ছিল বিভিন্ন সামন্তরাজাদের অধীনে বিচ্ছিন্ন, পেরুমলদের রাজত্বকাল শেষ হবার পর থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বৃটিশ শাসন কায়েম হবার আগে পর্যন্ত। অনেক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম দেখেছে কেরলের শান্তিপ্রিয় মানুষ। দেখেছে রাজত্বের লোভে পররাজ্য আক্রমণের বর্বরতা, পরস্ব আত্মসাত করার হীনতা। গর্জে উঠেছে প্রতিবাদে। দলে দলে এগিয়ে গেছে স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে। রাজপুতনার মত কেরলেও পৃষ্ঠে অস্ত্রাঘাত প্রাপ্ত কাপুরুষের মুখের উপর দোর বন্ধ করে দেবার পরামর্শ দিয়েছেন সেদিনের চারণ কবিরা 'ওয়টুকনপাট্টু' গানে। সমরাঙ্গনে অস্ত্রের ঝনঝার মধ্যে দেশমাতৃকার হাতে পায়ে পরাবার শৃংখলধ্বনি শুনে মারণযজ্ঞে নিজেকে আহুতি দিতে উদ্বুদ্ধ হয়েছে নারীপুরুষ নির্বিশেষে।

দেশাত্মবোধক এবং যুদ্ধগীতির পাশাপাশিই বিকশিত হয়েছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ গীতমাধুরী। অঙ্গনে মালতীর পাপড়ি মেলে ধরায় উল্লসিত হয়ে উঠেছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কোলে লালিত কেরলবাসী। গেয়েছে গান। সন্ধ্যার বাতাস যখন বনসেগুনের মধ্য দিয়ে ছুটে গেছে সে যেন শুনেছে কার পদধ্বনির মর্মর তান। আবার আকাশে যখন ঝাঁক ঝাঁক কালো মেঘ আসা যাওয়া করেছে তারা দেখেছে দেবীমন্দিরের হস্তী শোভাযাত্রার প্রতিচ্ছবি। ময়ূরকে ডেকে বলেছে বার বার এসে পাহাড়চূড়ায় পেখম মেলে নাচ দেখিয়ে যেতে। যে নাচ দেখে তার অন্তরও নেচে উঠেছে বনময়ূরীর মত। বিছিয়ে দিয়েছে সে পুষ্প স্তবকের মত মাটির মত গন্ধভরা গান, সন্ধ্যা প্রদীপের

শিখার মত সীমন্তিনী রাত্রির কপালে তিলক। আবার হতাশ প্রেমিকা গেয়ে উঠেছে প্রণয়ীর বিশ্বাসঘাতকতায়:

বঁধুয়ার মন ঘুর পথে গেছে, ভগবানে গালি দেওয়া কেন,
প্রণয় গাগরী ভেঙ্গে গেছে যদি, পথে বসে মিছে কাঁদা কেন?

এই সব প্রথম অবস্থার চেন্মুমিল ভাষার লোকগীতি এখনো শুনতে পাওয়া যায় কেরলের গ্রামে, সাগরের কিনারে পাহাড়ী পল্লীতে। এইসব গানে দ্রাবিড় ভাষার প্রভাব সুস্পষ্ট। চেহারা দেখলে চেনা মুস্কিল যে এটাই মালয়ালম ভাষার প্রথম অবস্থা। অবশ্য সব ভাষারই প্রথম অবস্থার সঙ্গে পরবর্তিকালের উন্নততর অবস্থার পার্থক্য যে অনেক তা আমাদের বাংলার দিকে তাকালেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

চেন্নমিল ভাষার লোকগীতির পরে যে পর্য্যায় সুরু হয় তা হচ্ছে চেন্নমিল ভাষার ক্রমশঃ মালয়ালম ভাষার আধুনিক অবস্থায় উত্তরণের প্রথম পদক্ষেপ। এই পর্যায়ে নাম করতে হয় সেটি হচ্ছে পাট্টুকল। পাট্টুকলও নিঃসন্দেহে লোকগীতি। তবে আকৃতি এবং গুণগত বিচারে সে চেন্নমিল লোকগীতির থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। পাট্টুকল গীতির বিষয় বৈচিত্র্যই তদানীন্তন সমাজের বিভিন্ন রীতিনীতি, ধর্মীয় বোধ এবং অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে অনেক কথা বলে দেয়। দেবদেবীর মাহাত্ম্য, বিভিন্ন বীরের গুণ কীর্তন, সামাজিক অনিয়ম এবং অনাচার, দারিদ্র বেকারত্ব কোন কিছুই বাদ যায় নি পাট্টুকল সংগীতে। পাট্টুকল গীতি রচনাকালে মালয়ালম ভাষা বর্তমানের গঠন সৌষ্ঠবের কাঠামো পেয়ে গেছে দেখা যায়।

ইতিমধ্যে সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও দেখা যায় মাতৃভাষা মালয়ালমকে উন্নত স্তরে নিয়ে যাবার প্রয়াস। এই প্রয়াস ফলে যে নতুন শৈলীর উদ্ভব হয় তার নাম 'মণিপ্রবালম্'। বাংলা ভাষার প্রাথমিক যুগের মতই এখানেও দেখি মালয়ালম্ ভাষার মধ্যে সঙীন উঁচিয়ে অজস্র সংস্কৃত শব্দ খবরদারী সুরু করেছে। সংস্কৃত কণ্টকিত এই ভাষা মালয়ালম ভাষাকে শীঘ্র এক উন্নত স্তরের ভাষার

পর্যায়ে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে যে সাহায্য করেছে তা নিঃসন্দেহে প্রণিধান যোগ্য। 'পাট্টুকল' সাহিত্যের পর এল মণিপ্রবালমের যুগ এবং এই নতুন চেহারায় সৃষ্টি হল সংস্কৃতের দূতকাব্যের অনুকরণে 'সন্দেশকাব্য', গদ্য এবং পদ্য মিশ্রিত সংস্কৃতের অনুরূপ 'চম্পূকাব্য' এবং 'কৃষ্ণগাথা কাব্য'।

মালয়ালম ভাষায় এখনো চলেছে 'মণিপ্রবালম্' শৈলী। 'মণি-প্রবালম' শৈলীর প্রচলনের ফলে দ্রাবিড় গোত্রের এই ভাষার মধ্যে সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য দেখা যায় এবং স্বাভাবিক ভাবেই ভ্রান্তির সৃষ্টি হয় যে ভাষাটা হয়ত এসেছে মূল সংস্কৃত ভাষা থেকেই।

'মণিপ্রবালম্' শৈলীতে লেখা সন্দেশকাব্যের সংখ্যা অনেক। এ ছাড়াও রামায়ণ ভাগবত প্রভৃতির কাহিনী অবলম্বনেও বহু কাব্য রচিত হয়েছে। শিবরাত্রির কথা, মহাভারত, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি বহুকাব্য এই বিশেষ রীতিতেই লিখিত হয়।

চম্পূকাব্য যে কেবলমাত্র গদ্য এবং পদ্য ছন্দের মিশ্রিত রচনা তাই নয়, সংস্কৃত এবং মালয়ালম দ্বৈতভাষার কাব্য। এই কাব্যে পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করে সাধারণ মানুষের জীবনের সুখ দুঃখ এবং সমস্যার চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। চম্পূকাব্যের কবিদের মধ্যে 'রামায়ণম চম্পুর' রচয়িতা পুনম্ নাম্বুদিরীর নাম সবিশেষ বিখ্যাত। তাঁর রচিত রামায়ণম্ চম্পুই মণিপ্রবাল শৈলীর শ্রেষ্ঠ চম্পূকাব্য বলে পণ্ডিতরা মনে করেন। বিখ্যাত চম্পূকাব্যগুলির মধ্যে রাবণবিজয়ম, কামদহনম্ উমা তপস্যা, রাজরত্নাবলী প্রভৃতি গ্রন্থগুলির নাম উল্লেখযোগ্য।

চম্পূকাব্যের লোকপ্রিয়তাকে ছাপিয়ে গিয়েছিল প্রায় একই সময়ে রচিত কৃষ্ণগাথাগুলি। চম্পূকাব্যে সংস্কৃত শব্দ এমন কী সংস্কৃত ভাষায় কাব্যের বিশেষ বিশেষ অংশ রচিত হওয়ার ফলে তা আপামর জনসাধারণের রসাস্বাদে অনেকখানি বাধা সৃষ্টি করত। কিন্তু চরুশ্শেরী নাম্বুদিরী রচিত কৃষ্ণগাথার জনপ্রিয়তা শীঘ্রই চম্পূকাব্যের জনপ্রিয়তাকে ছাপিয়ে যায়। কৃষ্ণগাথা ছাড়াও ভারতগাথা, ভাগবত-

পাট্টু, সেতুবন্ধনম পাট্টু প্রভৃতি গ্রন্থও সে যুগের যুগান্তকারী সাহিত্য সৃষ্টি। সম্প্রতি ১৯৬৫ সালে কেরল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডাঃ পি. কে. নারায়ণ পিল্লাই মহাশয় কবি আয়য়প্পিলে অচ্চনের 'রামকথা-পাট্টু' নামক গ্রন্থের আবিস্কৃতি ঘোষণা করেছেন। বইখানি এই বর্গের রচনাগুলির মধ্যে বিশেষ বিখ্যাত এবং দীর্ঘদিন যাবত ছিল অনাবিস্কৃত। বইখানি মালয়ালম ভাষার সপ্তকাণ্ড রামায়ণ। স্তুতি, বালকাণ্ড, অযোধ্যাকাণ্ড, অরণ্যকাণ্ড, কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, সুন্দরকাণ্ড এবং যুদ্ধকাণ্ড—এই সাতটি ভাগে বিভক্ত পুস্তকখানি এককালে বাংলায় কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং হিন্দীভাষী অঞ্চলে তুলসীদাসের রামচরিতমানসের মত কেরলের ঘরে ঘরে যথেষ্ট শ্রদ্ধার সঙ্গে পঠিত হত!

প্রাচীন পুঁথির দেশ কেরল। এখানেই ভাসের রচনাবলীর সন্ধান মিলেছিল। তন্ত্রশাস্ত্রের অজস্র পুস্তক এখনো কেরলের যত্রতত্র জীর্ণ পাণ্ডুলিপির আকারে ছড়িয়ে রয়েছে। এগুলিকে এখনই যদি রক্ষা করা না যায় তবে ঐতিহাসিক বহু মূল্যবান তত্ব এবং তথ্য যাবে হারিয়ে। অবহেলায় এরূপ বহুকৃতীই নষ্ট হয়ে গেছে চিরতরে!

বাংলায় যেমন কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রত্যেকটি বাঙ্গালী ধর্মপ্রাণ হিন্দু পরিবারের আধ্যত্ম জীবনের সাথী কেরলে রয়েছে তেমন 'এযুত্তচ্ছন-রামায়ণম্'! কেরলের ঘরে ঘরে শ্রদ্ধাভক্তির সঙ্গে এই পুস্তক আজও পঠিত হয়। আধ্যাত্ম রামায়ণম্ এর লেখক ছিলেন মহাকবি তুঞ্চত্তু রামানুজন এযুত্তচ্ছন। তুঞ্চত্তু রামানুজম এযুত্তচ্ছন বা সংক্ষেপে তুঞ্চন প্রচুর পুস্তক লিখেছিলেন তার মধ্যে ভারতম্, দেবীমাহাত্ম্য, শ্রীমদ্ভাগবতম, হরিনামকীর্তনম্, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণম্ প্রভৃতি গ্রন্থ খুবই প্রসিদ্ধ। তিনিই মালয়ালম ভাষার বর্তমান বর্ণমালা, এবং ভাষার বর্তমান প্রয়োগরীতির প্রবর্তক। তিনি ছিলেন স্বভাবভক্ত এবং পণ্ডিত। তাঁর দৃষ্টিতে বৈষ্ণব, শাক্ত এবং শৈব সব মতের দেবতারাই একাকার। তাঁর রচনায় তিনি সব দেব-দেবীরই স্তব গেয়েছেন।

তুঞ্চন প্রবর্তিত কাব্যরচনাশৈলী আজও বহু কেরল কবির সাহিত্য পরিক্রমার রাজপথ। কিলিপ্লাট্টু শৈলীতে যে বিভিন্ন প্রয়োগরীতি তার প্রবর্তকও তুঞ্চন।

তুঞ্চন উচ্চ কুলোদ্ভব ছিলেন না। সংস্কৃত ভাষা এবং সাহিত্যে ছিল তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। শংকরাচার্যের দার্শনিক মতের নিরসতা এবং দুর্বোধ্যতাকে যাঁরা ভক্তিরসে প্লাবিত করে সাধারণ মানুষের পর্ণকুঠির পর্য্যন্ত পৌঁছে দেন তুঞ্চনের নাম তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল। অনেকেই বলেন মালয়ালম ভাষায় অতবড় প্রতিভা আজ পর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করেন নি। যদিও তাঁর রচিত 'আধ্যাত্ম রামায়ণম্' 'ভারতম্' এবং শ্রীমদ্ভাগবতম মূল সংস্কৃত থেকে অনুবাদ তবুও তাঁর প্রতিভার স্পর্শে হয়ে উঠেছিল মৌলিক রচনার রসমাধুর্য এবং অন্যান্য গুণের আকর। তুঞ্চনের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'ভারতম'। মহাভারতের সম্পূর্ণ রূপ এই গ্রন্থে বিধৃত। অনুবাদের জড়তা নেই, তার বদলে এই সব অনুবাদকর্মে রয়েছে অদ্ভুত এবং জীবন্ত ভাষা প্রবাহ, ভাষার প্রাণচাঞ্চল্য। সাধারণের ভাষা মহাশক্তিমান সাহিত্যিকের হাতে প্রবীণতার গাম্ভীর্য এবং আভিজাত্যের সবগুণ-সহ সাহিত্যের মাধ্যমরূপ উপস্থাপিত।

মালায়ালম ভাষার তৎকালীন একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন চেরুশ্‌শরী নাম্বুদিরী। 'কৃষ্ণগাথা' নামক বিখ্যাত কাব্য গ্রন্থের রচয়িতা তিনি। তিনি 'ভাষারামায়ণমচম্পু' নামক কাব্য গ্রন্থেরও রচয়িতা। এই দুই গ্রন্থে মালয়ালম ভাষার শুদ্ধরূপ ব্যবহৃত। পুনম্ নাম্বুদিরীর 'জ্ঞানপ্পানা' নামক ক্ষীণ কলেবর গ্রন্থখানিও সাহিত্য ক্ষেত্রে উন্নত মানের পরিচায়ক। এসব ছাড়াও সঙ্গীত শাস্ত্রের বহুগ্রন্থ লিখিত হয়েছিল মালয়ালম ভাষায়। এই সব সঙ্গীত শাস্ত্রবিদদের অনেকেরই নাম জানা যায় না। সঙ্গীত শাস্ত্র বিষয়ক বহু অজ্ঞাতনামা লেখকের পুঁথি ত্রিবান্দ্রমের 'ওরিয়্যানট্যাল ম্যানুস্ক্রপ্টস্ লাইব্রেরী'তে সুরক্ষিত রয়েছে রচয়িতাদের পাণ্ডিত্য এবং জ্ঞানের সাক্ষ্য হয়ে।

বাংলা ভাষার দুর্ভাগ্য যে এককালে মনে করা হত বাংলা ভাষায় উচ্চাঙ্গ সংগীত রচনা সম্ভব নয়। বাংলার মত মালয়ালম ভাষারও দুর্ভাগ্য যে এককালে সঙ্গীত শাস্ত্রের পণ্ডিতরা মনে করতেন দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত 'কর্ণাটক সঙ্গীত' মালয়ালম ভাষায় রচনা করা যায় না, গানের সূক্ষ্ম শিল্পকর্ম ফুটিয়ে তোলার পক্ষে মালায়ালম ভাষার মধ্যেই রয়েছে প্রকৃতিগত বিরূপতা ফলে কর্ণাটক সঙ্গীতে সংস্কৃত তেলেগু এবং তামিল ভাষার গান দেখা গেলেও মালয়ালম ভাষায় সেকালের উচ্চাঙ্গ কর্ণাটক সঙ্গীত অবহেলা বা উপযুক্ত অনুশীলন অভাবে দৃশ্যমান ছিল না।

কিছুদিন আগে পর্যন্তও কার্ণাটক সংগীতে ত্যগরাজ, দীক্ষিতর শ্যামা শাস্ত্রী প্রভৃতির তেলেগু এবং সংস্কৃত রচনা, গোপালকৃষ্ণ ভারতী প্রভৃতির তামিল রাচনা এবং পুরন্দরদাসের কানাড়ী রচনারই ছিল একাধিপত্য। হয়ত এদিক ওদিক দু-একটা মলয়ালম গীতির দেখা কালেভদ্রে মিলে যেত। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে সাহিত্য এবং কলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে কেরল উঠেছিল উন্নতির শিখরে সেখানে সঙ্গীতের মত একটি চারুকলা উপেক্ষিত ছিল। মূল কর্ণাটক সঙ্গীতের গোমুখী ধারা থেকে এবং স্থানীয় জনজীবনের সুখ দুঃখ, মিলন বিরহ, আশা নিরাশা, ভক্তিপূজা প্রভৃতির উৎসমুখ থেকে অজস্র ধারার প্রসবণ বহে চলেছিল কেরলে। উচ্চাঙ্গ কর্ণাটক সঙ্গীত চর্চার দিকে আশপাশের অঞ্চলের মতই এগিয়ে গিয়েছিল কেরল। তামিল অন্ধ্র কন্নড় প্রভৃতি অঞ্চলের সঙ্গীত ধারা ক্ষীণ হয়ে যেতে পারে নি ঘরোয়ানা পদ্ধতির দ্বারা। সীমাবদ্ধ শিক্ষাদান এবং বিশেষ একজনকে আজীবন সাধনার উপলব্ধি ও অর্জনের উত্তরাধিকার করে যাবার নিয়ম সঙ্গীতরসপিপাসুদের মধ্যে দুর্লভকে লাভ করার আকর্ষণ এবং লব্ধবিদ্যাকে সযত্নে আগলে রেখে একসময় কোন একজন উত্তরাধিকারীর হাতে পৌঁছে দিয়ে যাবার মধ্যেই ঐসব অঞ্চলের সঙ্গীত আপন ধারাকে অক্ষুন্ন রাখতে পেরেছিল।

এই ঘরোয়ানা ব্যবস্থা কেরলে না থাকার ফলে ক্রমে ক্রমে তা প্রায় লুপ্ত হয়ে যেতে বসেছিল। সুখের কথা বর্তমানে আবার প্রাচীন সম্পদ পুনরুদ্ধার করার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ শিল্পী এবং কলাকারদের প্রচেষ্টায় সেই সব বিস্মৃত সঙ্গীতের সুর আবার বেজে উঠেছে। প্রমাণিত হয়েছে যে মালয়ালম ভাষায় কর্ণাটক সঙ্গীতের বাণী রচনা শুধু সম্ভবই নয় এককালে তা ছিল উন্নতির মধ্যাহ্ন গগনে।

বাংলার কবি জয়দেব দ্বাদশ শতাব্দীতে রচনা করেন তাঁর অমর কাব্য গীতগোবিন্দম্। বৈষ্ণব ধর্মের জন্মভূমি কেরল পর্যন্ত পৌঁছে যায় কোমলকান্ত পদাবলীর সুর। বেজে ওঠে কৃষ্ণভক্ত কেরলের নূপুর। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের বিভিন্ন ভাষায় গীতগোবিন্দের অনুকরণে কাব্য রচিত হয়। কেরল ও বাদ যায় না। গীতগোবিন্দের অনুকরণে বেশ কয়েকখানি কাব্য লিখিত হয় কেরলে। কিন্তু মালয়ালম ভাষাভাষী ভক্তজনের কাছে গীতগোবিন্দকে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নেন রামপুরত্তু ওয়ারিয়ার নামে জনৈক স্বনাম ধন্য কবি। তিনি গীতগোবিন্দের অনুকরণ নয়—সরাসরি মূল ছন্দে গীতগোবিন্দ অনুবাদ করেন।

কেরলের গীত গীতিনাট্য নৃত্যনাট্য সম্ভার প্রাচীন কেরলকে করেছে মহিমান্বিত। ভারতে চারিটি ক্লাসিক নৃত্যের ধারা বইছে—কথাকলি, ভারতনাট্যম্, কথক এবং মণিপুরী। কথাকলি কেরলের দান। কথাকলি নৃত্যনাট্যের উপযোগী যে অজস্র সাহিত্য সম্ভার রচিত হয়েছে তার দিকে সাশ্চর্যে তাকিয়ে থাকতে হয়। এমন কথাকলি নাটকও আছে যার অভিনয় করতে লাগে কমপক্ষেও আট রাত। কথাকলি কাব্য গ্রন্থগুলির মধ্যে বকবধম্, সুভদ্রা হরণম্, নলচরিতম প্রভৃতি অজস্র প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রয়েছে। মালয়ালম ভাষায় কথাকলি নাটকের সংখ্যা দেড়-শোরও বেশী। কথাকলি নাট্যের স্থানে স্থানে সংস্কৃতশ্লোক এবং গান পাওয়া যায়। গানগুলির কোনটা সংস্কৃত আবার কোনটা মালয়ালম।

প্রাচীন কেরলের প্রচলিত নৃত্য এবং নাট্যের অপূর্ব সংমিশ্রন কথাকলি। কথাকলি নাটকের পিতা বলা হয় কোট্টরকরার জনৈক রাজাকে। এরপর বহুকবি কথাকলি সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করেছেন। এই সব কবিদের মধ্যে তিরুবিতাংকুরের ধর্মরাজা, কেট্টয়ত্তু কেরল বর্মা রাজা, অশ্বিনী তিরুনাল মহারাজ, ইরয়িম্মন তাম্পি, উন্নারী ওয়ারিয়র প্রমুখ সবিশেষ বিখ্যাত।

কথাকলির মতই তুল্ললও কেরলের একধরণের গীতিনাট্য। প্রবর্তক কুঞ্চন নাম্বিয়ার নামক জনৈক শক্তিশালী সাহিত্যিক। তুল্ললের জন্ম যেমনই আকস্মিক তেমনই বিচিত্র। আর এই বৈচিত্র্য এবং উন্নত ধরণের হাস্যরস এবং গল্প, সামাজিক দুর্নীতি অনাচার প্রভৃতির গঠনমূলক সমালোচনাই তুল্ললের জনপ্রিয়তার কারণ হলেও মুখ্য কারণ নয়। মুখ্য কারণ তার কলাগত এবং সাহিত্যগত ঔৎকর্ষ।

তুল্ললের উৎপত্তি সম্পর্কে যে কাহিনী প্রচলিত রয়েছে সেটাই বলে দেবে স্রষ্টার রসবোধ কত তীক্ষ্ণ ছিল।

'চাক্যয়ারকুত্তু' হচ্ছে কেরলের আরেক ধরণের কথকতা। গল্প বলার বিচিত্র পদ্ধতিটা অনেকটা বাংলা দেশের রামায়ণ গানের মত। চাক্যয়ারই এই কুত্তু গানের একমাত্র অভিনেতা। চাক্যয়ারই করে যায় পাট্টুকলের মত বিদূষকের অভিনয়ও। নৃত্যকলায় অভিনয়ের মিশ্রণে চাক্যয়ারদের দান অপরিসীম। বলা চলে ভারতীয় নৃত্যকলায় অভিনয় নৃত্যের কোনও অঙ্গহানী করা দূরে থাক বরঞ্চ আরো উজ্জ্বল করে তুলেছে চাক্যয়ারদেরই সাধনার বলে। এই চাক্যয়াররাই কথাকলি নৃত্যের সুবর্ণমালিকায় গেঁথে দেয় অভিনয়ের মুক্তা। তাদের অপরূপ অভিনয় ক্ষমতা যখন দর্শকদের মধ্যে বিশেষ কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রতিনিধিকে সমালোচনা করে, তার অন্ধকার দিকগুলোর দিকে অঙ্গুলি সংকেত করে তখন তা এতই মার্জিত এবং রুচিপূর্ণ এবং সাথে সাথে হাস্যরসাত্মক হয় যে দর্শকমণ্ডলী পরিতৃপ্ত হয়। যার বা যাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলা হল তারাও বঞ্চিত হয় না এই আনন্দরস আস্বাদন থেকে।

এমনই এক কুত্তু গানের আসর। চাক্যয়ার গেয়ে চলেছে। সঙ্গে কুঞ্চন নাম্বিয়ার মৃদঙ্গ সঙ্গত করছেন। কুঞ্চনের বয়স তখন কুড়ির কোঠায়। রাত গভীর। আগে কত রাতের জাগরণ জনিত ক্লান্তি সারাদেহে কে জানে! চোখ বুজে আসে ঘুমে। হঠাৎ মৃদঙ্গ বেজে ওঠে বেতালা। সঙ্গে সঙ্গে চাক্যয়ারের শানিত ব্যঙ্গ বিদ্রূপ এবং তিরষ্কারের অস্ত্ররাজি বর্ষিত হয় বেচারা নাম্বিয়ারের উপর। সঙ্গে সঙ্গে নাম্বিয়ারের ভবিষ্যত জীবনের দ্বার যায় খুলে, খুলে যায় ভারতীয় নৃত্যগীতি কলার আরেক নতুন দিগন্ত।

আসরে লজ্জা পেয়ে প্রতিভাধর কুঞ্চন নাম্বিয়ার সারারাত জেগে "কল্যাণ সৌগন্ধিকা" নামে তুল্লল পাট্টুর প্রথম গ্রন্থ লিখে ফেললেন। একজন মৃদঙ্গ বাদকের সহায়তায় সারাদিন তালিম দিলেন এই নতুন পাট্টুতে। মন্দিরের সন্ধ্যারতির পর বেজে উঠল 'চাক্যয়ার কুত্তুর' আসরে অন্য কোনও নাম্বিয়ারের মৃদঙ্গ। গায়ক সেই একই চাক্যয়ার, যিনি আগের রাতে তালভঙ্গের অপরাধে কুঞ্চনকে ছোড় কথা বলেন নি।

মন্দিরের মধ্যে গান সুরু হয়েছে। লোক গিজ গিজ করছে আসরে। এদিকে মন্দিরের বাইয়ের ছাদ ঢাকা চত্বরে (আনাকোত্তিল) কুঞ্চন সুরু করলেন তাঁর সত্তরচিত 'কল্যাণ সৌগন্ধিকার' অনুষ্ঠান। সুরু হল গীতিনাট্যের নতুন যুগ। এই যুগসৃষ্টিকারী অনুষ্ঠানে আশপাশেরই দু-চারজন এসেছিল প্রথমে। কিন্তু অনুষ্ঠানের মনোহারিত্বের সংবাদ ছড়িয়ে পড়তে দেরী হল না। চাক্যয়ারের আসর ভেঙ্গে পড়ল কুঞ্চনের আসরে। মন্দিরের উৎসব দেখতে এসে যারা এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল তারাও এসে জুটল। দর্শকদের আনন্দ এবং পরিতৃপ্তির দ্বারা সুরু হল তুল্ললের দিগ্বীজয়ী যাত্রা। যুগে যুগে মালয়ালী জনসাধারণ ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে উপভোগ করে আসছে এই নতুন কৃতির ঐশ্বর্য। চাক্যয়ারের অস্ত্রের দ্বারাই তুল্ললের যবনিকা টানা হয়। সাধারণ মানুষের বোধগম্য মালয়ালম ভাষার বিদ্রূপ এবং উপহাসের রস ঢেলে দেওয়া হয় উপযুক্ত

আনন্দদায়ক সমাপ্তিতে! এ যেন চাক্যয়ারের সংস্কৃত বহুল বাচনকেই বিদ্রূপ! এবং তা বিশুদ্ধ মালয়ালম ভাষায়।

কুঞ্চন মালয়ালম সাহিত্যের সর্বকালের হাস্যরসের সাহিত্যিকদের সম্রাট। তিনি তুল্লল গানের জন্য বহু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কাহিনী পৌরাণিক। তুল্লল সাহিত্যে অনেক নামকরা সাহিত্য দৃষ্ট হয়। কুঞ্চনের নামকরা কাব্যগুলির মধ্যে চব্বিশটি কাহিনীকাব্যের সংগ্রহ গ্রন্থ 'ইরূপাত্তিনালু বৃত্তম্' (ইরূপাত্তি = বিশ, নালু = চার), চৌদ্দটি কাব্যের সংগ্রহ "পাত্তিনালুবৃত্তম্" (পাত্তি = দশ), শীলাবতী, বিষ্ণুপুরাণ, শিবগীতা, ভাগবতম প্রভৃতি বিখ্যাত তুল্ললগ্রন্থ।

তুল্লল গানের বৈশিষ্ঠই হলো গায়ক হাসিঠাট্টার মধ্য দিয়ে অপরের দোষগুলি সকলকে দেখিয়ে দেয়। উপস্থাপনার কৌশল এবং ভাষার প্রসাদগুণে যাকে নিন্দা করা হয় সে পর্যন্ত ক্রুদ্ধ বিরক্ত বা অপমানিত হওয়ার সুযোগ পায় না, সে নিজেই উপভোগ করে এই ধরণের হাসিঠাট্টা।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কুঞ্চন এবং তার শিষ্যেরা তুল্ললের মধ্যে যে প্রাণ সঞ্চার করে গেছেন তার রসাস্বাদন করছে আজকের মানুষও। কেরলের বহু মন্দিরে এখনও তুল্লল গান বিশেষ বিশেষ উৎসব উপলক্ষে গীত হয়। পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত তুল্ললে (নাচা) মানুষের মনে ধর্মভাব জাগানোই মূল উদ্দেশ্য হলেও কুঞ্চন আপন অতুলনীয় হাস্যরসের ভিয়ানের জ্বালানীরূপে ব্যবহার করেছিলেন সমাজের প্রায় সর্বস্তরের মানুষকে। তিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, পুরুষ নারী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, সৈন্য ভৃত্য সকলেরই চরিত্রের মন্দ এবং নিন্দনীয় দিকটা তাঁর সাহিত্যে এবং অভিনয়ে সমাজের চোখের ওপর, সাধারণের বিচারবুদ্ধির সম্মুখে তুলে ধরেছিলেন। যদিও তুল্লল নাট্যরীতি কুটিয়াট্টম, কুত্তু, কথাকলি প্রভৃতি নাট্যরীতির অনুকৃত রূপ তবু নিঃসন্দেহে মৌলিকতার সবগুণই রয়েছে তার মধ্যে। পরিমাণ মত হাইড্রোজেনের সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণ অক্সিজেন মিশে জল সৃষ্টি করে। জল

হাইড্রোজেনও নয় অক্সিজেনও নয়। তুল্লল বহু ফুলে গাঁথা হলেও আর ফুল থাকে নি হয়ে গেছে একখানি মালিকা। এই জয়মাল্য সে দুলিয়েছে সাহিত্য সরস্বতীর কণ্ঠে।

অভিনয়দর্পন বলছে:

যতো হস্তস্ততো দৃষ্টিঃ
যতো দৃষ্টিস্ততো মনঃ।
যতো মনস্ততো ভাবঃ
যতো ভাবস্ততো রসঃ॥

হাতের কাছে দৃষ্টি, দৃষ্টির কাছে মন মনের কাছে ভাব আর ভাবের কাছে রস—অর্থাৎ অর্জুনের লক্ষ্যভেদের একাগ্রতা এবং একলব্যের সাধনা মিলে অভিনয় সার্থক রসসৃষ্টি করতে সমর্থ হয়।

কথাকল্লির মত অন্য কোন নৃত্যনাট্যে বোধ হয় কথাটা এত বেশী প্রাযোজ্য নয়। কথাকল্লি আজ সারা ভারতের কলা-ভাণ্ডারের কোহিনূর। কথাকল্লি বিশ্ব পরিক্রমা করেছে। সে গেছে রাশিয়ায়, সে গেছে আমেরিকায়, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। পৃথিবীর কলাপ্রেমিক মানুষ মাত্রই কথাকল্লি সম্পর্কে কিছু না কিছু জানেন। কথাকল্লি জয় করেছে বিশ্বের কলারসিকদের মন।

কথাকল্লিকে নৃত্যনাট্য বললেও যেন কিছু বাকী থেকে যায়। কথাকল্লি নৃত্যনাট্যের চরম বিকাশের সঙ্গে কর্ণাটক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত কলার অপূর্ব সংমিশ্রণজাত অনবদ্য এবং চরমোন্নত কলা। বিগত চারশো বছর ধরে সাধনার ফলে কথাকল্লির আনুষঙ্গিক নাট্যসাহিত্য গড়ে উঠেছে। আর সেই সব নাটক রচনা করেছেন সিদ্ধহস্ত সাহিত্যিকরা। সাহিত্যকর্মের দিক থেকে কথাকল্লি সাহিত্য মালয়ালম সাহিত্যে এক বিশেষ শাখার হক দাবীদার।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কথাকল্লির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে গেছেন।

কেরলের রবীন্দ্রনাথ কবি ভাল্লাত্তোল কথাকল্লির সঙ্গে নিজেকে সারা জীবন প্রত্যক্ষ ভাবে সংশ্লিষ্ট রেখেছিলেন। বিস্মৃতপ্রায় কথাকল্লিতে তিনি নতুন প্রাণের সঞ্চার ঘটিয়েছিলেন।

কথাকল্লি নৃত্য চারটি মৌলিক ভাগে বিভক্ত।

প্রথমতঃ—ভাবপ্রকাশ, দ্বিতীয়তঃ অঙ্গভঙ্গীর ভাষা, তৃতীয়তঃ শরীর সঞ্চালন এবং চরণ মুদ্রা, চতুর্থতঃ পোষাক এবং চরিত্রসজ্জা (make up)।

ভাবপ্রকাশ (Emotional Expression) :—কথাকল্লিতে মানবোচিত মৌলিক নবরসেরই প্রকাশ। প্রত্যেক অভিনেতা চরিত্র অনুযায়ী রসের ব্যবহার করতে চেষ্টা করেন। বলা বাহুল্য নৃত্যের নিখুঁত প্রাণবন্ত সৌষ্টবও বজায় রাখতে হয় সঙ্গে সঙ্গে।

অঙ্গভঙ্গীর ভাষা (Gesture Language) :—অঙ্গভঙ্গীরও ভাষা আছে এবং সেই ভাষাকে আয়ত্ত করা দীর্ঘ সাধনাসাপেক্ষ। হস্তমুদ্রা ২৪টি। এই ২৪ প্রকারের হস্তমুদ্রাকে অঙ্গভঙ্গীর ভাষার বর্ণমালা বলা যায়। যে কোনও উক্তি এবং যে কোনও মনোভাব সুষ্ঠুভাবে এই অঙ্গভঙ্গীর সাহায্যে যে প্রকাশ করা সম্ভব তা প্রমাণিত করেছে কথাকল্লি। হস্তমুদ্রার বিন্যাস করা সম্ভব বিভিন্ন ভাবে।

হস্তমুদ্রার অনেকগুলি গভীর সংকেতবহ। অঙ্গুলি বিন্যাস, হস্ত এবং দেহের আন্দোলনে নর্তকের দেহরেখায় যে ভাব ও সৌন্দর্য ফুটে ওঠে তাই ব্যক্ত করে অভিনয়ের অন্তর্নিহিত বক্তব্যকে। নটের পিছনে দাঁড়িয়ে গায়ক গেয়ে যায় নাটকের গীত আর সঙ্গে সঙ্গে নটের চক্ষু, হস্ত মুখ প্রভৃতি ভাবপ্রকাশকারী প্রত্যঙ্গে ফুটে ওঠে তার অভিব্যক্তি। নবরস সমন্বিত মুদ্রাবলীর দ্বারা নট শুধু পাত্র বা পাত্রীর মনোভাব ব্যক্ত করারই নয় প্রকৃতি বর্ণনারও অত্যাশ্চর্য শক্তি এবং দক্ষতা রাখে। পাহাড়ের তরঙ্গমালা, প্রবহমানা নদী, উদার

আকাশ, পুষ্পিতা বনস্থলী সব কিছুরই বর্ণনা অতি নিপুণতার সঙ্গে দেওয়া সম্ভব।

এ যেন কথা কইতে শিখবার আগের যুগের মানুষের ভাষার উন্নত এবং চরম বিকশিত রূপ। একচোখে প্রেম এবং অন্য চোখে বীর বা রৌদ্ররস একই সঙ্গে প্রকাশ করতেও সমর্থ অনেক সাধনাসিদ্ধ নট।

শরীর সঞ্চালন এবং চরণমুদ্রা (কলাসম্) :—

শরীর সঞ্চালন এবং চরণ মুদ্রা দ্বারা যা ব্যক্ত হয় তা হচ্ছে শুধু নৃত্য। এই নৃত্যে অগণ্য জটিল ভঙ্গি রয়েছে। ভারতের শুদ্ধনৃত্যের দুটি ভাগ—লাস্য এবং তাণ্ডব। লাস্যে অভিব্যক্ত হয় রসাত্মক কমনীয় নারীসুলভ অঙ্গভঙ্গী এবং তাণ্ডবে প্রচণ্ড এবং পুরুষোচিত অঙ্গভঙ্গী। কিছু কিছু নৃত্য সমালোচকের মতে কথাকলিতে তাণ্ডবেরই প্রাধান্য।

চতুর্থতঃ আসে বেশভূষা এবং অঙ্গসজ্জা। পোষাক এবং অঙ্গসজ্জা কথাকলির চরিত্র পরিচিতির মূল মাধ্যম। পোষাকের পরিকল্পনা এবং অঙ্গসজ্জায় পাওয়া যায় তার আবিষ্কারকদের গভীর চিন্তা এবং উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয়। একদিকে মনে হয় বটে যে জমকালো পোষাক, আভরণ প্রভৃতি দ্বারা নৃত্যের সহজ সুন্দর ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা বুঝি কিছুটা ব্যাহত হচ্ছে কিন্তু কথাকলির দর্শকমাত্রেই জানেন ধারণাটা কতটা ভ্রান্ত। সুদীর্ঘ সাধনাসিদ্ধ কথাকল্লি নর্তক সুকঠোর অনুশীলনের ফলে প্রচুর আভরণে অলংকৃত এবং ভারী পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়েও অতি সুন্দরভাবে আপন বক্তব্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শিল্পকর্ম দ্বারা উপস্থাপিত করেন।

মালয়ালম ভাষায় 'কল্লি'র অর্থ ক্রীড়া। কথাকল্লি তাই কথা বা কাহিনী বিধৃত ক্রীড়া বা নাট্য। কথাকল্লির অনুরূপ এক নাট্য বিধায় তামিলনাদ কন্নড় আর অন্ধ্রপ্রদেশে প্রচলিত ছিল। তাকে বলা হত যক্ষগান। মাদ্রাজে কথাকল্লির সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্যসমন্বিত 'তেরুক্কুতু' এখনো দেখা যায়। কেরলের পালঘাট অঞ্চলে কোথাও

কোথাও 'মীনাক্ষীনাটকম' এবং 'কংসনাটকম' নামে যে দুটি বিশেষ ধরণের নাট্যরীতি প্রচলিত রয়েছে তার উদ্ভবও সম্ভবতঃ কথাকল্লি থেকেই।

কথাকল্লি নাট্যের চরিত্রগুলি তিনভাগে বিভক্ত। পচ্চ, কত্তি আর তাড়ি। তিনটি তিনগুণের প্রতীক, সত্ব, রজ আর তম। পচ্চ (সবুজ) সত্বগুণের, কত্তি রজগুণের এবং তাড়ি তমগুণের প্রতীক।

মুখে সবুজ রং দিয়ে সাজান হয় পচ্চ চরিত্রকে। সবুজরংকে সত্বগুণের প্রতীক বলে মানা হয়। তাই পচ্চ চরিত্র সাত্বিক স্বভাবসম্পন্ন। পচ্চ চরিত্র নাটকের রাজা, দেবতারা এবং মহান যোদ্ধারা। ঠোঁঠের নীচে থেকে কানের নীচে পর্য্যন্ত চিবুকের দুপাশে আঁকা হয় পিটুলী গোলার সঙ্গে চুণ মিশিয়ে একটি মোটা সাদা রেখা (চুট্টি)। অক্ষিপল্লব এবং ভ্রূর উপর দিয়ে টানা হয় কাজল রেখা, ওষ্ঠ রঞ্জিত হয় রক্তবর্ণে।

পচ্চ চরিত্রই কথাকলির নায়ক চরিত্র। শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন যুধিষ্টির প্রভৃতি বিভিন্ন নাটকের বিভিন্ন পচ্চ চরিত্রের রূপসজ্জায় পার্থক্য দেখা যায় কিরিটম্ বা কেশভারমে।

পচ্চ চরিত্রের মত কত্তি চরিত্রও সবুজবর্ণে শোভিত হয়। কত্তির চুট্টি আর পচ্চর চুট্টিতে অনেক প্রভেদ। কত্তির থাকে দুকাঁটার চামচের মত দুটি ছুরীর আকারের লাল রেখা—একটা কপালে অপরটি নাকের গোড়ায়। নাকের গোড়ায় দেওয়া থাকে দুটো শোলার ছোট বল। পচ্চ আর কত্তি উভয় চরিত্রের পোষাকই একই ধরণের ঢিলেঢালা। মাথায় সুদৃশ্য জামদানী কিরিট। কত্তির চোখ হয় লাল, ভ্রূ এবং চোখের পাতায় টানা হয় কাজলরেখা। রাবণ কংস দুর্যোধন প্রভৃতি কত্তি চরিত্র। কত্তি চরিত্রের রসগত গুণ বীর বা রৌদ্র। নাটকে তারা সবাই-ই অল্পবিস্তর 'পাপিষ্টদুরাচার'। তথাকথিত হীনকুলোদ্ভূত রাজা (যথা, রাবণ) এবং অভিজাত বংশীয় ক্রূর প্রকৃতির রাজা (যথা, দুর্যোধন) দের সাজান হয় কত্তির সাজে।

তাটি রূপসজ্জা তমোগুণ প্রধান দুষ্ট পাত্রের জন্য ব্যবহৃত হয়। তাটি শব্দের অর্থ দাড়ী। এই সজ্জায় দাড়ীরই প্রাধান্য। ঘোর লাল রংএর জমকালো পোষাকের উপর লাল রংএর দাড়ী এবং মাথায় প্রকাণ্ড আকৃতির মুকুট (কুট্টিচ্চামরম) সত্যিই এক ভয়ানক দর্শন রূপ ফুটিয়ে তোলে। তাটি সজ্জাও আবার তিন প্রকারের। লাল তাটির বর্ণনা কিছুটা দেওয়া হল। বাকী থাকে করুত্ত বা কালো তাটি এবং সাদা তাটি।

তাটি চরিত্রের পোষাকের রং নির্ণীত হয় দাড়ীর রংএ। কালো তাটিতে কালো এবং সাদা তাটিতে সাদা। এছাড়া অন্যান্য আরো অনেক পার্থক্য রয়েছে।

কালো তাটি সাধারণতঃ রাক্ষস, পিশাচ, শবর প্রভৃতির সাজে ব্যবহৃত এবং হনুমান, সুগ্রীব, বিভীষণ প্রভৃতির জন্য সাদা তাটির নির্দেশ।

মিনুক্কু হচ্ছে স্ত্রীচরিত্র, মুনি ঋষি এবং অন্যান্য পার্শ্বচরিত্রের রূপসজ্জা। মুখে কোন বিশেষ রং লাগান হয় না এদের। পাদ প্রদীপের সুমুখে সুন্দরী দেখাবার জন্য মেয়েদের মুখে হালকা লাল হলদের মিশ্রিত বর্ণানুলেপনের ব্যবস্থা আছে। মেয়েদের মাথায় কিরিট থাকে না। তার বদলে জমকালো রেশমী ওড়না ব্যবহৃত হয়। মেয়েদের কর্ণাভরণ পুরুষদের চেয়ে ছোট। ভয়ংকর স্ত্রীচরিত্র যথা তাড়কা প্রভৃতির সজ্জাকে বলা হয় করী। ঘোর কাল রং মাখিয়ে তার ওপর পিটুলী গোলার সাদা সাদা বিন্দু এঁকে দিয়ে ভীষণদর্শনা এবং বিভৎসা করা হয়।

কথাকল্লির সাজপোষাক এবং রং ঢং সবকিছুই নাটকোল্লিখিত চরিত্রগুলির চারিত্রিক বৈশিষ্ঠ্যকে সুষ্টুভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্যই ব্যবহৃত হয়। কথাকল্লির মূলনীতিই হচ্ছে অভিনেতাকে হতে হবে অভিনেয় চরিত্রে অভিনয় করার সময় নিজেকে মানুষ থেকে দেবতা বা দানবে রূপান্তরিত করার যোগ্যতা সমন্বিত। এবং তার জন্য তাঁদের করতে হয় সুদীর্ঘ সাধনা।

কথাকল্লি সংগীত গায় দু-জনে। একজন মূল গায়েন অপর জন দোহার। মূল গায়েনকে মঞ্চে অভিনীত নৃত্যনাট্যের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ে হাতে হবে বিশেষজ্ঞ। তিনি নৃত্যকলা অভিনয় এবং নাট্য কলা তিনমুখী কলার সর্ব শাখায় পারঙ্গব না হলে কোনমতেই চলে না। মূল গায়েনের হাতে থাকে 'চেংগলা' নামক একধরণের পেটাঘড়ি অপরের হাতে ইলত্তালম্ (করতাল)। এছাড়াও বাজে 'চেনডা' নামক একধরণের গরুগম্ভীর আওয়াজের ঢাক আর মাদ্দলম্ নামক বড় মাপের মৃদঙ্গ। চেনডার সুউচ্চ এবং গুরুগম্ভীর ধ্বনি যেন কথাকল্লির প্রাণ। মূলতঃ রৌদ্র এবং বীররসের অভিনয় কথাকল্লি। সেখানে এই ধ্বনি এক অদ্ভুত ও অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করা ছাড়াও যে কাজটি করে তার দান নৃত্যপ্রধান কথাকল্লিতে অপরিহার্য। চেনডা কথাকল্লি নৃত্যের জটিল তাল লয় প্রভৃতি বজায় রাখার জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। তবে স্ত্রীচরিত্রের অভিনয়ের সময় 'চেনডা' বাদ্যি থেমে যায়।

কথাকল্লি নাট্যানুষ্ঠানের নিয়ম অনেকটা কৃষ্ণনাট্যমের মতই। কথাকল্লি যে কেবলমাত্র মন্দিরেই অনুষ্ঠিত হবে এমন কোনও ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। তবে কোনও নট শিক্ষা শেষে যেদিন মঞ্চে অবতীর্ণ হন বা কোনও নাটক নতুন প্রস্তুত করা হয় মঞ্চস্থ করার জন্য তখন প্রথম অনুষ্ঠান মন্দিরে হবারই নিয়ম কোথাও কোথাও চলে আসছে।

কথাকল্লি যে কোনও স্থানে হতে পারে। অনুষ্ঠানের দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে গুরুগম্ভীর শব্দে চেনডা আর মদ্দলম্ একসাথে বেজে উঠে এলাকার সবাইকে আহ্বান করে কথাকল্লি অনুষ্ঠানের আসরে হাজির হতে। বাংলার কবিগান, তরজা এবং যাত্রায়ও কতকটা এই ধরনের নিয়ম পালিত হয়।

সন্ধ্যায় নটনটিরা ঢোকে সাজঘরে। সুরু হয় সাজসজ্জা। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভেই গায়ক এবং বাদ্যকররা মঞ্চে উপস্থিত হয়ে মঙ্গলাচরণ করে।

মঙ্গলাচরণের সময় বাদ্যকররা আপনাপন বিদ্যার কলাকৌশল দেখায়। বাদ্যকর বাজনার খেলা দেখায়, গায়ক চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। একে বলা হয় কেলিকোট্টু অর্থৎ অনুষ্ঠান সুরুর বাজনা।

এরপর ঘণ্টাখানেক বিরতি; রাত নটা নাগাদ 'তোডয়ম' অর্থাৎ অনুষ্ঠান সুরু। তোডয়ম এ কয়েকজন নর্তক যবনিকার পিছনে নাচে। তোডয়ম্ চলে প্রায় ঘণ্টা খানেক ধরে। এই সময়েই মঙ্গলাচরণের গান কীর্তন প্রভৃতি গীত হয় কারণ কথাকল্লি অনুষ্ঠানের মধ্যে অবকাশ রঞ্জনের অবসর পাওয়া যায় না, বাদ্যকরদের বিশেষ কেরামতী দেখাবার সুযোগ নেই। নাটক সুরু হলে তাদের বাজাতে হয় নাটকের প্রয়োজনে এবং নির্দেশে, পরিকল্পিত সুর তালে।

তোডয়মের পর আসরের পর্দার পিছনে মঞ্চে উপস্থিত হয় একটি পচ্চ এবং একটি বা দুইটি স্ত্রী চরিত্র। তারা তাদের নৃত্যের কারুকৃতি প্রদর্শন করে বিশেষ ধরনের সুর তালের সঙ্গে। নৃত্যের আগে তারা প্রার্থনা গীত গায়। নাচতে নাচতে তারা ধীরে ধীরে পর্দা সরিয়ে দেয়। আপনাপন নৃত্যকলা প্রদর্শনের সুযোগ রয়েছে এই 'পুরপ্পাট্টু' অনুষ্টানে। তাই বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগে 'পুরপ্পাট্টু' শেষ হতে। 'পুরপ্পাট্টু'র অর্থ প্রবেশ। পুরপ্পাট্টু অনুষ্ঠান নিঃসন্দেহে মনোহর এবং মূল্যবান অনুষ্ঠান। সাধারণতঃ কলাশ বা নির্ভেজাল নৃত্যের চারটি ছন্দই সুচারুরূপে প্রদর্শিত হয় এই অনুষ্ঠানে। অনবদ্য সৌন্দর্য এবং দেহের সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ ছন্দোময় বিন্যাসে এটি কথাকল্লি নৃতকলার এক চমকপ্রদ প্রদর্শনী বিশেষ।

পুরপ্পাট্টুর পর আবার কিছু অবসর। এবং অবসর বিনোদনের ব্যবস্থা রয়েছে কথাকল্লির সুরু থেকেই হয়ত হাজার মাইলেরও দূরের বাংলার কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দমের একটি গীত দিয়ে। এই অনুষ্ঠানকে বলে 'মেলাপ্পদম্' বা 'মঞ্জুতর'।

গীতটি হচ্ছে : মঞ্জুতর কুঞ্জতল কেলিসদনে........

গীত নির্বাচনে একটু লক্ষ্য করলেই আমরা দেখতে পাব যে আসর

দয়িত মিলনে যাবার জন্য শ্রীরাধিকাকে সখীরা উদ্বুদ্ধ করছে, উৎসাহিত করছে। কলালক্ষ্মীর প্রতীক যেন শ্রীরাধা আর রসগ্রাহী দর্শকবৃন্দের রসজ্ঞানই যেন কৃষ্ণ। কম নয় কেউ-ই।

পালকী এবং পায়ে হাঁটার যুগে গিরি-নদী-বন ডিঙ্গিয়ে শত শত মাইল পাড়ি দিয়ে সুদূর দাক্ষিণাত্যের সঙ্গে বাংলার সংস্কৃতির আদান প্রদান নিঃসন্দেহে প্রমাণিত করে যে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কোন বাধাই বাধা নয়। আদানপ্রদানের মাধ্যমেই শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি হয় উন্নত। এখানে বলে রাখা ভাল যে বাংলার বহু আধুনিক কথাসাহিত্যও মালয়ালম ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় আধুনিক মালয়ালম সাহিত্যের ভোজসভার সহৃদয় নিমন্ত্রণকেও আমরা অন্যমনস্ক চোখে দেখছি। এ পর্যন্ত মালয়ালম সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কিছুই বাংলায় অনুদিত হয় নি। এক্ষেত্রে ধন্যবাদ দিয়ে রাখি প্রখ্যাত বাংলা সাহিত্যিক বোম্মনা বিশ্বনাথনকে। তিনি দ্রাবিড় গোষ্ঠীর চারঠি ভাষারই বেশ কিছু মণিমুক্তা আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন তাঁর বলিষ্ঠ অনুবাদের সাহায্যে।

যাক—ফিরে আসা যাক কথাকল্লির আসরে।

মেলাপ্পদমের পর সুরু হয় অভিনয়। নট নটিরা প্রত্যেক দৃশ্যের প্রথম প্রবেশকালে নৃত্যদ্বারা পর্দা সরিয়ে দেয় তারপর সুরু হয় অভিনয়। গায়ক গেয়ে চলে, আবৃত্তি করে চলে, দোহার দেয় দোয়ার্কি। নটনটিরা কেবল নাচের মাধ্যমেই প্রকাশ করে গায়ক দ্বারা গীত বিষয়বস্তুর ভাবরূপ। কোন কথা বলবার অধিকার নেই নটনটিদের। তবে যুদ্ধ দৃশ্যে বা বিভৎস কোন দৃশ্যে আবহাওয়াকে অনুকূল করার জন্যই সম্ভবত ভাষাহীন হুংকার প্রভৃতি করার স্বাধীনতা আছে নটেদের। প্রত্যেক দৃশ্য যেমন সুরু হয় নৃত্য দ্বারা শেষও হয় ঠিক একই ভাবে। দৃশ্য সমাপ্তি নৃত্যে দৃশ্যের মৌলিক বক্তব্যকে প্রকাশ করার নিয়ম। কখনো কখনো নৃত্যের সাথে গায়ক উপযোগী সংস্কৃত শ্লোকও আবৃত্তি করেন।

মঞ্চে একটি মাত্র নারকেল তেলের বড় প্রদীপ জ্বলে। দৃশ্য শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রদীপটির দুপাশে দুজন এসে খাড়া হয়। পরবর্তি দৃশ্য সুরু না হওয়া পর্যন্ত এই তাদের কাজ।

দৃশ্যকাব্যের অভিনয়ে মঞ্চে কোন কোন দৃশ্য দেখান যাবে না সে সম্পর্কে নাট্যশাস্ত্রের নির্দেশ রয়েছে :

"দূরাহ্বানং বধং যুদ্ধং রাজ্যদেশাদি বিপ্লবম্।
সংরোধং ভোজনং স্নানং সুরতং চানুলেপনম্।
অম্বরগ্রহণাদীনি প্রত্যক্ষ্যাণি ন নির্দিশেৎ॥"

কিন্তু কথাকলিতে যুদ্ধ বধ প্রভৃতি হামেশাই দেখান হয়ে থাকে। সারারাত দর্শকদের অভিনয় দেখাতে হলে মাঝে মাঝে উত্তেজক বীররসের প্রয়োজন আছে বই কী।

ভারতীয় নৃত্যকলার এই অমূল্য সম্পদও অবহেলায় প্রায় যেতে বসেছিল। মহাকবি ভাল্লাত্তোল নারায়ণ মেননের আজীবন প্রচেষ্টায় সেই বিনষ্টপ্রায় সম্পদ আবার উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। আজ সারাবিশ্বের কলারসিকদের কাছে কথাকল্লি যে সম্ভ্রম লাভ করেছে তা নিঃসন্দেহে তার কলাগত ঔৎকর্ষের যোগ্য। বর্তমানে কথাকল্লি সাহিত্যের নতুন নতুন অনেক নাটকও লেখা হয়েছে। কথাকল্লি এখন সুভদ্রাহরণ থেকে হিটলার বধ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। কথাকল্লিও এগুচ্ছে কেরলের জনগণের জীবনদৃশ্যের 'মনোধর্ম' নৃত্যের তালে তালে। কথাকল্লি আজ কেরলের নির্বাচনী প্রচারকার্যের জন্যও ব্যবহৃত হচ্ছে। উপযোগী নাটকও তৈরী হচ্ছে সেজন্য। কথাকল্লি আজো কেরলের জনমানসের মুকুর।

তুল্ললের উৎপত্তির কথা আগেই আলোচিত হয়েছে।

তুল্লল এমনই একটি নৃত্যনাট্যশৈলী যাতে তার উৎপত্তিকাল অর্থাৎ প্রায় আড়াইশো বছর আগে কেরলে প্রচলিত সবধরণের নৃত্য নাট্য এবং গীতির ছোঁয়াচ আছে। গঠনরীতিতে তুল্লল বাংলার

কথকতার সমগোত্রীয়। কিছু গান নাচ সহযোগে গল্পপিপাসু মানুষকে গল্প বলার এক বিশেষ কলা তুল্লল। নাচগানের যে অংশ এতে থাকে তা কোনও বাঁধাধরা সুরছন্দের ধার ধারে না। গুরুগম্ভীর আলোচনা হঠাৎ কোন হালকা হাসিতে ফেটে পড়ে। গানগুলোর বিষয়বস্তু সাধারণতঃ হালকা। তুল্ললের জনপ্রিয়তার সবচেয়ে বড় কারণ হল কাহিনী যদিও পুরাণাদি থেকে ধার করা তবু তুল্ললের গল্পের নায়ক নায়িকারা অতি সাধারণ মানুষের মতই মালয়ালম্ ভাষায় কথা বলে, তাদের মানসিক অভিব্যক্তিও আশপাশের দেখা মানুষগুলোর মত। রাজা উত্তানপদের দুই বৌ ঝগড়া করে আলাদা হবার সময় ভাঙ্গা থালা বাটি পিপেগুলো পর্যন্ত ভাগাভাগি করে। দেবদানবের যুদ্ধের সৈনিকদের সঙ্গে তদানীন্তন ত্রিবাংকুরের নায়ার সৈন্যদের প্রাকযুদ্ধের আচরণে কোন পার্থক্য নেই। দেবসৈন্যরা যুদ্ধের ঠিক আগে শরীরে জুত করে নেবার জন্যে তামাক খেতে চায়। এবং—

> "বটুয়ায় খুঁজে দোক্তা নেই কো দেখে
> করে না কো গোলমাল
> সুদখোরের বাড়ী সোজা চলে যায়
> বাঁধা দেয় তরোয়াল।"

এই হচ্ছে মহাকবি কুঞ্চনের দেবসৈন্য!

সত্যি কথা বলতে কী তুল্লল-হাস্যরসের মহাশক্তিধর কবি পৌরাণিক নাম এবং কাহিনীর কাঠামোর মধ্যে তৎকালীন সমাজের ধনী, দরিদ্র, ইতর, ভদ্র, সৈন্য ব্যবসাদার নাম্বুদিরী বৈষ্ণব সকলকেই তাদের দোষগুলির জন্য একহাত করে নিয়েছেন। তাঁর বিদ্রূপে জ্বালা না থাকায় ব্যক্তি বা সমষ্টি যার সমালোচনাই করা হোক না কেন কেউই সেটায় আহতবোধ না করেও আনন্দের খোরাক পেত। কুঞ্চনের হাত থেকে রাজা থেকে সমাজের একদম নীচের মানুষটি, নাম্বুদিরী থেকে চণ্ডাল পর্যন্ত—নিস্তার পায় নি কেউ।

বিদর্ভে উড়ে চলেছে হংসদূত—দময়ন্তীর কাছে নিয়ে যাচ্ছে নলের প্রেমবার্তা। যেতে যেতে সে চোখ রেখেছে চারিদিকে। এক জায়গায় দেখছে—

"কাজ শেষ করে ক্ষুধায় কাতর নায়ার ফিরেছে ঘরে
রেগেই আগুন দেখল যখন রান্না হয় নি ভাত
ছুড়ে ফেলে দিল খোন্তা কোদাল এক ছুটে ঘরে ঢুকে
লাঠি দিয়ে করে বৌটাকে তার মন মত মেরামত।
টেনে ফেলে দিল রান্নার হাঁড়ি, তছনছ পাকশালা,
ছেলেপুলেগুলো ধরে আর পেটে—করল হাঁড়ির হাল।
এত সব বীর বিক্রমই সার কমে না গায়ের জ্বালা
ছুটে ছুটে করে বাড়ী প্রদক্ষিণ কমাতে গায়ের ঝাল॥"

দেখে তো হংসবর মহাখুশী। দর্শকদের মধ্যে যে সব বদমেজাজী নায়ার ছিল তারাও কী হংসদূতের মত খুশী হতে পেরেছিল? পেরেছিল নিশ্চয়ই! এবং এখানেই কুঞ্চনের প্রতিভার স্পর্শ।

ভারতের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন যুগে গল্প পাগল মানুষের সংখ্যা কম নয়। রূপকথা থেকে সুরু করে কত ধরনের গল্প বলার রীতি যে সারাভারতে প্রচলিত ছিল তা আজ নির্ণয় করা অসাধ্য। তবু তুল্লল সেই সব পদ্ধতির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য স্থানের অধিকারী।

তুল্লল শব্দের অর্থ নৃত্য করা। কিন্তু তুল্ললের নৃত্য স্বাভাবিক কারণেই কথাকলির মত উন্নত এবং অভিজাত শ্রেণীর নয়। আগেই বলেছি আমাদের দেশের কথকঠাকুরের রামায়ণ গানের মতই অনেকটা এই তুল্লল। নাচের প্রথম ভাগ জানা থাকলেই চলে তুল্ললে। অঙ্গভঙ্গির মধ্যেও কোন জটিলতার ঝামেলা নেই। সবই সাদামাটা। কুঞ্চন যেদিন তাঁর তুল্ললের প্রথম অনুষ্ঠান করেছিলেন সেদিন সহজ সরল নতুন শৈলী এবং সহজবোধ্য মূকাভিনয়ের ভাষা, সবচেয়ে বড় কথা ছন্দের শিকল ছেঁড়া

সুরই চাক্যয়ারের আসর দিছল ভেঙ্গে। এবং এই প্রথম রজনীর অনুষ্ঠানের আশাতীত সাফল্য, সন্ত আবিষ্কৃত কলা নিয়ে প্রতিভাধর আবিষ্কর্তার নিয়ত গবেষণা তুল্ললকে সহজবোধ্য এবং দর্শকদের অনাবিল আনন্দের খোরাক জোগাবার উপকরণে সমৃদ্ধ হয়েছিল।

তুল্ললের মূল গায়েনের গাওয়া একটি কলি বা একটি শ্লোক করতালবাদক দুজন দোহার দোয়ার্কি দেয় দ্রুততর লয়ে। সঙ্গে বাজে মৃদঙ্গ। দোহার যখন দোয়ার্কি দেয় মূল গায়েন তখন গীত অংশটি নাচ এবং সহজ অঙ্গভঙ্গি সহযোগে প্রকাশ করতে থাকে। এইভাবে এগিয়ে চলে গল্প। অঙ্গভঙ্গির ভাষায় ভাব অভিব্যক্ত করার পদ্ধতি নিঃসন্দেহে কথাকল্লি থেকেই ধার করা কিন্তু কথাকল্লির দীর্ঘ অনুশীলিত পরোৎকর্ষতা নেই তুল্ললে। শুধু তাই নয় তুল্ললের গান বা শ্লোকগুলি সংস্কৃতের মত বিশেষ বিশেষ ছন্দে লিখিত নয়। একই গানে বিভিন্ন ছন্দের ব্যবহার গান এবং নাচের মধ্যে আনে বৈচিত্র।

তুল্ললের অপর এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গায়ক দর্শকদের অনুষ্ঠান চলাকালীন ক্লান্তি অপনোদনেরও চমৎকার ব্যবস্থা রাখেন। দর্শকদের মধ্য থেকেই হয়ত বেছে নিলেন একজনকে হনুমানের রূপের নিকটতম সাদৃশ্য হিসাবে। একজনকে বিদ্রূপের পাত্র হতে দেখলে মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই হাসির খোরাক পায়। জনমনস্তত্ত্বের এই খবরটি জানা থাকায় কুঞ্চন পেরেছিলেন দর্শকদের মন জয় করতে। অবশ্য দর্শকরা সবাই-ই জানেন যে হয়ত এর পরের পালা তাঁর। মিষ্টি আঘাত খেতে খারাপ লাগে না।

তুল্ললকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। ওট্টন তুল্লল, শীতংকন তুল্লল আর পারয়ণ তুল্লল। এই তিন ধরনের তুল্ললে যে পার্থক্য তা শুধু গানের ছন্দ এবং লয়ে। যেমন ওট্টন তুল্লল গীত হয় দ্রুত লয়ে আর পারয়ণ বিলম্বিতে। শীতংকনের লয় মধ্যপন্থানুসারী। গায়কের মাথার

কিরিটেও কিছু কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। যেমন পারয়ণ কথকের মুকুটে একটি সাপের মূর্তির দেখা মেলে।

তুল্লল নৃত্যশৈলীর আবির্ভাব এবং বিকাশ হয়েছে গত আড়াইশো বছরের মধ্যে। এই জনপ্রিয় অনুষ্ঠানের সাহিত্য শাখার একই ছন্দে অনুবাদ করে কালোপযোগী নতুন রচনা দ্বারা ভারতীয় অন্যান্য ভাষার মানুষদের মধ্যেও একে হয়ত জনপ্রিয় ক'রা যায়। তবে এই ধরনের সারারাত বসে নাটক, নৃত্য দেখার মানুষ দ্রুতগতিতে কমে আসছে আড়াই ঘণ্টার সিনেমার যুগে। তাছাড়া মানুষের মধ্য থেকে সূক্ষ্ম রসবোধকে একদম মুছে দেওয়ার রাজসিক ব্যবস্থার ঢালাও কারবারও তো সর্বত্রই ছড়ান। প্রথম রিপুর নগ্ন আবেদন আর হালকা সুরের দুন্দুভির শব্দে বীণাপাণির হাতের বীণার তার বুঝি ছিঁড়ে যাচ্ছে একে একে। কলালক্ষ্মী প্রতীক্ষা করছেন নতুন কুঞ্চনের।

পাট্টুকল সাহিত্যধারার সবচেয়ে উন্নত শাখা তুল্লল। তবু বঞ্চি পাট্টুকলও কেরলে কম জনপ্রিয় নয়। অবশ্য তুল্লল এবং বঞ্চির মধ্যে রয়েছে মূলগত পার্থক্য। তুল্ললকে যদি বাংলার কথকতার সঙ্গে তুলনা করা হয় তবে বঞ্চি হচ্ছে ভাটিয়ালী এবং জারিগানের সমগোত্রীয়। বঞ্চি শব্দের অর্থ নৌকা। নৌকায় চলতে চলতে গাওয়া হয় এই গান। স্বাভাবিক ভাবেই এই গানে তাই রয়েছে সাহিত্যগত অন্তর্মুখীনতার গুণ। অবশ্য বঞ্চিগানে বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনীও গীত হয়।

বঞ্চি গানের প্রবর্তক রামপুরত্তু ওয়ারিয়র নামে জনৈক দরিদ্র কবি। মালয়ালম ভাষায় পরবর্তিকালে অনেক প্রসিদ্ধ কবি রামপুরত্তুর শৈলীর অনুকরণে কাব্য রচনা করেন।

পৃথিবীর সবগুলি প্রসিদ্ধ ভাষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সাহিত্যকৃতীর প্রথম এবং আদি শাখাই কাব্য। সমুদ্রজলের রূপান্তরে রক্তের সৃষ্টি। রক্তের কণায় কণায় রয়েছে

পূর্বাশ্রম সংস্কার—সাগর তরঙ্গের ছন্দোময় নৃত্য। যে নৃত্যের তাল সুসংবদ্ধ, লয় কখনো বিলম্বিত কখনো দ্রুত। এই তাল লয় মান সমন্বিত নৃত্যের ভাষায় প্রকাশিত রূপই কাব্য।

মালয়ালম সাহিত্যের কাব্যধারাও চলে আসে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যন্ত সাহিত্যের একমুখী স্রোতরূপে। তারপর সুরু হয় গদ্যরচনা। মালয়ালম ভাষার গদ্যরচনার গোড়ার কথার সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের গদ্য রচনার গোড়ার খবরের মিল বড় অদ্ভুত। বৃটিশ শাসনকালের প্রারম্ভেই এই গদ্য রচনার সূত্রপাত। খৃষ্টীয় মিশনারীদের খৃষ্ট ধর্ম প্রচারের অঙ্গরূপে সুসমাচার জাতীয় মালয়ালম রচনাই সাহিত্যে প্রথম দিককার গদ্য রচনা। মালয়ালম ভাষার প্রথম অভিধান রচনা করেন ডাঃ গুনডার্ভ নামক জনৈক জার্মান পণ্ডিত। মালয়ালম সাহিত্যের ইতিহাস তাঁকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে।

মালয়ালম গদ্য সাহিত্যের প্রথম যুগ খৃষ্টধর্মীয় প্রচারপুস্তিকা এবং পাঠ্যপুস্তক রচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। গীর্জাসংলগ্ন পাঠশালা গুলিতে দেশীয় ছেলেমেয়েদের মালয়ালম এবং ইংরাজী দুটি ভাষাই শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা সুরু হয়ে গিয়েছিল। ফলে ভাষা শিক্ষাদানের প্রয়োজনেই বহু খৃষ্টান পণ্ডিত মালয়ালম ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। সে সময় পর্যন্ত মালয়ালম ভাষায় পাঠ্যপুস্তকের বড় অভাব ছিল। বিশেষ করে গদ্যশৈলী ছিল একেবারেই অনুপস্থিত। মালয়ালম গদ্যের জন্ম হয় প্রত্যক্ষত পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনে এবং ধর্ম প্রচারের অপ্রত্যক্ষ উদ্দেশ্যে।

আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সব ছাত্রই গীর্জার পাঠশালায় ভর্তি হতে পারত এবং লেখাপড়া শিখতে পারত। মিশনারীরা খৃষ্টান ধর্মের বীজ ছাড়িয়ে দিতে চাইতেন শিশুমনেই। দেশের সাধারণ মানুষ মাতৃভাষা শিক্ষার একমাত্র বিদ্যায়তন এই গীর্জার পাঠশালার সাহায্য নিতে সুরু করলেন। ফলে হিন্দুধর্মের নেতারাও গীর্জার পাঠশালার অনুরূপ বিদ্যালয় খুলতে বাধ্য

হলেন। নাম্বুদিরী সন্তানদের শিক্ষার জন্য আলাদা স্কুল খোলা হল। নায়ার এবং ঈষওয়রদের পৃথক সংস্থা যথাক্রমে নায়ার সার্ভিস সোসাইটি এবং শ্রীনারায়ণ ধর্ম পরিপালন যোগম্ দ্বারা কেরলের বিভিন্ন স্থানে ইংরাজী স্কুল খোলা হতে লাগল। ১৮৩৪ খৃঃ অব্দে তৎকালীন ত্রিবাংকুর এবং কোচিনের রাজারা আপন রাজত্বে ইংরাজী স্কুল খুলে দেশের লোকদের ইংরাজী শিক্ষায় উৎসাহিত করলেন।

আধুনিক শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে চলতে হল দেশের মাতৃভাষা মালয়ালমকে। যদিও মালয়ালম গদ্য সাহিত্যের জন্ম 'মথিলিখিত সুসমাচার' জাতীয় অনুবাদ কর্মের মাধ্যমে তবু ভাষার স্বকীয় ঐতিহ্য এবং দীর্ঘকালের অনুশীলনের ফলে সেই ভাষা বেগবান এবং তেজস্বী হয়ে উঠতে দেরী হল না। নতুন দিগন্ত খুলে গেল ভাষার সুমুখে নতুন রূপে নবসজ্জায় বিকশিত হবার। যদিও ভাষা শিক্ষার এবং শিক্ষা দেবার তাগিদেই মালয়ালম গদ্য সাহিত্যের উদ্ভব তবু সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও হল তার পদসঞ্চার।

মালয়ালম গদ্য সাহিত্য রচনার সুরু বিদেশী প্রভাবযুক্ত ধর্ম-প্রচার পুস্তিকা রচনাদ্বারা হলেও শীঘ্রই মালয়ালম সাহিত্যিকরা এগিয়ে এলেন সাহিত্যকে দেশ এবং সমাজের মুকুর রূপে গড়ে নিতে। ডাঃ গুনডর্ড মালয়ালম সাহিত্যের ব্যাকরণ লেখেন, লেখেন উন্নত ধরণের অভিধান। তাঁর অভিধানে কেবল মাত্র শব্দার্থই নেই রয়েছে শব্দের উৎপত্তি, অর্থভেদ, ব্যঙ্গার্থ এবং উচ্চারণ পদ্ধতিও। মালয়ালম গদ্য সাহিত্যের সুরুতেই এমন একখানি সর্বাঙ্গ সুন্দর অভিধান গ্রন্থ লিখে ডাঃ গুনডার্ট মালয়ালাম ভাষার অগ্রগতির পথ দিছলেন প্রশস্ত এবং মসৃণ করে।

মালয়ালম গদ্য সাহিত্য গীর্জাঘরের ঘণ্টাধ্বনি শুনতে শুনতে জন্মালেও খুব শীঘ্রই সেই সাহিত্য নতুন জীবনের আহ্বান নিয়ে আবির্ভূত হল। মালয়ালম গদ্য এবং পদ্য উভয় ক্ষেত্রে নতুন যুগ সুরু করলেন 'কেরল বর্মা ওয়ালিয় কোয়ি তাম্পুরাণ' এবং তাঁর উপযুক্ত

ভাগনে 'রাজরাজ বর্মা কোয়ি তাম্পুরাণ'। যদিও এঁরা দুই মামা-ভাগনে প্রথমে পাঠ্যপুস্তক এবং ব্যাকরণ প্রভৃতি রচনা নিয়েই সাহিত্য ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন তবু শীঘ্রই তাঁদের দেখা গেল গদ্য সাহিত্যের জগতে। কেরল বর্মা 'আকবর' নামে একটি উপন্যাস এবং বিজ্ঞান মঞ্জরী আর মহচ্চরিত্রম নামে অপর দুখানি গ্রন্থও রচনা করলেন। তবে কেরল বর্মার লেখনী গদ্যের চেয়ে পদ্য রচনাতেই চলত বেশী। বহু মৌলিক কাব্য ছাড়াও তিনি 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম' গ্রন্থের অনুবাদ করেন।

আধুনিক বাংলা ভাষার জনক বিদ্যাসাগর আর মালয়াম ভাষার আধুনিক যুগে উত্তরণের পিতৃত্ব নিঃসন্দেহে 'কোয়ি তাম্পুরাণ' মামা-ভাগনেদ্বয়ের যুগল প্রয়াসের।

তবে আধুনিক গদ্য এবং পদ্য সাহিত্যের বিকাশ সুরু প্রকৃতপক্ষে ১৯২৪ খৃঃ অব্দে। ১৯২৪ এর আগে পর্যন্ত সাহিত্য ছিল মনোরঞ্জনের উপকরণ। ইতিমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে। রাশিয়ায় জারতন্ত্রের বুনিয়াদ ধ্বসে পড়েছে বিপ্লবের বন্যাবেগে। সারাভারতে স্বদেশী আন্দোলন জোরদার। ১৯২০ তে অসহযোগ আন্দোলন এবং খিলাফত আন্দোলনের জোয়ার বহে গেল ভারতের উপর দিয়ে। কেরলের মালাবার অঞ্চলের নিপীড়িত নির্যাতীত এবং বঞ্চিত জনগনের মনে দেখা দিল নতুন আশার আলোক। তারা বুঝল যে যে কোনও শক্তিশালী ব্যক্তি বা গোষ্ঠির নিপীড়নের হাত থেকেও বাঁচা যায়। পেয়ে গেল তারা পথের সন্ধানও। ফলে ১৯২১ খৃঃ অব্দে মোপলা বিদ্রোহ হল। এই বিদ্রোহ অর্থনৈতিক দাবীদাওয়ার লড়াই-এর উর্দ্ধে পৌঁছে গিয়েছিল। এই বিদ্রোহ অদৃষ্টপূর্ব নিষ্ঠুরতার সঙ্গে দমন করল বৃটিশ সরকার স্থানীয় জমিদারদের সহায়তায়। এবং সেই লাঞ্ছিত ভাগ্যহতদের সর্বজয়ী হবার সংগ্রাম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলে চিত্রিত করতে, দেশময় প্রচার করতে একটুও দেরী করল না স্বার্থবাদীর দল। ফলে তথাকথিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অব্যবহিত পরবর্তি থমথমে ভাবও নেমে এল সারাদেশে। কিছু দিনের জন্য হলেও সাম্রাজ্যবাদীর

ভেদবুদ্ধিরই জয় ঘোষিত হল। হিন্দু, বিশেষভাবে কেরলের সবচেয়ে প্রভাবশালী গোষ্ঠি নায়াররা, মুসলমান এবং খৃষ্টান ধর্মীদের মধ্যেকার গোঁড়া ধর্মধ্বজীরা এই সুযোগে আপনাপন প্রভাব বিস্তার করল। সাহিত্যিকরা এসব ব্যাপারে ১৯৩০ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত প্রায় কোনরকম মাথাই ঘামান নি। তাঁরা বিচরণ করছিলেন রোমান্সের দুনিয়ায়। ১৯৩০ খৃঃ অব্দের রাজনৈতিক আন্দোলন কেরল সাহিত্যের পটভূমি বদলে দিল। হিন্দু মুসলমান এবং খৃষ্টান সম্প্রদায় থেকে বেরিয়ে এলেন, তিনজন শক্তিধর সাহিত্যিক। ধর্মের নামাবলী খুলে তার গোঁড়ামীটুকু ফুটিয়ে তুলতে লাগলেন তাঁরা আপনাপন সাহিত্যকর্মে। প্রচণ্ড আঘাত হানলেন ঠুনকোমেকী ভেদাভেদের প্রাচীরে। সাহিত্য পেল নতুন জীবন। নতুন গতিবেগ। এই তিনজন যুগান্তকারী শক্তিধর সাহিত্যিকের নাম ললিতাম্বিকা, মুহম্মদ বশীর এবং পোন্ কুন্নাম ওয়র্কি।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়পাদ পর্যন্ত সাহিত্যে রাজা উজীর, পৌরাণিক দেবদেবী, ধর্মের জয়, অধর্মের পরাজয় জাতীয় রচনারই জয় জয়কার। সাহিত্যিকদের মধ্যে বেশীর ভাগই যদিও তদানীন্তন মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে এসেছিলেন তবু সাহিত্যকৃতীতে তাঁরাই অনুপস্থিত। কিন্তু ১৯২০ খৃঃ অঃ এর রাজনৈতিক আন্দোলন ১৯২১ এর মোপলা বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ল সাহিত্যেও। অভিজাতদের দুনিয়ার মোহ কাটিয়ে উঠে অভিজাত সাহিত্যে পরিণত হবার সংগ্রাম সুরু হল। এই অভিযান সুরু ১৯২৪ সালে। সাধারণ মানুষ এসে সুমুখে দাঁড়াল।

ইতিমধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যে দুটি বৈপ্লবিক চিন্তাধারা আলোড়ন তুলেছে—ফ্রয়েডীয় এবং মার্কসীয়। এই দুই চিন্তাধারারই প্রভাব পড়ল মালয়ালম সাহিত্যে। আবির্ভাব হল উপন্যাস এবং ছোট গল্পের। আবির্ভূত হল সাহিত্যে চিত্রময়তা। কবিতা পেল তার নতুন জগত। যে জগত কেবলমাত্র কল্পনার রঙীন ফানুষ, অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার নয়, যে জগত স্রষ্টার জগত, সৃষ্টির জগত আর সৃষ্টির মুখ্যনট যে মানুষ তাদের জগত।

কেরলের গল্প উপন্যাস এবং আধুনিক কবিতার বিকাশের মূলে যে কেরলের জনসাধারণ, তাদের জীবনযাপন প্রণালী, সমস্যা এবং সংগ্রাম, সমাজ-ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক অসমতা, ধর্মীয় সংকীর্ণতা প্রভৃতি শক্তি জুগিয়ে এসেছে তার পরিপ্রেক্ষিত বিচারে বলা চলে মাত্র বছর পঞ্চাশেকের মধ্যে মালয়ালম কাহিনী এবং কবিতার রাজ্যে যে সম্পদসম্ভার জমেছে নিত্য জমছে তা সত্যিই মালয়ালমকে ভারতের প্রথমশ্রেণীর ভাষাগুলির অন্যতম আসনে বসিয়েছে।

বাংলার সঙ্গে কেরলের বিচার প্রকৃতির পটভূমিতে করতে গেলে দেখতে পাওয়া যায় যে পার্থক্য বিশেষ কিছু নেই। বাংলায় আছে সমুদ্র উপকূল এবং সুন্দরবন অঞ্চলের জীবন। কেরলেরও সমুদ্র উপকূলের, সমুদ্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কের জীবন রয়েছে, বন্যজন্তুভরা পাহাড় বনানী। অধিবাসীরা বেশীর ভাগই কৃষিজীবি বা মৎসজীবি। এছাড়া জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ কৃষিশ্রমিক, রবার, কফি, চা প্রভৃতি বাগিচার শ্রমিক।

বাংলায় হিন্দু মুসলমান পাশাপাশী বাস করে। একে অপরের প্রতিবেশী এবং বাংলার সাহিত্যে এই দুই ভিন্নধর্মাবলম্বীর প্রতিবেশের প্রভাব মোটেই কম নয়। কেরলের ক্ষেত্রে অবস্থাটা আরো একটু ঘোরাল। কেরলে হিন্দু মুসলমান এবং খৃষ্টান পরস্পরের পড়শী। ফলে সাহিত্যে এই প্রতিবেশঘটিত সমস্যাও স্থান করে নিতে পেরেছে।

ভূমিহীন কৃষকদের সমস্যা, কৃষকদের আইনের মারপ্যাঁচে ভূমিহীন করার সমস্যা, অর্থনৈতিক অসাম্য এবং দ্রারিদ্র্য জনিত সমস্যা, ধনীর আরো ধনলিপ্সার দ্বারা উদ্ভুত সমস্যা—সবমিলিয়ে নিপীড়িত আত্মার গোলক ধাঁধাঁর প্যাঁচ ছাড়িয়ে বেরিয়ে আসবার, মুক্ত আকাশ থেকে শ্বাসে নেবার আকাংখা সাহিত্যকে সুবিস্তৃত পটভূমি দিয়েছে।

অসহযোগ এবং স্বদেশী আন্দোলনের সাথে সাথেই সারাভারত উদ্বেল হয়ে উঠল জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনে। এই জাতীয় সংগ্রামে ভাষা দেবার জন্য এগিয়ে এল দেশীয় মালিকানার বহু

সংবাদপত্র। কেরলের স্বদেশাভিমানী পত্রিকা ছিল কে. রামকৃষ্ণ পিল্লাইয়ের। তাঁর পত্রিকায় বার হতে লাগল নতুন নতুন গল্প—নতুন তার আঙ্গিক, নতুন তার বক্তব্য।

ধীরে ধীরে নতুন ধারার গল্পের পাঠক সৃষ্টি হল। গল্পের কাহিনী ছেড়ে পাঠক চাইল বিশ্লেষণ। কারণ জিজ্ঞাসু পাঠকদের কাছে ভাঁওতা দেওয়া বা মনগড়া কথা বলে প্রসঙ্গ চাপা দেবার অবকাশ রইল না। সাহিত্য মাটি স্পর্শ করল। সাহিত্যে হল বাস্তবতার আবির্ভাব।

ইতিমধ্যে বিভিন্ন পত্রিকায় সুরু হয়েছে গল্প সাহিত্যকে উৎসাহ দেওয়া এবং তার পৃষ্টপোষকতা করা, 'বিদ্যাবিনোদিনী,' 'ভাষাপোষিণী' এবং 'রসিক রঞ্জনী' পত্রিকাত্রয় এক্ষেত্রে নিল মুখ্য ভূমিকা। এ যুগের লেখকদের মধ্যে অম্পটি নারায়ণ পুত্তুবাল্, ওটুবিল কুঞ্জিকৃষ্ণ মেনন ছিলেন পুরোধা কাহিনীকার। তাঁদের রচনা গল্প প্রধান।

ইতিমধ্যে কেরলে ইংরাজী ভাষা এবং সাহিত্যের সঙ্গে সুপরিচিত মানুষের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। মালয়ালম সাহিত্যে ইংরাজী রচনা-শৈলীর প্রভাব পড়তে তাই দেরী হল না। মালয়ালম সাহিত্যে ইংরাজী শৈলীর গল্প রচনার পথিকৃৎ ই. বি. কৃষ্ণপিল্লাই। কে. সুকুমারণ তাঁর গল্পপ্রধান কাহিনীকে ইংরাজী ঢংএ উপস্থাপিত করেন। তাঁদের কলমে কেরলের সাধারণ মানুষ এসে ভিড় করে তাদের নানা আশা আকাংখা, ব্যর্থতা, সাফল্যের আশা এবং সংগ্রামী রূপ নিয়ে। পাঠককে ভাবাতে থাকে, কেন এমনটি হল? এই 'কেন'র উত্তরেই কেরলের আধুনিক গল্প উপন্যাস এবং কবিতার বিকাশ।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে যে শক্তিশালী লেখক মালয়ালম সাহিত্যকে রোমন্টিকতার প্রভাব মুক্ত করে বাস্তবতার মুক্ত অঙ্গনের আলো হাওয়ায় নিয়ে আসেন তাঁর নাম এ, বালকৃষ্ণ পিল্লাই। শ্রীপিল্লাই এর উল্লেখযোগ্য কোনও মৌলিক রচনা নেই। তিনি ছিলেন মুখ্যত অনুবাদক। য়ুরোপীয় সাহিত্যের রথী মহারথীদের রচনার অনুবাদের সাহায্যে তিনি নতুন লেখকদের মনোবিজ্ঞান অবলম্বী লেখার

প্রেরণা দেন। গোর্কি, শেকভ, বালজাক, টলষ্টয়, মোপাসাঁ প্রভৃতি সাহিত্যিকদের রচনার প্রভাব পড়ে মালয়ালম সাহিত্যে।

বর্তমান যুগের মৌলিক রচনাকারদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিধর সাহিত্যিক তকষি শিবশংকর পিল্লাই যিনি তকষি নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। তকষির প্রথম জীবনের রচনায় পড়েছিল ফ্রয়েডীয় প্রভাব কিন্তু খুব শীঘ্রই তিনি মার্কসীয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি এবং ভাবাদর্শের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে লিখতে সুরু করলেন। তাঁর রচনাশৈলীতে মোপাসাঁর প্রভাব সুস্পষ্ট। ধর্ম্মধ্বজীদের মুখোশ খুলে দিতে থাকেন একের পর এক। ধর্মের বুকনী দিয়ে ধর্ম এবং মনুষ্যত্বকে নরকগামী করার প্রয়াস তাঁর ভাষার চাবুকে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে। তাঁর কাহিনীতে মজুর, ধীবর প্রভৃতিরা পেয়েছে অগ্রাধিকার। তাঁর লেখনশৈলীর বেগ এবং তেজস্বীতা, বিষয়বস্তুর চমৎকারিত্ব ও স্বকীয়তা তাঁকে মালয়ালম ভাষার একটি সম্মানিত আসনে বসিয়েছে। তকষির 'চম্মীন' (চামনী বা কুচো চিংড়ি) নামক উপন্যাস আকাদামী পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত হয়েছে। বইখানা লেখা কেরলের ধীবরদের নিয়ে। চম্মীন স্মরণ করিয়ে দেয় মাণিকবাবুর পদ্মানদীর মাঝি কে।

তকষির পরই অর্থনৈতিক বৈষম্যের পশ্চাদপটে লেখা কাহিনীর লেখক কেশবদেবের নাম করতে হয়। কেশবদেবের "অয়ল্ককারূ" (প্রতিবেশী) উপন্যাস প্রাচীন পারিবারিক ব্যবস্থার জরাজীর্ণ প্রাসাদে দাঁড়িয়ে পুরানো ধ্যানধারণা অনুযায়ী পুরানো দিনকে আঁকড়ে ধরার পাশাপাশী নতুন দিনের নতুন শিক্ষার আলোকে নতুন জীবনের আনন্দ উপভোগ করার সুন্দর চিত্র ফুটে উঠেছে। বইখানি সাহিত্য আকাদামী পুরস্কার লাভ করেছে।

আজকের মালয়ালম গল্প বা উপন্যাসে যদি কেউ বাংলার গল্প বা উপন্যাসের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখে ফেলেন তবে আশ্চর্য হবার নেই কিছুই। ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সাধারণ মানুষের মনে যে সাগর গর্জন করে চলেছে তার সুর ধরে ফেলছে

সকল প্রান্তের সাহিত্যই। তাছাড়া বাংলার এত বই মালায়লমে অনুবাদ হয়েছে যে হিন্দী ছাড়া ভারতের অন্য কোন ভাষায় তা হয় নি বোধ হয়। এছাড়া নামকরা গল্প উপন্যাস তো আছেই। ফলে কেরলের সাহিত্য আজ আর, উন্নত যে কোনও ভাষার সাহিত্যের মত, আঞ্চলিক সাহিত্য থেকে তৃপ্তি পাচ্ছে না—সে আন্তর্জাতিক সাহিত্যের সভায় আসন করে নিচ্ছে দ্রুতগতিতে। এই মহাযজ্ঞে যে সব ঋত্বিক আহুতি দিয়েছেন বা দিয়ে চলেছেন তাঁদের মধ্যে তকযি, কেশবদেব, কারুর, কোওয়ুর, পেন্নকুন্নম্ ওয়র্কি, মুহম্মদ বশীর, সরস্বতী আম্মা, ললিতাম্বিকা, টি, এন, গোপীনাথন নায়ার, স্বর্গতঃ সরদার কে, এম, পাণিকর এবং আরো অজস্র নাম এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করতে হয়। বাংলা ভাষার উপন্যাসিকদের মত মালয়ালমের প্রায় প্রত্যেক ঔপন্যাসিকই ছোটগল্প লেখেন। বাংলার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কেরলের উপন্যাসও থানইট মাপের হচ্ছে এবং ছোট গল্পের অতি আধুনিক লেখক মানবমনের মাকড়সার জালের সূতা ধরে দোল খেতে আরম্ভ করেছেন। এ পরীক্ষাও নিশ্চয়ই আগামী দিনে মহৎকিছু সৃষ্টি করবার স্পর্ধা রাখ।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ভারতের সকল প্রান্তে সাহিত্য ক্ষেত্রে শোনা যায় মঙ্গলশংখধ্বনি। বাংলায় অবশ্য এই শংখ বেজেছিল আরো প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে। যাই হোক, উনবিংশ শতাব্দীর গান শেষ হতে না হতেই মালয়ালম সাহিত্য নতুন অর্ঘ সাজিয়ে নিয়ে হাজির হল সরস্বতীর মন্দিরে। এ নতুন অর্ঘ ত্রিফলক বিল্বপত্র। তিন মহাকবি এক সাথে এক গগনে উদিত হলেন সাহিত্য-বিতান হেসে উঠল তাঁদের জ্যোতির ধারায়। এঁরা হচ্ছেন মহাকবি ভাল্লাত্তোল নারায়ণ মেনন, মহাকবি উল্লুর এস. পরমেশ্বরয়্যার এবং মহাকবি কুমারণ আশান।

ভাল্লাত্তোলকে কেরলের রবীন্দ্রনাথ বলা হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই ভারতে ধর্মীয় এবং সামাজিক

সংস্কারের জোয়ার আনে। সাহিত্যক্ষেত্রে এই সংস্কারের প্রভাব পড়ে কিছু পরে। রাজনীতি ক্ষেত্রে সংস্কারের বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয় উনবিংশ শতব্দীর শেষের দিকে।

ভারতে বৃটিশ শাসনের প্রারম্ভ থেকেই খণ্ড এবং বিচ্ছিন্নভাবে বহু অভ্যুত্থানই অবশ্য ঘটে যায় ইতিপূর্বেই। জাতীয় স্বাধীনতা সম্পর্কে ধারণা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে থাকে। এতদিন স্বাধীনতা বলতে বোঝাত সামন্ততান্ত্রিক স্বাধীনতা। কোন রাজা বা নবাব বাদশার অধীনে থাকা ছাড়াও যে স্বাধীন ভাবে সমষ্টির এক বা একাধিক প্রতিনিধি দ্বারা দেশ শাসন করা যায় একথা গণতন্ত্রের উদ্গাতা ভারত ভুলেই গিয়েছিল। তাই স্বাধীনতা ঠিক কী ভাবে পেতে হবে এবং কী ভাবে পেলে, কাদের হাতে এলে যে সুবিধা হবে এটা ঠিক করতে সময় লাগবে বই কী। সভা সমিতি, আবেদন নিবেদন এবং স্মারকলিপির সাহায্য নিয়ে দেশ স্বাধীন করবার স্বপ্নে বিভোর হয়ে রইলেন একদল বুদ্ধিজীবি। তাঁদের চোখের সুমুখেই খণ্ড এবং বিচ্ছিন্নভাবে কত আন্দোলনই হল এবং সেগুলো দাবিয়ে দেওয়ার জন্য বৃটিশ সরকারকে সাহায্য করতেও সেই অভিজাত নেতারা একটুও ইতস্তত করলেন না। আজ জাতির পূজা পেয়ে থাকেন এমন কোন কোন মহামানব সেদিনের মোপলা অভ্যুত্থান, নীলবিদ্রোহের মত গণ অভ্যুত্থানকেও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিন্দা করতে ইতস্তত করেন নি। তথাকথিত রাজনৈতিক নেতা এবং সমাজ সংস্কার করা যাই করুন না কেন সাহিত্যিক বসে থাকেন নি। নীলদর্পন ই যেন সমাজের জনগণের প্রমূর্ত প্রতিবাদ।

কেরলেও দেখা যায় যে আগে সাহিত্যিকরাই জ্বালিয়েছেন ক্রান্তির মশাল আর সেই মশালের আলো দেখে এগিয়ে এসেছেন রাজনীতিকরা। আবার সাহিত্যিকদের এই মশাল জ্বালান হয় সর্বকালে জনমানসের আতসকাচের সাহায্যে। কেরলেও এই ত্রিশক্তি জ্বালিয়েছিলেন নতুন জীবনে ও যুগে উত্তারণের অগ্রগতির মশাল।

এতদিন সাহিত্য ছিল প্রাচুর্য এবং স্বাচ্ছন্দ্যের কোলে মানুষ কতিপয়ের আরাধনালব্ধ মনোরঞ্জনের মাধ্যম। অবশ্য এই মনোরঞ্জন তদানীন্তন ধ্যানধারণার বাঁধা পথ বেয়ে চলত। নিজের মনের কাছেই আপন মনোভাবে গোপন করার আত্মাবমাননাও থকত সেই আনন্দ উপভোগের মাঝে। সুভদ্রাধনঞ্জয়ম্ নাটক দেখতে গিয়ে সুভদ্রা এবং ধনঞ্জয়ের প্রেম তাদের অনাবিল আনন্দ দিত সত্যি কিন্তু সেই প্রেমেরই অবমাননা করত ওটা দেবতাদের লীলার অঙ্গ বলে মনে করে। রাবণকে কোনদিন বোঝাবার চেষ্টা হয় নি—রাবণ বলতেই মানুষ বুঝত একটা লাম্পট্য বাভিচার এবং অত্যাচারের প্রতিমূর্তি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার ঘৃণা আচরণ গুলোকেই প্রশ্রয় দেওয়া হত ভগবানকে পাবার নিকটতম রাস্তা বলে মনে করে। সাধারণ মানুষ আবার অভিজাত ঈশ্বরের উপাসনা, মন্দির প্রবেশ প্রভৃতি থেকেও বঞ্চিত ছিল।

ভল্লাত্তোল নারায়ণ মেনন ছিলেন কেরলের জাতীয় কবি। ভারতব্যাপী, বিশেষভাবে কেরলের নবজাগরণ এবং সমাজ-সংস্কারের আসনে বসে তিনি করেন তাঁর কাব্য-সাধনা। গান্ধীজীর সমাজসংস্কার আন্দোলনের সমর্থক এবং পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ভল্লাত্তোল। রবীন্দ্রনাথের মত তিনিও সাম্যবাদী রাশিয়ার নবজাগরণে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি মার্ক্সিয় দর্শনের প্রভাবে প্রভাবান্বিত ছিলেন বলেও অনেকের ধারণা।

সমাজ এবং রাষ্ট্রের নবজাগরণ তাঁর সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত।

ভল্লাত্তোল একজন শক্তিশালী কবি তো ছিলেনই উপরন্তু কেরলের প্রাচীনকলাকে যুগোপযোগী করে নেবারও সাধনা ছিল তাঁর। আজকে আমরা কথাকল্লির যে রূপ দেখি তা মহাকবি ভল্লাত্তোলের আজীবন তপস্যার দান। কথাকল্লিকে প্রচলিত জীবনের পটভূমিতে প্রতিষ্ঠা করা ছিল তাঁর সাধনা। বহু বাধাবিপত্তি এবং অসুবিধা মাথায় নিয়ে তিনি কথাকলিকে সর্বজনগ্রাহ্য এবং জনপ্রিয় লোককলার

পর্যায়ে উন্নীত করার যে সংগ্রাম সুরু করেছিলেন আজকের সুবিখ্যাত 'কলামণ্ডলম্' নামক সংস্থা তার ফলশ্রুতি। কলামণ্ডলমের অবিরত প্রচেষ্টা এবং পরাক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে কথাকল্লি যে সংস্কৃত রূপ পরিগ্রহ করেছে তা নিখিল জনচিত্ত জয়ে সমর্থ হয়েছে। ভল্লাত্তোলের কবিতা শব্দের সৌকুমার্য, চিত্রময়তা এবং ভাবসমৃদ্ধির জন্য বিখ্যাত। চিত্রযোগম্ তাঁর বিখ্যাত মহাকাব্য।

মহাকবি উল্লুর পরমেশ্বরয়্যর ছিলেন একাধারে পণ্ডিত, কবি ঐতিহাসিক এবং সমাজসংস্কারক। তাঁর রচনায় গভীর চিন্তা এবং পাণ্ডিত্যের স্পষ্ট স্বাক্ষর। তবে উল্লরের রচনা সাধারণ পাঠকের মনে তেমন কোনও প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। পণ্ডিত ব্যক্তিরাই তাঁর কাব্যের সম্যক রস গ্রহণে সমর্থ। এবং পণ্ডিতদের স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতিই তাঁকে প্রতিভাধর ও সার্থক কবির আসনে বসিয়ে ধন্য হয়েছে। মৌলিক রচনা ছাড়াও তিনি প্রাচীন মলয়ালম পুঁথি সন্ধান করেও জ্ঞানগর্ভ ভূমিকা এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকাসহ প্রকাশ করেন। তিনিই মালয়ালম সাহিত্যের প্রথম প্রামাণিক সুবৃহৎ ইতিহাস রচনা করেন। 'উমকেরলম্' তাঁর বিখ্যাত ঐতিহাসিক মহাকাব্য।

কবি কুমারণ আশান ছিলেন একাধারে সমাজ সংস্কারক কবি এবং রাজনীতিক। তাঁর জীবনে ছিল বৈচিত্র্য। গতানুগতিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সংস্কৃত শিক্ষাও চালিয়ে যান। জীবনের প্রথমাবস্থায় তিনি গ্রামের মন্দিরে পৌরোহিত্য করার সাথে সাথে কিছু শিক্ষার্থীকে সংস্কৃত শিক্ষা দিতেন। 'আশান' উপাধি তাঁর এই সময়েরই স্মারক। 'আশান' শব্দের অর্থ শিক্ষক। তিনি জীবনভোর ছিলেন একযোগে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী। তাঁর জ্ঞানতৃষ্ণা ছিল প্রখর। হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বাজত অবহেলিত ও অপমানিত মানবাত্মার অসহায় দীর্ঘশ্বাস। সাংসারিক জীবনে তিনি বরাবরই ছিলেন নিস্পৃহ। মহতী চিন্তায় এবং রচনায় কাটত তাঁর সময়। কাব্য সাধনার সুরু তাঁর কৈশোর কাল থেকেই কুমারণ আশান ছিলেন সমাজসংস্কারক মনে প্রাণে। এই সময়

শ্রীনারায়ণ গুরু কেরলের ঈষওয়র জাতির উদ্ধার কার্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি নিজেও ছিলেন একজন ঈষওয়র। কুমারণ গুরুর সহজসরল এবং স্পষ্ট সাম্প্রদায়িকতামুক্ত চিন্তাধারা এবং মত দ্বারা আকৃষ্ট হন। শ্রীনারায়ণ গুরুও এমন একজন প্রতিভাধর অমিতশক্তি কবি ও দার্শনিককে সাদরে কোলে টেনে নিলেন। কুমারণ শ্রীনারায়ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন।

সময়টা ছিল এমনই যে অস্পৃশ্যতার চাপে পড়ে কেরলের ঈষওয়র জাতির সুমুখে অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ধর্মান্তর গ্রহণ ছাড়া অন্য কোন রাস্তা দেখতে পাচ্ছিলেন না। সেই সময়ে পূর্ববাংলায়ও চলছে অনুরূপ অবস্থা। বহু নমঃশূদ্র প্রভৃতি তপশীলি জাতি মিশনারীদের সর্বমানবের সমাজে সমান অধিকারের বাণী প্রচারের ফলে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করছেন কেরলের শ্রীনারায়ণ গুরুর মত ফরিদপুরের ওড়াকান্দি গ্রামে নতুন। বাণী নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল শ্রীগুরুচাদ ঠাকুর সমসাময়িক কালেই।

নারায়াণ গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করার পর আশান বেরিয়ে পড়লেন হিন্দু-দর্শনের বিভিন্ন শাখায় জ্ঞান লাভের জন্য। তিনি জানতেন যে গোঁড়া ধর্মধ্বজীদের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার তাদের 'হাঁ' কে না করার মত তার্কিক জ্ঞান। সুতরাং আশানও সবচেয়ে জোর দিলেন তর্ক শাস্ত্রের ওপর। সাপ দিয়েই সাপের বিষ তুলতে হবে। ১৯০০ খৃঃ অব্দে তিনি ফিরে এলেন কেরলে পাঁচ বছর বিদেশ বাসের পরে। এই পাঁচ বছর তিনি মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, কলকাতা প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতদের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন।

ফিরে এসে আশান গুরুর আরব্ধ কাজের ধ্বজদণ্ড নিজের হাতে তুলে নিলেন। তিনি বুঝেছিলেন সুসংগঠিত সংস্কার আন্দোলন ছাড়া যুগ যুগ সঞ্চিত আবর্জনারাশি অপসারিত করা সম্ভব নয়। মাদ্রাজ কলকাতা প্রভৃতি অঞ্চলে তিনি দেখে এসেছেন নবজাগরণের জোয়ার, অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করেছেন 'মূর্খ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।' দক্ষিণেশ্বরের তরুণ যোগী বিবেকানন্দের

জীবিত কালেই তিনি ছিলেন কলকাতায়। বিবেকানন্দ দেহত্যাগ করেন ১৯০২ খৃঃ অব্দে। একদিকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং কেশব-সেনের ব্রাহ্মধর্ম এবং ব্রহ্মসমাজদ্বয় অন্যদিকে বিবেকানন্দ এবং দক্ষিণেশ্বর—কলকাতায় তখন বিংশশতাব্দীর আগমনের সংবাদ পৌঁছে গেছে। সমাজ জীবনে, রাজনৈতিক জীবনে পড়েছে সাজ সাজ রব।

সুতরাং উদ্দেশ্যমূলক শিক্ষা গ্রহণকালে অনুকূল সামাজিক আবহাওয়াও তিনি পেয়ে গেছেন কলকাতা থেকে যা অনিবার্য ভাবেই তাঁকে পরবর্তি জীবনের কার্যক্রম নির্ধারণে সাহায্য করে। ইতিমধ্যে ১৮৮৫খৃঃ অব্দে ভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অবশ্য উল্লেখযোগ্য কোন কাজই তখনো হয় নি তাঁদের দ্বারা। নতুন জাতীয় চিন্তাধারার জোয়ার উঠতে দেখেছেন শ্রীআশান। দেশে ফিরে গুরুর মন্ত্রে কেরলকে জাগাবার প্রেরণায় তিনি কর্মসমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। তাঁরই প্রত্যক্ষ উদ্যোগে এবং নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হল শ্রীনারায়ণ-ধর্ম-পরিপালন-যোগম্ নামক সংস্থা। এই সংস্থার সভ্যরা কেরলের বিভিন্ন স্থানে সভাসমিতি করে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের, সমাজের গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার কাজে ব্রতী হলেন। সংস্থার মুখপত্র ছিল 'বিবেকোদয়ম্'—সম্পাদনায় ছিলেন আশান নিজে। তাঁর প্রাজ্ঞ, দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং শক্তিশালী লেখনী সংস্থার আদর্শ প্রচার কার্যে একযোগে নিরত হল। আশান সংস্থার আদর্শ প্রচারের জন্য কেরলের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

কেরলের সংস্কার আন্দোলনে শ্রীনারায়ণ-ধর্ম পরিপালন যোগম্ এবং সংস্কারবাদী প্রগতিপন্থী নাম্বুদিরীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যোগ-ক্ষেম-সভা সাঁড়াশী অভিযান সুরু করলে এবং কূপমণ্ডুকতার মূল শিকড় দিলে কেটে। এরপর গান্ধিজীর হরিজন আন্দোলনের প্রভাব পড়ল আরব্ধ কর্মকে সুসম্পন্ন করতে। আজ যে অস্পৃশ্যতার পাপ কেরল

থেকে একেবারে মুছে গেছে একথা বলা যায় না তবে যতদিন সরকারী নথিপত্র থেকে 'তপশীলভুক্ত জাতি' শব্দটার শ্মশান যাত্রা না ঘটান যাচ্ছে ততদিন তা আর সম্ভব হচ্ছে না। ভারতীয় স্বাধীনতার সমবয়সী উদ্বাস্তু সমস্যা—তপশীল সমস্যা তো আরো পুরানো। মনে হয় তপশীলভুক্ত জাতিদেরই এ ব্যাপারে আন্দোলন করার সময় এসেছে কাঁটা গাছের বিষাক্ত শিকড়কে সমাজ জীবনের খুব বেশী গভীরে ঢুকতে দেওয়া কোন কাজের কথা নয়। আইন কোনও অধিকার দিতে পারে না—অধিকার কায়েম করতে হয় আপন শক্তিবলে, ইতিহাস এই শিক্ষাই দেয়।

কৈশোর থেকেই আশানের কবিতা রচনা চলতে থাকে। তিনি সংস্কৃত প্রবোধচন্দ্রোদয়ম নাটক, আদি শংকরাচার্যের 'সৌন্দর্যলহরী' বিবেকানন্দের 'রাজযোগ' এবং এডুইন আর্নল্ডের 'দি লাইট অফ এশিয়া' গ্রন্থগুলি মালয়ালমে অনুবাদ করেন।

বৌদ্ধ ধর্মের কিছু কাহিনী তাঁর লেখনী স্পর্শে নতুন করে উজ্জীবিত হয়। তাঁর আদর্শ যেন মূর্ত হয় 'চণ্ডাল ভিক্ষুকী' এবং 'করুণা' কাব্যে। এক চণ্ডাল যুবতীর বৌদ্ধ ভিক্ষু আনন্দের প্রতি অনুরক্তি তাকে 'জেতুবন' বিহারে গিয়ে পরিব্রজ্যা গ্রহণ করায়। বুদ্ধদেবের সর্বজীবে সমভাব আদর্শ সারাদেশে আলোড়ন তোলে। চণ্ডালী কীভাবে সন্ন্যাসিনী হতে পারে বুঝতে অসুবিধা হয় চতুরাশ্রম-বিকৃতিদুস্ট সমাজের মানুষের পক্ষে। রাজা প্রসেনজিত স্বয়ং সরেজমিনে এসে বুদ্ধের বানী শুনে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই গল্পেরই প্রথমাংশের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন তাঁর 'চণ্ডালিকা' নৃত্য গীতিনাট্য।

সন্ন্যাসী উপগুপ্ত, মথুরার নটি বাসবদত্তাকে কীভাবে কখন বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত করেন এবং বাসবদত্তা নির্বাণ লাভ করে তারই কাহিনী 'করুণা'। বাঙ্গালীর কাছে এ কাহিনীও রবীন্দ্র প্রতিভার স্পর্শে নতুন রূপ পেয়েছে।

'চণ্ডাল ভিক্ষুকী' এবং 'করুণা'র নায়িকা উভয়েই সমাজের নীচের তলার মানুষ। কিন্তু মনুষ্যত্ব এবং মহত্বের বৈভব তাদের অন্তরকেও ধনবান করতে পারে, তাদের জীবনেও জাগতে পারে ঈশোপনিষদের বাণী, তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা—।

অন্ধত্ব প্রতিপন্ন হয় আলোকের প্রসাদেই,' আজন্ম যে অন্ধকারেই রইল তাকে অন্ধ বলে গালি দিলে লাগে নিজেকেই।

অন্ধকারার লৌহকপাট ভেঙ্গে লোপাট করারই আদর্শে ব্রতী হয়েছিলেন কুমারণ।

কুমারণ আশান ত্রিবাংকুর রাজসভার সদস্যপদও পেয়েছিলেন। তিনি আজীবন সাহিত্যে অনুন্নত শ্রেণী ও সমাজের সেবা করে যান। তিনি আপন আদর্শের গভীরে এতই নিমগ্ন ছিলেন যে ১৯২১ খৃঃ অব্দের মোপলা বিদ্রোহের অন্তরের মূল কথাটাও তিনি শুনতে পান নি। তাঁর ১৯২৩ খৃঃ অব্দে লেখা 'দুরবস্থা' গ্রন্থে দেখি একটি নাম্বুদিরী যুবতীর কাহিনী। মুসলমানদের অত্যাচারে তাদের সংসার যখন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। সে এসে আশ্রয় নিল এক অস্পৃশ্য জাতির যুবকের কাছে। পরে তারা বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হল। কুমারণ হয়ত তাঁর আখ্যায়িকার নাম্বুদিরী মেয়ের সঙ্গে এক অস্পৃশ্য জাতির যুবকের বিয়ে দিয়ে বর্ণ হিন্দু এবং অন্ত্যজদের মধ্যে সেতুবন্ধনের আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলেন, কাব্য শেষ করার আগে কিছু আগাম উপদেশও হিন্দুধর্মের নায়কদের উদ্দেশে দেওয়ার উপলক্ষ্য খুঁজে পেয়েছিলেন কিন্তু মোপলাদের মহান সংগ্রামকে কী হেয় করেন নি? অথবা ধর্মে এবং সম্প্রদায়বিশেষের স্বার্থরক্ষার একাগ্রতা মানুষকে মানুষ চিনতে দেয় না ঠিকভাবে!

আশান মূলতঃ হিন্দুদর্শনের প্রাসাদশিখরকেই বেছে নিয়েছিলেন তাঁর কাব্যের পাদপীঠরূপে। সেই পাদপীঠের যেখানেই লেগেছে তাঁর নিজের প্রাণের আলোর স্পর্শ সেখানেই আশান অমর।

এক নৌকা দুর্ঘটনায় এই স্বনামধন্য কবির জীবনাবসান হয়।

রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলীর মালয়ালম অনুবাদক কবি জি. শংকর কুরুপ্পু আজকের কেরলের বর্ষীয়ান কবিদের অন্যতম। তাঁর কাব্যকলা এবং কৃতী কাব্যরসিকদের স্বীকৃতিধন্য। সাহিত্যকৌতুকম, স্বপ্নশৌধম, সূর্যকান্তি, সন্ধ্যা প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ। তিনি জ্ঞানপীঠ পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত কবি।

কেরলের সুকান্ত কবি কৃষ্ণ পিল্লাই মাত্র পঁয়ত্রিশ বছরে মারা যান। কিন্তু কেরলের "মূঢ় জনতা'র কবি তিনি। তাঁর কাব্যে দরিদ্র এবং বেকারত্বের জ্বালা, সমাজের অত্যাচার, প্রেম, জীবনের নৈরাশ্য এবং বিপ্লবের স্বপ্ন ছড়ান। অশিক্ষিত মজুর কিষাণের তিনি প্রিয়তম কবি। তাঁর সাহিত্যের জনপ্রিয়তার প্রমাণ তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির সংস্করণের পর সংস্করণ।

আজকের মালয়ালম সাহিত্য অজস্র কবির সাধনাক্ষেত্র। যে ভাষায় রোজ প্রভাত সূর্যের সাথে সাথেই ৪২টি (বিয়াল্লিশ) দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় এই ছোট্ট রচনাটিতে সে ভাষার কজন সাহিত্যিক এবং কবির নাম দেওয়া সম্ভব?

মালয়ালম ভাষার বর্তমান কবিদের মধ্যে নারায়ণ মেনন, কে. কে. রাজা, কে. কেশবন নায়ার, বেণীকুলম গোপাল কুরুপ্পু, এন. শ্রীধর মেনন, ওলপ্পমন্ন পি. ভাস্করণ, বালমণি আম্মা, বেল্লায়নি অর্জুনন, সুগতকুমারী, পালা নারায়ণন নায়ার, মালয়ালম ভাষায় ওমর খৈয়ামের অনুবাদ এম. পি. অপ্পন প্রভৃতি।

বিভিন্ন ভাষা থেকে মহৎ সাহিত্যের অনুবাদ কেরলে চলে আসছে মালয়ালম ভাষার জন্মক্ষণ থেকেই। কেরলের মঞ্চে যেমন কথাকল্লি প্রদর্শিত হয় তেমনই দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং গিরিশ ঘোষের নাটকও অভিনীত হয় মালয়ালম ভাষায়। বাংলা ভাষার এত বেশীসংখ্যক গল্প কবিতা উপন্যাস প্রভৃতি মালয়ালম ভাষায় অনুদিত হয়েছে এবং হচ্ছে যে তার হিসাব তৈরীও দীর্ঘ গবেষণাসাপেক্ষ ব্যাপার।

প্রাচীন সংস্কৃতির পীঠস্থান কেরল। সেখানকার আজকের জনজীবনেও আদিম, কৃষিকেন্দ্রিক এবং প্রাকবিভক্ত সমাজের স্মৃতি দুর্লভ নয়।

বারো মাসে তেরো পার্বণ কেরলে। হিন্দু পার্বণগুলির মধ্যে তিরুবাতিরা, ওনম্, বিষু, প্রভৃতি উৎসব নিঃসন্দেহে কৃষিপ্রধান অঞ্চলের যোগ্য উৎসব। উৎসবগুলির পিছনে যে ইতিহাস রয়েছে, উৎপত্তিগত গূহ্য তাৎপর্য এবং তৎকালীন বিশ্বাসের মূল নিহিত রয়েছে তার আভাষ সুস্পষ্ট।

ওনম কেরলের সবচেয়ে বড় উৎসব এবং জাতীয় উৎসবের পর্যায়ে উন্নীত। ওনমের কথায় পরে আসা যাবে'খন। তিরুবাতিরা উৎসব কেরলের দ্বিতীয় বড় উৎসব। এখানে বলে রাখা ভাল যে মুসলমান এবং খৃষ্টান পর্ব এবং উৎসবগুলি মূলতঃ অন্যান্য অঞ্চলের মতই এখানে পালিত হয়। আঞ্চলিক বিশেষত্বের বিশেষ অবকাশ নেই সে সবে। সুতরাং সেগুলোর বিবরণ থেকে বিরত থাকছি।

পৌষমাসের আর্দ্রা নক্ষত্রে পূর্ণিমার দিন হয় তিরুবাতিরা উৎসব উদযাপন। উৎসবটি মূলতঃ কুমারী এবং সধবা মেয়েদের। কেরলে কেবল নাম্বুদিরী ছাড়া হিন্দুদের অন্যান্য সকল শাখার মধ্যেই বিধবা বিবাহ প্রচলিত নিয়ম।

উৎসবের আগে দশদিন ধরে চলে ব্রত। উষাসমাগমে মেয়েরা দল বেঁধে যায় স্নান করতে। ডুব দেয় জল ছিটোয়। জল ছিটান এবং ডুব দেওয়া স্নানের অবশ্য পালনীয় অঙ্গ। স্নান শেষে গান ধরে—

> ধনুমাসত্তিল তিরুবাতিরা ভগবাণ্টে তিম্নুনালল্লো
> উণ্ণরুতে উরংডরুতে আটণম্পোল্ পাটণমপোল্
> তুটিক্কণমপোল্ কুলিক্কণমপোল্।

ধনুমাসের (পৌষমাস) তিরুবাতিরা শিবের জন্মদিন আর পার্বতীর (ভগবতী) শ্রেষ্ঠ ব্রতের দিন। তাই ভাত খেয়ো না, শুয়ো না। নাচ, গাও, ডুব দাও, জল ছিটাও।

দেবীরহস্যের মূল কথা সৃষ্টিতে দেবীই প্রধান। আদমের দেহ থেকে এখানে ইভের উৎপত্তি নয়। দেবীর দেহ থেকেই উৎপত্তি সৃষ্টির আধাবখরাদার দেব। সারা পৃথিবীতে যেখানে যেখানেই মাতৃপ্রধান সমাজের একদা অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে সেখানেই দেখা গেছে তদানীন্তন বিশ্বাস অনুযায়ী পুরুষ-সব্যসাচী নেহাতই নিমিত্তমাত্র। তাদের সেখানে একটাই পরিচয়—সন্তানের জন্মদাতা।

সৃষ্টিরহস্যের মূল কথাই নারী পুরুষের মিলন। এবং সেই মিলনের ফলেই সৃষ্ট জগৎসংসারের তাবত জীব। আদিমকালে মানুষের কল্পনা নারীপুরুষের মিলনকে কেন্দ্র করেই শস্যোৎপাদন, জলবৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক কারণগুলোকেও চিন্তা করত। এজন্য বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানাদিও প্রচলিত ছিল। সূর্য উত্তরায়ণে প্রবেশ করছেন। সেই মাহেন্দ্রক্ষণে জন্ম নিচ্ছেন শিব।

শিব এখানে পার্বতীর তপস্যায় নবজন্ম গ্রহণ করে পার্বতীর সঙ্গে মিলিত হন। পূর্ণিমার রাত কাটে তাঁদের বনে উপবনে। কখনো ফুল তুলে খোঁপায় গোঁজেন পার্বতী, কখনও বা পান পাতা ছিঁড়ে নিয়ে চিবান, কখনও বা বন্যঝুরীর দোলায় দোলেন যুগলে।

পর্বের কথা মাত্র এইটুকুই। এবং এই সঙ্গে যে অনুষ্ঠান তাতে যেন শিবপার্বতীর প্রথম মিলনের দিনটিকে আবার ফিরিয়ে আনার প্রয়াস।

মেয়েরা ঊষালগ্নে ডুব দেয় নদীতে পুকুরে, জল ছিটোয় গান করে। স্নানান্তে চন্দন, কুমকুম, হলুদ প্রভৃতি মাঙ্গলিক (একদা বিশেষ বিশেষ প্রতীক ?) উপচারের ফোঁটা কাটে কপালে, মাথায় দেয় 'দশপুষ্প' বা দূর্বা প্রভৃতি বিভিন্ন ঘাসের গুচ্ছ।

সূর্যের উত্তরায়ণ কাল নববর্ষার আগমন কালও বটে। জল ছিটানোর মধ্যে সেই বর্ষাকে আবাহন, ডুব দেওয়ার মধ্যে বর্ষাধারায় স্নান করে ধরিত্রীর শষ্যাধারণের উপযোগী শুচি হবার এবং দশপুষ্পের গুচ্ছের মধ্যে ধরিত্রী শ্যামলী হবার কল্পনা সুরুতে প্রত্যক্ষ ছিল কী না কে জানে। মেয়েদের হাতে মাখা মেহেদীর ফিকে লাল রং এর কথাটা

না হয় একপাশে ঠেলে রাখা গেল অনেকের শুনতে ভাল লাগবে না ভেবে। মেহেদীর রংটাও কী শস্যোৎপাদনের আদিম বিশ্বাস সংশ্লিষ্ট নারীদের কোনও বিশেষ প্রকৃতিগত অবস্থার প্রতীক নয় ?

উৎসবদিনে মেয়েরা হরপার্বতীর মন্দিরে গিয়ে যুগলদর্শন (আর্দ্রা দর্শন) করে। পরের দিন রাতভর জাগে। মাঝরাতে মাথায় গোঁজে "পাতিরাপ্পূবু" (রাতের পুষ্প) নামে এক বিশেষ পুষ্প। যদি কেরলের তন্ত্রগ্রন্থগুলি নিয়ে কোনদিন সংস্কার মুক্ত এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবেষণা হয় তবে একটি বিশেষ ফুল হরপার্বতীর মিলন রাত্রির পরেরদিন মাঝরাতে কেন ব্রতধারিনী মেয়েরা মাথায় গোঁজে তথ্য উদ্‌ঘাটিত হবে বলে বিশ্বাস করি। বাংলার মত কেরলের জীবনেও সাধারণ ধর্মীয় বা লৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে চৌদ্দ আনা রয়েছে তন্ত্রের প্রভাব। তা সে তন্ত্র হিন্দু তন্ত্রই হোক আর বৌদ্ধতন্ত্রই হোক। আসলে এই উভয় তন্ত্রই এক মৌলিক বিশ্বাসের দুই শাখা।

তিরুবাতিরা উৎসবের প্রায় প্রতিটি অনুষ্ঠানে রয়েছে তান্ত্রিক ধ্যানধারণার প্রভাব। এবং তন্ত্র বলতেই কিছু মানুষের নাক সিঁটকে এলেও বাংলার দুর্গোৎসবের মত রাজসিক অনুষ্ঠানেও বৈদিক সমাজের চন্দনলিপ্ত তান্ত্রিক ধ্যানধারণারই প্রতাপ। পুত্রকন্যা পরিবৃতা দূর্গাদেবীর প্রতিমা দূর্গাপূজার বাহুল্য—আসল পূজা হয় ঘট এবং যন্ত্রের। আর এই ঘট এবং যন্ত্র নিঃসন্দেহে তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ডের মূল উপাদান। তান্ত্রিকের দৃষ্টিতে ঘট এবং যন্ত্রের ব্যাখ্যার কোনও প্রয়োজন নেই এখানে তবে এটুকু বলে রাখা ভাল যে ব্যাখ্যা তার যাই হোক না কেন এ কালের জ্ঞানকে সেকালের কল্পনা এবং বিশ্বাসের প্রতিপক্ষ খাড়া করলে ভুলই করা হবে।

ফিরে আসা যাক তিরুবাতিরার অনুষ্ঠানে।

আজকে তিরুবাতিরা উৎসব আমাদের মনে ধর্মের চেয়েও যে ভাবটি বেশী করে জাগায় তা হচ্ছে আনন্দ—অনুষ্ঠানগত সৌকুমার্য এবং কলাবোধ উদ্দীপ্তকারী আনন্দ।

তিরুবাতিরা এসে গেছে। দোলনা টাঙ্গান হয়েছে প্রতি গৃহের অঙ্গনে এক বা একাধিক। মেয়েরা দোলায় দুলছে আর গাইছে ঝুলন গান (উঞ্চল পাট্টু)।

নৃত্যের দেশ কেরল। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এখনও দেখি সেখানে নৃত্যের প্রভাব। তিরুবাতিরা আগের রাতগুলো চাঁদের আলোয় ফুলের বন্যা বইয়ে দেয় মেয়েদের কণ্ঠ থেকে সুললিত উলুধ্বনির অনুরূপ 'ওয়াক্কিলা' ধ্বনি নেচে ফেরে পল্লীর পথে প্রান্তরে। 'তিরুবাতিরাকল্লি'র নাচ এবং গানের ঢেউ বহে যায় সারা দেশের উপর দিয়ে। সেই সুর হিল্লোলে দোল খায় সুপারীকুঞ্জ, তান ধরে নারিকেল বীথির তানপুরা।

উৎসবটায় আধিপত্য মেয়েদেরই। পুরুষরা এখানে প্রায় অনুপস্থিত। তাদের ভাগে পড়েছে কেবল স্ত্রীপুত্রকন্যাদের ঐ একদিনের খাবারদাবার বা অন্যান্য যা কিছু দরকার জোগাড় করে দেবার দায়িত্ব। কারণ সারা বছর তো তারা সমাজ ব্যবস্থার নিয়মে সে দায় থেকে মুক্তই থাকে।

যে স্বামী সে দায়িত্বটুকুও পালন করে না তার মত হাড়হাবাতে, মুখপোড়া ইত্যাদি ইত্যাদি। আজ্ঞে হাঁ, বাংলার সঙ্গে তফাৎ নেই বাকীটুকুর ক্ষেত্রেও।

তবে তিরুবাতিরা উৎসব খুব সম্ভবতঃ! নব বর্ষ (অগ্রহায়ণে বর্ষ সুরু হত এককালে) উৎসব। এবং তা কোনও এক সময়ের কৃষি কেন্দ্রিক সমাজের উৎসব। উৎসবের মধ্যে তাই দেখি প্রচুর বৃষ্টিপাত, সবুজ ফসল এবং সেই ফসলের অধিষ্ঠাত্রী, রক্ষাকর্ত্রী এবং জন্মদাত্রী দেবীরও পূজা। সঙ্গের দেবতা শিব বাবাজী আছেন জেলের পিছে কেলে হাঁড়ির মত সুরু থেকেই তবে একটু ধোপদুরস্ত জামাই আদর পেতে তাঁকে অনেকদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

·

বিষু উৎসব প্রকৃতপক্ষে শিশু উৎসব বললেই চলে। শিশুদের

আমোদ আহ্লাদ দেওয়ার দিকেই এই উৎসবে জোর দেওয়া হয় বেশী। হিরণ্যকশিপুর কাহিনী এই উৎসবের সঙ্গে যুক্ত।

বিষু আর একটি নববর্ষের দিন। চৈত্র (মেটম্) মাসের পয়লা হয় এই উৎসব। বিষুর দিন সকালে নববর্ষকে স্বাগত জানান হয় নতুন ফলের প্রদর্শনী সাজিয়ে। ঐদিন আম, কাঁঠাল, প্রভৃতি ফল এবং বিভিন্ন তরিতরকারীর প্রদর্শনী সাজান হয় প্রতি ঘরে। সঙ্গে থাকে চাল। প্রভাতে উঠে উৎসব সুরু ঐ প্রদর্শনী দেখে। যেন নববর্ষের প্রথম দিনটিতে সারাবছরের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যকে মানুষ কামনা করে ঐ সব সম্পদভার দর্শন করে। সারা বছর যেন খাদ্যবস্তু দেখতে পায় সকলে এই কামনা নিশ্চয়ই লুকিয়ে রয়েছে অনুষ্ঠান পরিকল্পনায়।

এই দিনটি নববস্ত্র দেওয়া এবং পাওয়ার দিন। গৃহকর্তা ঘরের ছেলেমেয়ে চাকর বাকর সবার জন্য কেনেন কাপড়, উপহার দেন। খাওয়া দাওয়ারও সাধ্য অনুযায়ী পর্যাপ্ত বন্দোবস্ত থাকে।

বিষু উৎসবের বিশেষ অঙ্গ পটকা (পটক্কম্)। পটকা ছাড়া বিষু উৎসব ? ছেলেপুলেরা মিষ্টি ছাড়া প্রথমন্ (পায়স) খেতে রাজী আছে, পটকা ছাড়া বিষু উৎসব ? নৈব নৈব চ।

কেরলের সবচেয়ে মহত্বপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক স্মৃতিবাহী উৎসব ওনম্. ওনম্ আজ কেরলের জাতীয় উৎসব। ওনম্ উৎসব আজ আর কেবল হিন্দুর নয়, সর্বসম্প্রদায়ের। বিদেশে যেখানেই পাঁচজন মালয়ালী (কেরলবাসী) আছেন সেখানেই আছে ওনম উৎসব। আজকের দিনে ওনমকে বাদ দিলে কেরল জীবনের সংস্কৃতির সার্বজনীন রূপটিকেই বুঝি বাদ দিতে হয়। কেরলের এই দিনটিতে নেই উচ্চনীচে ভেদাভেদ, নেই কোনও মনোমালিন্য, শত্রুতা। এ যেন আনন্দ সাগরে একত্র ভেসে যাওয়া একই লক্ষ্যে স্থির রেখে—লক্ষ্য জাতীয় ঐক্য।

এই দিনটির জন্য জাতির প্রতি জ্ঞানীদের নির্দেশ, কাণম্ বিট্রুম্ ওনম্ উণ্নম্ অর্থাৎ জমি বিক্রী করে হলেও এদিন পেট ভরে খাবে।

এই নির্দেশের মধ্যেই যেন লুকানো রয়েছে স্মরণাতীত কালের এক ট্রাজেডীর অশ্রুবাষ্প। গল্পটাতেই পৌঁছাতে হয় তাহলে।

মহারাজা বলীর রাজত্ব ছিল কেরল। পরম বৈষ্ণব মহারাজ বলী। তাঁর রাজ্যে নেই অকাল মৃত্যু, নেই দারিদ্র অনাহার অবিচার উপদ্রব। বলীর সুশাসন ফেলে কেউ স্বর্গরাজ্যেও যেতে রাজী নয়। দেশের ঘরে ঘরে খুশীর হাট। প্রজাবৎসল সুশাসক ধার্মিক রাজার রাজত্বে অসুখী মানুষ পাওয়া যাবে না মাথা কুটে মারলেও। অবশ্য মাথা কুটে মরারও কোন কারণ কোনদিন বলীর রাজত্বে ঘটেনি।

বলী রাজার ধর্মের খ্যাতিতে এবং প্রভাবে কেঁপে উঠলেন স্বর্গের দেবতারা। যে ভাবেই হোক মহারাজ বলীর প্রভাব এবং প্রতিপত্তি ক্ষুন্ন করতে হবে। অন্যথায় ঐ অসুরটা (?) হয়ত স্বর্গের সিংহাসনের দিকে হাত বাড়াবে, অমৃতভাণ্ডের সন্ধান করবে।

ব্যবস্থাও ঠিক হয়ে গেল।

বামন অবতার ধর্মপ্রাণ বলীর কাছ থেকে ত্রিপাদ ভূমি যাচ্ঞা করলেন। অত ভেবেচিন্তে দেখবার মত মানসিক গঠনে বক্রতা ছিল না মহারাজ বলীর। তিনি আরাধ্যকে দান করে বসলেন যথাসর্বস্ব। এবার এল দেবতাদের পালা। বলী চলে গেলেন পাতালে। প্রজারা জানল রাজা গেছেন ভগবানের তপস্যা করতে নির্জনে পাতালে। পাতালটাই ছিল সম্ভবতঃ স্বর্গের Bastille—রাস্তা যার একটিই এবং সেটা প্রবেশের!

তবে একজন জনপ্রিয় নেতার নির্বাসন মানুষ আজকের মত সেদিনও সহজভাবে মেনে নিতে রাজী ছিল না। সেজন্যও ব্যবস্থা হল প্রচারের। স্বর্গের প্রচার বিভাগের তখনকার অধিকর্তা কে ছিলেন কে জানে? দেশের লোক জানলেন মহারাজ বলী দুশ্চর তপস্যায়

ব্রতী হয়েছেন পাতালে। সেখান থেকে তিনি বছরে একবার এসে প্রজাদের অবস্থা ছদ্মবেশে দেখে যাবেন। কারণ প্রজাদের সুখেই তাঁর সুখ, প্রজাদের অসুখী দেখলে তাঁর সাধনায় ঘটবে বিঘ্ন, ঈশ্বরপ্রাপ্তিতে ঘটবে বাধা।

কে জানে ততদিনে শাণিত খর্পরের কল্যাণে মহারাজের ঈশ্বর প্রাপ্তি সত্যি সত্যিই ঘটে গিছল কিনা! দেশের মানুষ জানল তাদের রাজা আসবেন প্রতিবছর শ্রাবণ মাসের তিরুওনম (শ্রবণ) নক্ষত্রের দিন। দেব রাজ্যে তারা কেমন সুখে দিন কাটাচ্ছে দেখতে।

তাই প্রচলিত হল 'ওনম্' পর্বের। ঐ দিন মহারাজ বলীর তথাকথিত বাৎসরিক পরিদর্শন দিন। সেদিনটা সারাদেশ হত সজ্জিত। নববস্ত্রে সজ্জিত হত মানুষ। ঘরে ঘরে প্রচুর খাবারের ব্যবস্থা। পরের ঘরে নিমন্ত্রণ পর্যন্ত খাবে না কেউ সেদিন। কারণ রাজা যদি ভাবেন যে নিজের ঘরে উপযুক্ত বা প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য না থাকায় নিমন্ত্রিত গেছে পরের বাড়ী পাত পাড়তে? তাহলেই তো চিন্তিত হবেন রাজা। বিঘ্নিত হবে তাঁর তপস্যা: সুতরাং—কানম্ বিট্টুম্ ওনম্ উন্নম্!

আজ কেরলের আনন্দ উৎসবগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন ওনমের। ঘরে ঘরে আলপনা এঁকে মহারাজকে স্বাগত জানান হয়। ফুলে ফুলে ভরে থাকে ঘর। ঘরে ঘরে আনন্দের ফোয়ারা। বামন অবতারের মূর্তিপূজা হয় ঘরে ঘরে চারদিন ধরে।

আবার ওনম উৎসবকে আগামী ফসলের প্রত্যাশার উল্লাস মনে করলেও ভুল করা হবে না। কালো কালো হাতীর পালের মত মেঘ আকাশ থেকে অন্তর্হিত। তার বদলে সাদা পাল তুলে দিয়ে আকাশ পথে যেন নেমে আসছেন লক্ষ্মী। শ্যামল আঁচল তাঁর ছড়িয়ে পড়েছে পথে প্রান্তরে। 'পারে না বহিতে নদী জলভার'—গাছে গাছে দোয়েল শ্যামা বুলবুলিদের খুশীর জলসা।

কৃষিপ্রধান অঞ্চলের খুশীর সময় বই কী। কিছু দিনের অবসর

মিলেছে কমলকেটে ঘরে তোলার শ্রমের আগে। সুতরাং নেচে নাও —কামনা কর সর্বোত্তম ফসলের।

বিভিন্ন ধরণের খেলাধূলারও প্রচলন আছে ওনম উৎসবে। তার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং বর্ণসুষমামণ্ডিত খেলা হচ্ছে 'বঞ্চিকল্লি' বা নৌবিহার। নৌবিহার না বলে একে বাংলায় নৌবাইচ বলাই যুক্তিযুক্ত।

বাংলার মত নদীর দেশ কেরল। এখনও কেরলের ধমণী এই নদীগুলি। নদীর সঙ্গে বাংলার মত কেরলেও তাই অনেক সুখ দুঃখ, হাসি কান্না, আনন্দ-নিরানন্দ বিজড়িত। উৎসবের দিনেও তাই কেরলের মানুষ নদীকে দূরে রাখতে পারে না। সারা অঞ্চল এসে ভেঙ্গে পড়ে নদীর কিনারায়। পম্পা নদীর বঞ্চিকল্লিই সবচেয়ে বিখ্যাত।

কেরলের নৌবিহার এখন একটি জাতীয় ক্রীড়া। হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সকলেই এতে অংশগ্রহণ করে সমান উৎসাহ এবং আগ্রহে। উৎসবের অনেক আগে থেকেই গ্রামে গ্রামে সাড়া পড়ে যায়। নৌকার তলায় মাছের তেল মাখান হয়। নৌকায় রং লাগান হয়। সজ্জিত করা হয়। সবারই চেষ্টা তাদের গ্রামের নৌকাখানাই যেন সবার সেরা তেজী হয়, সবার সেরা সুন্দর হয়। সবারই চেষ্টা যেন বিজয় মাল্য দোলে তাদেরই গলায়।

কেরলের এই বর্ণাঢ্য জাতীয় জলক্রীড়া বঞ্চিকল্লির পিছনেও রয়েছে পৌরাণিক গল্প। গল্পটা এই ক্রীড়ার উদ্ভব এবং প্রচলন সম্পর্কে। গল্পটা খুবই সহজ সরল এবং সাদামাটা তবু একটু লক্ষ্য করলেই ধরতে অসুবিধা হয় না তার নির্গলিতার্থ। গল্পটা এই রকম—

এক ছিলেন নিঃসন্তান নাম্বুদিরী। 'তিরুওনম' নক্ষত্রের দিন তিনি চাইলেন পুত্রকামনায় কয়েকজন ব্রাহ্মণ সন্তানকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে। সেইমত নিমন্ত্রণও করলেন। কিন্তু দিনটা কেরলের ওনমের দিন। সেদিন ঘরে ঘরে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা—কেউ যায় না কারো বাড়ী খেতে। ফলে নিমন্ত্রিত বালকরা কেউই এল না। ব্রাহ্মণের মনের অবস্থা দেখে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এক ব্রাহ্মণসন্তানের রূপ ধরে এসে ব্রাহ্মণের

ঘরে খেয়ে গেলেন। পরের বছর 'তিরুওনম' নক্ষত্রের দিন আগত। শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণকে স্বপ্ন দিলেন যেন তাঁর ভোগ আরন্মুলার পার্থসারথি মন্দিরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেইমত ব্রাহ্মণ প্রতি বছরই ঐদিনে পম্পা নদীতে সুসজ্জিত নৌকা যোগে দেবতার জন্য ভোগ পাঠাতেন। এক বছর দেব ভোগে ডাকাত পড়ল। নৌকার নায়াররা অদ্ভুত বারত্বের সঙ্গে ডাকাতদের পরাস্ত করে সেই ভোগ নিয়ে গেল দেব মন্দিরে। পরবৎসর থেকে দেবতার ভোগ যেতে লাগল বহু সুসজ্জিত নৌকার পাহারাধীনে।

মোটামুটি গল্পটা এইটুকুই। এবং এই গল্পের মধ্যেই নিহিত রয়েছে বঞ্চিকল্লির ইতিহাস।

গল্পটা থেকে এইটুকু বোঝা যাচ্ছে যে ওনম পর্বটাকে দানবরাজ বলীর প্রজারা তো বটেই কিছু দিনের মধ্যে নাম্বুদিরীরাও উৎসবরূপে পালন করতে সুরু করেছিলেন উৎসবটা বৈদিক না হওয়া সত্ত্বেও। অবস্থা যখন এমন যে কোন নাম্বুদিরী ব্রাহ্মণের বিশেষ নিমন্ত্রণও ঐ বিশেষ দিনটিতে কোন ব্রাহ্মণসন্তান রক্ষা করতে রাজী নয় তখনই আবার এক অবতার এসে হাজির! হাজির তাঁকে হতেই হয় কারণ যে, বলীরাজার প্রভাব খর্ব করার জন্য এত কিছু করা হল সেই বলীরাজার স্তাবক নাম্বুদিরীদের অন্দরমহলেও যখন ঢুকে গেছে তখন বেদব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব তো 'ইন ডেঞ্জার!' সুতরাং সাধারণ মানুষের বিশেষ করে নাম্বুদিরী এবং নায়ারদের মন দাও অন্য দিকে ঘুরিয়ে।

শুনতে আশ্চর্য লাগলেও ভাবতে ব্যথা পেলেও একথা খুবই সত্যি আজকের মত সেদিনকার কেরলেও ওনমের দিনেও বহু মানুষকে অন্নাভাবে বুভুক্ষু থাকতে হত নিশ্চয়ই। তা না হলে যেদিন মানুষ পরের ঘরে নিমন্ত্রণ খায় না, ভিটেমাটি বিক্রী করে হলেও পেট ভরে খায় সেদিন দেবভোগ্য খাদ্য দ্রব্য লুঠ করতে যারা এসেছিল তাদের ডাকাত বলে চিহ্নিত করলেও তারা যে মুলতঃ ভোজ্যবস্তুই কেড়ে নিতে ভোগের (অথবা ভোগীর?) নৌকা আক্রমণ করেছিল এ বিষয়ে

কোন ভুল নেই। তারা খাবার চেয়েছিল, তা সে যে ভাবেই হোক!

এরপর আসছে নৌকার নায়ারদের বীরত্বের সঙ্গে ডাকতদের হারিয়ে দিয়ে নৌকা নিয়ে মন্দিরের ঘাটে পৌঁছাবার কথা।

নৌকায় যাচ্ছে দেবতার ভোগ। দু-পাঁচজন নায়ার দাঁড়িমাঝি অবশ্যই নৌকায় ছিল এবং নায়াররা যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শীও ছিল বটে। কিন্তু ডাকাতরা এতসব জেনেও কী শুধুহাতে নৌকা আক্রমণ করে দেবতার ভোগ লুঠ করতে আসবার মত নির্বোধ ছিল? নিশ্চয়ই নয়। তারাও নিশ্চয়ই তখনকার প্রচলিত তীর ধনুক, ভল্ল, পরশু প্রভৃতি অস্ত্রে সজ্জিত হয়েই এসেছিল। তাহলে নিশ্চয় নায়ারদেরও তাদের সঙ্গে ক্ষেপণাস্ত্রের লড়াই-ই লড়তে হয়েছিল কারণ হাতের দাঁড় দিয়ে লেঠেল ঠ্যাকানো যায় তীরন্দাজ ঠ্যাকানো যায় না। নায়াররা তখনকার সাধারণ প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত না হলেও সজ্জিত ছিল এটুকু বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়। এখন কথা ওঠে, দেবতার ভোগ নিয়ে তো মন্দিরে পূজা দিতে যচ্ছিলে বাপু, তবে সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র কেন? উত্তর হবে, তখনকার রেওয়াজ। আমাদের প্রশ্নটাও তো তাই—এই বিদঘুটে রেওয়াজ যখন যেখানেই আছে বা ছিল দেখা গেছে আত্মরাক্ষাটা সেখানকার প্রথম সমস্যা। সর্বকালেই আত্মরক্ষার সমস্যা তখনই দেখা দেয় যখন সেই 'আত্মা'টি অপরের আত্মার পক্ষে বিপজ্জনক। তদানীন্তন পম্পা নদীতে এই 'অপর' নিশ্চয়ই ওই ডাকাতরা। এবং যে সে ডাকাত নয় ইড্‌লী, দোশা, অপ্পম, বড়া, খিচড়ী, পচ্চড়ী, পাল্পায়সম, প্রথমন্‌, কুনকুট্টু, আবিয়ল প্রভৃতি মেড ইন্‌ রান্নাঘর মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী লুণ্ঠনকারী এবং তাও আবার দেব ভোগের উদ্দেশে নিবেদিত!

আজকের বাংলা কেরল বিহার উড়িষ্যা—ভারত-পাকিস্তানের সুবিস্তীর্ণ ভূভাগের যেদিকেই তাকাই সেদিকেই দেখি এই 'দেবভোগ' লুণ্ঠনের প্রবৃত্তিই যেন বেড়ে যাচ্ছে! এর মূলে রয়েছে সেই আদিম বদ-অভ্যাস। খাওয়া! উদর ঘটিত ব্যাপারটার উল্লেখে সূক্ষ্মরুচিতে

যাধে জানি কিন্তু পৃথিবীর জনসংখ্যার এক মোটা অংশ জানে ঐটুকুই তাদের জীবনের মোক্ষ। ঐ মোক্ষটির অভাবেই দেহ সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়ে বিলীন হয় পঞ্চভূতে!

আর সেই মোক্ষলাভের লড়াই থেকেই উদ্ভব কেরলের বঞ্চিকলি।

থাক প্রাচীন কথার কচকচি। কী হবে আর ওসব ঘেঁটে! দেশে যখন গোলায় ভরা ধান, পুকুরে ভরা মাছ, গোয়ালে ভরা দুগ্ধবতী গাই তখনও দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠর জন্য ঋষি গৌতমের প্রেসক্রিপশন, 'জীর্ণান্যুপানচ্ছত্রবাসাঃ—কূর্চ্চান্যুচ্ছিষ্টাশনং'—ছেঁড়া জুতো, ছেঁড়া ছাতা, ছেঁড়া কাপড়, ছেঁড়া মাদুর আর উচ্ছিষ্ট অন্ন! এখন তো ব্যাপারটা আরো একটু এগিয়ে গেছে। কেরলে তো বটেই, সারা ভারতেই গড়ের মাঠের গরু, ঘাস, কাঁচাকলা সবাই দাবী করছে 'স্ট্যাপ্‌ল্ ফুড' এর পদ!

বঞ্চিকল্লি আজ কেরলের লোক উৎসব, গণউৎসব, জাতীয় উৎসব। ওনমের দিনই পড়ে এই নৌ-বাইচের দিন। পম্পা নদীর দুধারের নারিকেল বীথি, আখের ক্ষেতের সবুজ-স্বপ্নের মাঝে মাঝে বিধাতার স্নেহচুম্বনের মত গ্রাম। কত তাদের নাম, কত তাদের ধর্ম। কিন্তু এই একটি দিনে সবই একাকার। হয়ত পর পর অনেকগুলো গ্রাম খুঁজলে হিন্দু পাওয়া যাবে না একটাও তবু প্রত্যেকটি গ্রামই ওনমের অনেক আগে থেকে প্রতীক্ষা করে এই দিনটির, তৈরী হয় এই দিনটির জন্য। বিশেষ একধরণের কালো কাঠ দিয়ে তৈরী হয় নৌবাইচের নাগাকৃতি ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাত লম্বা নৌকাগুলি। দক্ষিণ কেরলের এই বিশেষ জলক্রীড়ার জন্য তৈরী হয় ঐ অঞ্চলের প্রতিটি গ্রাম থেকে একখানা করে নৌকা। ওনমের অনেক আগে থেকেই দেখা যায় সারা গ্রামের মানুষের নৌকাটিকে সুসজ্জিত করার, প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করার প্রয়াস। নৌকা চিত্রিত করা হয় বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন ধরণের জন্তুজানোয়ার পাখী প্রভৃতির ছবি এঁকে। নৌকার তলায় লাগান হয় মাছের তেল দিনের পর দিন—যেন সেটা জলের উপর দিয়ে জল চেরার কষ্ট না পায়, জলের ওপর দিয়ে পিছলে

চলে যায় সবার আগে। ওনমে দিন ভোর থেকেই পম্পা নদীর দুই তীরে সাড়া পড়ে যায়। দূর দূর থেকে কত ধরনের, কত রকমের নৌকা আসে প্রতিযোগিতা দেখতে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে।

পম্পানদীর দুই তীরে ছাতার মেলা বসে যায় যেন। সবাই চেষ্টা করে নদীর ঠিক কিনারাটিতে আগে থেকেই স্থান সংগ্রহ করতে। তা না হলে দেখতে অসুবিধা হবে যে।

আরন্মুলার মন্দিরে পূজা নিয়ে যায় সর্পনৌকাগুলো। সেগুলোর ওপর টাঙ্গান হয় ছত্র। দূর থেকে ছত্র দেখেই চেনা যায় যে দেবতার ভোগ চেলেছে ঐ নৌকায়। সুসজ্জিত মানুষের ঠাসাঠাসি ভিড় সব নৌকায়ই। উৎসব আনন্দে মাতোয়ারা মানুষের মনের মত পম্পাও উদ্বেল।

মন্দিরের পূজাপাঠ চুকে যাওয়ার পর প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ কারী নৌকাগুলোর ওপরকার ছত্র খুলো ফেলা হয়, ভারবোঝা নামিয়ে নৌকা হালকা করা হয়। বাড়তি লোকও নেমে যায়।

খান চার পাঁচ নৌকা এক একবারে এক সঙ্গে ছোটে। বিভিন্ন দলের বিজয়ীদের মধ্যে সবশেষে শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপনের দৌড় হয়।

এই নৌবাইচ নিছকই নৌকাদৌড় নয়। এই উপলক্ষ্যে গীত হওয়ার জন্য অনেক গান আছে। বলা বাহুল্য গানের ছন্দ জলে দাঁড় ফেলা এবং টানার ছন্দে রচিত। মূল গায়েন দাঁড়ায় নৌকার মাঝখানে। দোহার দেয় যারা তারা থাকে বসে। নৌকাগুলোর খোল বেশ গভীর। বাংলার ছিপ নৌকার চেয়েও সরু তাদের প্রস্থ। কোন রকমে দুজন দাঁড়ী পাশাপাশি বসে দাঁড় টানতে পারে।

দৌড়টা হয় মাইল দুয়েকের। স্রোতের উজানে।

উৎসবের সাজ পোষাক খুলে ফেলে মালকোঁচা আঁটে দাঁড়ী মাঝিরা। মাথায় জড়িয়ে নেয় কাঁধের তোর্তু (গামছা বা তোয়ালে) খানা। সার বেঁধে নৌকার দুদিকে দাঁড় উঁচিয়ে বসে যায়। যাত্রা-

সংকেত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জলের উপর দিয়ে পিছলে চলতে থাকে নৌকাগুলো। গানের তালে তালে পড়ে দাঁড় আর দাঁড়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দাঁড়িদের 'হেই হো' 'হেই হো' শব্দে পম্পার উজান স্রোত খল খল করে হাসে। গানের লয় নির্ধারণ করে দাঁড় পড়ার লয়। যখন পিছনকার নৌকার মুখ ফণা উঁচিয়ে এগিয়ে আসে তখন মুল গায়েন যেন পাগল হয়ে যায়, সব শক্তিটুকু ঢেলে দিয়ে গানের লয় দ্রুততর করতে চায়, দাঁড়ও পড়ে সেই লয়ের সমতালে।

কলকাতার মাঠে চুনী গোস্বামী বল টেনে নিয়ে গিয়ে শূন্য গোলে সেটা ঢুকিয়ে দেওয়ার উত্তেজনাকর মুহূর্তে যেমন অনেক দর্শকের পক্ষেই সামনের দর্শকের মাথাটাকেই বল কল্পনা করা অতি স্বাভাবিক ঘটনা পম্পা নদীর তীরেও নৌবাইচের চরম উত্তেজনাক্ষণে তেমন অনেক কিছুই ঘটে যায়। প্রকৃত রসজ্ঞ দর্শক এবং ফ্যানরা সর্বদেশে সর্বকালেই ক্রীড়ার সঙ্গে একাত্ম। গানের ক্ষেত্রে যেমন—

'একাকী গায়কের নহে তো গান, মিলিতে হবে দুইজনে,
গাহিবে একজন খুলিয়া গলা, আরেকজন গাবে মনে।'

যে কোনও জনপ্রিয় ক্রীড়ার ক্ষেত্রেও ঐ একই ব্যাপার। দর্শক আর খেলোয়াড় যেখানে একাত্ম হতে পারে না সেখানেই খেলারও সুর কাটে, তালভঙ্গ হয়।

নদীমাতৃক দেশ কেরল। সাগর দুহিতা কেরল।

তার একদিকে সাগর এসে তটভূমিকে চুম্বনে চুম্বনে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে, অপরদিকে নদীগুলির খিলখিল হাসি, শ্যামল ভূমিতে দোয়েল শ্যামার গান বুলবুলির শীষ। তারই মাঝে এগিয়ে চলেছে কেরলের জনজীবন অগ্রগতির পথে 'সর্পনৌকা' নৌকাগুলির মতই লক্ষ্য স্থির রেখে, ছন্দ অটুট রেখে, বিদ্যুৎ গতিতে!

এই গতি তাকে দিয়েছে ভারতের গণ জীবনকে লক্ষ্যে পৌঁছে দেবার কর্ণ ধরের অধিকার।

বিচিত্র রাজ্য কেরল!

বিচিত্র তার জীবন, বিচিত্র তার জীবনযাত্রা! আর তাই তার সমস্যাবলীও বৈচিত্র্যে ভরা। বিভিন্ন বৈচিত্র্যের মাঝেই তার বৈশিষ্ট্যের পরিচয়। এই বিশিষ্টতার ধারা বেয়েই বিকশিত হয়ে চলেছে তার সাধনা।

দক্ষিণ ভারতের ক্ষমতাশালী তিন প্রাচীন সাম্রাজ্য চের, চোল আর পাণ্ড্য। কেরল ছিল চের-সম্রাটদের শাসনাধীন। এই চের সম্রাটদের বংশধর বলে দাবী করতেন ত্রিবাংকুর আর কোচিনের মহারাজারা.

ভাস্কো-ড্য-গামা যখন কালিকটে আসেন তখন সেখানে আরব ব্যবসায়ীদের প্রভুত্ব। প্রকৃতপক্ষে এইসব বিদেশী বণিকই কেরলের সব কয়টি রাজ্যের উপর আপনাদের প্রভুত্ব খাটাতে পারতেন। কারণ দেশের উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার ছিল সম্পূর্ণরূপে বাহির্বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল। আর এই বহির্বাণিজ্যের চাবীকাঠি ছিল মূলতঃ আরবী এবং ইহুদী বণিকদের হাতে।

কালিকট থেকে বিতাড়িত পর্তুগীজ পরবর্তিকালে কোচিন, কুইলন, কান্নানোর প্রভৃতি বন্দরের পথে কেরলে প্রবেশ করে এবং কালে গোয়া থেকে কুইলন পর্যন্ত সমগ্র পশ্চিম উপকূলে আপন প্রভুত্ব বিস্তারে সক্ষম হয়।

পর্তুগীজ এবং আরব বণিকদের বাজারের জন্য প্রতিযোগিতা কালিকট এবং কোচিনের রাজাদের ১৪৯৮ খৃঃ অব্দ থেকে ১৬৬৩ খৃঃ অব্দের মধ্যে পাঁচটি প্রভূত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত করে। কালিকটের সামোতিরিয়া দক্ষিণ মালাবারের সামন্তদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তাঁরা চাইছিলেন কোচিনের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে।

১৪৯৮ খৃঃ অব্দে ভাস্কো-ড্য-গামা যখন কালিকটে এসে অবতরণ করেন তখনকার ঘটনার পর্যালোচনা আমরা আগেই করেছি। আরব বণিকরা ইতিপূর্বেই কালিকটে জেঁকে বসেছিল। শুধু তাই

নয় সমাজে তাদের প্রতিপত্তি ছিল বর্ণহিন্দুদের মতই। রাজ-দরবারে তাদের জন্যে ছিল সম্মানের আসন। আরব এবং ইহুদী অভিজাতরা বাজারে সম্ভাব্য নতুন অংশীদারের আবির্ভাবকে মোটেই ভাল চোখে দেখে নি। আবার দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় ক্লান্ত ইয়োরোপের বহুদিনের স্বপ্নের কুবেরভূমি ভারত আবিষ্কারে মাত্রাহীন উৎফুল্ল ভাস্কো-ডা-গামা ইয়োরোপের এককালের ত্রাস আরবদের কালিকটে অখণ্ড প্রতাপ দেখে খানিকটা মাত্রাজ্ঞানহীনের পরিচয় দিয়ে ফেলেছিলেন! ফলে সে যাত্রায় কালিকটে তাঁদের আর বাণিজ্য ঘাঁটি গাড়া সম্ভব হয় নি! পরে তারা গিয়ে কোচিনের মহারাজের সহায়তায় কোচিন এবং কুইলন বন্দরে ব্যবসা স্থুরু করে। কালিকটের সামোতিরী কেরলের একচ্ছত্র আধিপত্য লাভের, কোচিনের মহারাজাদের কালিকটের আনুগত্যে আনবার চেষ্টা করছিলেন। কালিকটের এই চাপ প্রতিহত করার জন্য কোচিনের মহারাজা পর্তুগীজ শক্তির সাহায্য লাভের স্বার্থেই তাদের আশ্রয় দেয়। কালিকট এবং কোচিনের নৃপতিদের সংগ্রামকে কেন্দ্র করে পর্তুগীজ এবং আরব ইহুদী বণিকদের বাজারের লড়াই তীব্র হয়ে ওঠে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত গোয়া থেকে কুইলন পর্যন্ত উপকূলভাগে ওলন্দাজদের আগমনকাল পর্যন্ত পর্তুগীজ একাধিপত্য বজায় থাকে।

কেরলে সাধারণ হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টানদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি পাশ্চাত্য বণিকদের আগমনের আগে পর্যন্তও ছিল অটুট। পর্তুগীজদের আগমনকে কেন্দ্র করে সেই সম্পর্কে চিড় খায়। খৃষ্টানদের মধ্যেও ঘরোয়ানার লড়াইএর সূত্রপাত ঘটে।

হিন্দুদের মধ্যেও বর্ণহিন্দু এবং অন্ত্যজদের মাঝে দূরত্ব আরো বেড়ে যেতে থাকে। অবশ্য এই দূরত্ব-বৃদ্ধির জন্য প্রত্যক্ষ কোন বিদেশী শক্তিই দায়ী নয়। দায়ী ইতিহাসের ধারা। চতুর্বর্ণ সমাজের সূত্র ধরেই এই বিভেদ। ক্রমে এই বিভেদ সুস্পষ্টভাবে সমাজকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে ফেলে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের

আলাদা করে চেনা যায় না। এই ত্রয়ীর মিলিত স্বার্থই শূদ্র বা দাসদের উপর প্রভুত্ব এবং শোষণ চালাতে থাকে। দাসেদের শ্রমের স্বত্বভোগ ছাড়াও তাদের ঘৃণা করা এবং তাদের সঙ্গে মনুষ্যেতর জীবের অনুরূপ ব্যবহার করা চলতে থাকে। কেরালায় এই জাতিভেদ প্রথা এতই জটিল ছিল যে কোন জাতি থেকে ব্রাহ্মণ বা নায়াররা কহাত দূরে থাকবেন তারও সুনির্দ্দিস্ট নিয়ম ছিল। এমন কী কোন কোন জাতির মানুষের দর্শন মাত্রেই উচ্চবর্ণের জীবেরা অশুচি হয়ে যেতেন।

অস্পৃশ্যরা স্বাভাবিকভাবেই সারাভারতে জাতীয় চেতনা বিকাশের সাথে সাথেই সংঘবদ্ধ হয়ে এই অবমাননাকর অবস্থার অবসান ঘটাবার জন্য এগিয়ে আসেন। গান্ধীজির নেতৃত্বে হরিজন আন্দোলন দানা বাঁধে। এই অন্দোলনের সুরু প্রত্যক্ষত স্বামী বিবেকানন্দের আমল থেকেই। অস্পৃশ্যদের আন্দোলন ক্রমে এমনই ব্যাপক আকার ধারণ করে এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরে এমনই প্রভাব বিস্তার করে যে ত্রিবাংকুরের মহারাজাও নিজে এই আন্দোলনে সামিল হন। ফলে ৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ত্রিবাংকুরে অস্পৃদের মন্দির প্রবেশ অধিকারের সংগ্রাম জয়ী হয়। গুরুবায়ুরমন্দির অভিযান তো স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি বিশেষ অধ্যায়।

যে সংগ্রাম সেদিন সুরু হয়েছিল আজও তার অবসান হয়নি। আজকের সংগ্রাম মন্দির প্রবেশ অধিকারের সংগ্রাম নয়। আজকের মানুষের সংগ্রাম মানুষের মত বাঁচবার অধিকারের সংগ্রাম।

কেরলের নব পর্যায়ের যাত্রা সুরু ১৯৫৬ খৃঃ অব্দের ১লা নবেম্বর থেকে। দেশীয় রাজ্য ত্রিবাংকুর-কোচিনের কোচিন রাজ্যের সমগ্র অংশ, ত্রিবাংকুরের অধিকাংশ, মালাবার জেলা এবং দক্ষিণ কন্নড়ের কাষাড়কোড় তালুক নিয়ে বর্তমান কেরল রাজ্যটি সংগঠিত হয়।

নাগারাজ্য সংগঠিত হওয়ার আগে পর্যন্তও কেরল ছিল আয়তনের

দিক থেকে ভারতের ক্ষুদ্রতম রাজ্য। অবশ্য এই হিসাবের মধ্যে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সমূহকে ধরা হচ্ছে না। যদিও কেন্দ্রশাসিত নেফা কেরলের চেয়ে আয়তনে প্রায় পাঁচগুণ বড়।

ঘনত্ব বিচারে কেরলের জনসংখ্যার স্থান কেন্দ্রশাসিত প্রায় সহরসর্বস্ব দিল্লীর ঠিক পরই। সেই হিসাবে কেরল পৃথিবীর সবচেয়ে ঘন বসতিপূর্ণ অঞ্চল। এখানকার লোকসংখ্যা ১৯৬১র আদমসুমারীর হিসাবে প্রতি বর্গমাইলে ১১২৭ জন। প্রতি আঠারো জন লোকে একজন কৃষি শ্রমিক। নারী কৃষিশ্রমিকও প্রতি আঠারো জন নারীতে একজন। আর প্রায় প্রতি ১১জন নারীর মধ্যে একজন প্রত্যক্ষ ভাবে কৃষিকাজ করে থাকে।

ভারতের সবচেয়ে দরিদ্র রাজ্য এই কেরল। এই দারিদ্রের মূল কারণ অন্তর্নিহিত তার কৃষিব্যবস্থা এবং শিল্পের প্রসারহীনতার উপর। কেরলের কৃষিযোগ্য জমির ৬৫·৪ শতাংশ ব্যবহৃত হয় অর্থকরী ফসল উৎপাদনের কাজে। চা, কফি, গোলমরিচ প্রভৃতি উৎপন্ন দ্রব্যকে ভোগ্য দ্রব্যে রূপান্তরিত করার জন্য বিশেষ কারীগরী ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হয় না বলে অর্থকরী ফসলকে শিল্পজাত দ্রব্যে রূপান্তরিত করার মত কলকারখানা গড়ে ওঠারও প্রয়োজন হয়নি। শিল্পক্ষেত্র না থাকায় সম্ভাব্য শিল্প শ্রমিকরা ভিড় করে কৃষিক্ষেতের চারিপাশে কাজের প্রত্যাশায়। অর্থকরী ফসল যা উৎপন্ন হয় সে সব কৃষিক্ষেত্রের মালিকানা ভূস্বামী বা বড় কৃষকদের। আর ঐ সব অর্থকরী ফসলের অধিকাংশই চালান যায় বিদেশে। ঐ সব অর্থকরী ফসল এবং অন্যান্য দ্রব্য দেশের বাইরে রপ্তানী করে কেরল ভারতের জন্য অর্জন করে বাৎসরিক একশো কোটি টাকা মূল্যের মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা। ভারতকে সে যে পরিমাণ মুদ্রা জোগান দেয় তা নিঃসন্দেহে বিরাট অংকের। কারণ কেরলের আয়তন ভারতের মোট আয়তনের ১·২৭ শতাংশ আর জনসংখ্যা ৩·৩৫ শতাংশ। ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের গুরুত্বের এই বিরাট অংশ বহন

করতে হয় বলেই সে মূল খাদ্যশস্য ধানের চাষ করবার জন্য কৃষিযোগ্য জমির মাত্র ৩২.৮ শতাংশ ব্যবহার করতে পারে। তাও সেই শ্রীরামচন্দ্র প্রবর্তিত কৃষিপদ্ধতির মাধ্যমে। ফলে কেরলের জন্য খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের নির্দেশ সহ মাথাপিছু ৪ আউন্স চালের বরাদ্দ হয়। খাদ্যশস্যে অন্যান্য ঘাটতি রাজ্যে যেখানে প্রয়োজনের ৫ থেকে ১০ শতাংশের টানাটানি কেরলের অনটন শতকরা ৫০ ভাগ। টাপিওকার কন্দ সিদ্ধ ভক্ষণ কেরলের খেটে খাওয়া মানুষের দিল্লী নির্ধারিত ভাগ্যলিপি! কেরলের অধিকাংশ মানুষই দিনমজুর, কৃষিশ্রমিক, ভাগচাষী, গরীবচাষী, নিম্ন মধ্যবিত্ত বা ধীবর। চাল তাদের অধিকাংশেরই ধরাছোঁয়ার নাগালের বাইরে!

বৃটিশ শাসনকালে বৃটিশ শাসিত কেরলে বা দেশীয় রাজাদের অধীনস্থ অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে যে মনোভাব গড়ে ওঠে তা কতকগুলি পর্যায়ে বিভক্ত হয়। নায়ার, ঈষওয়র এবং অচ্ছ্যুৎরা আপনাপন সাম্প্রদায়িক সংগঠন গড়ে তোলে। নিম্ন বর্ণের মানুষরা সংগঠিত হয় উচ্চবর্ণের মানুষদের শোষণ এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে। অবশ্য কালে নাম্বুদিরী ব্রাহ্মণদের একাংশ, যারা যুগের হাওয়ার গতি চিনতে পেরেছিল তারা যোগক্ষেম সভার প্রতিষ্ঠা করে সমাজের জাতিগত ভেদাভেদ, কুসংস্কার প্রভৃতির বিলোপ ঘটাতে। এই সব সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানই পরবর্তিকালে একযোগে বৈদেশিক শাসন মুক্ত হওয়ার সংগ্রামে সামিল হয়। সামিল হয় মন্দির প্রবেশ অধিকার, জমিদারী প্রথার বিলোপ প্রভৃতির সর্বভারতীয় সংগ্রামের শরীকদার রূপে।

কেরলে হাজার প্রতি শিক্ষিত পুরুষের সংখ্যা ৫৫০। এর পরই স্থান মাদ্রাজের—হাজারে ৪৪৫। পশ্চিমবঙ্গের ৪০১। আর ভারতের সবচেয়ে বড় এবং অধিক জনসংখ্যা সমন্বিত উত্তর প্রদেশে ঐ সংখ্যা ২৭৩।

শিক্ষিতা স্ত্রীলোকের হার কেরলে প্রতি হাজারে ৩৮৯ দ্বিতীয় স্থান মাদ্রাজের -১৮২। পশ্চিম বঙ্গের ১৭০। আর ভারতের প্রথম

মহিলা প্রধান মন্ত্রীসহ ভারতের সব কয়জন প্রধান মন্ত্রী উপহার দিয়েছে যে উত্তর প্রদেশ, সেই উত্তর প্রদেশ ভারতের রাজধানীকে কোলে এবং রাষ্ট্রনীতিকে বগল দাবায় করে বসে আছে সেখানে এই সংখ্যা ৭০। সংখ্যাটাকে দেখলে মুদ্রাকর বিভ্রাট বলে মনে হলেও আসলে এটাই ১৯৬১ সালের আদমসুমারীর তথ্য।

কেরলে দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা ৪৬টি। প্রেস রেজিষ্ট্রারের ১৯৬৬ সালের হিসাবে দেখা যায় ভারতে মালয়ালম ভাষায় প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকাসমূহের প্রচার সংখ্যা ৭০৮০০০। বাংলা ভাষায় ঐ সংখ্যা ৪৯৬০০০। মালয়ালম দৈনিকের সংখ্যা বিয়াল্লিশটি, বাংলায় তেরো। কেরলে প্রতি হাজারে শিক্ষিত ৪৬৮। পশ্চিম বঙ্গে ২৯৩। কেরলের জনসংখ্যা ১৬,৯০৩,৭১৫। পশ্চিমবঙ্গের ৩৪,৯২৬,২৭৯।

কোন দরিদ্র এবং শিক্ষিত সমাজ শোষণ এবং নিপীড়নকে ভাগ্যলিপি বলে মেনে নিতে পারে না। বিশেষ ভাবে যে সমাজের রয়েছে হাজার হাজার বছরের সুস্থ এবং শোষণহীন সমাজের জন্য সংগ্রাম ও বিজয়ের ঐতিহ্য। কেরলের জনগণের সংগ্রামের চরিত্র আজ সৃষ্টি হয় নি। বিপ্লবও আজকের কেরলের কাছে কোন নতুন কথা নয়। এই বিপ্লব সুরু হয়েছিল কেরলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে। সে বিপ্লব ছিল শিক্ষা বিপ্লব। আর এই শিক্ষা বিপ্লবের নেতৃত্বের সম্মান নিঃসন্দেহে তদানীন্তন রোমান ক্যাথলিক গীর্জা সমূহের। একদিনের বিপ্লবী শক্তি পরবর্তিকালে যে চরম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিতে পরিণত হতে পারে তা কেরলে দেখা গেছে ১৯৫৭ সালের শিক্ষাবিলকে উপলক্ষ্য করে। ১৯৫৯ সালে যখন কেরলে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হয় তখন কেরলের বিদ্যায়তন সমূহে শিক্ষার্থীর সংখ্যা পঁয়ত্রিশ লক্ষ। জনবসতি পূর্ণ অঞ্চলের প্রতি বর্গমাইলে ছিল একটি করে স্কুল। মোট স্কুলের সংখ্যা ছিল দশ হাজার। তার মধ্যে এক হাজারটাই হাইস্কুল। প্রতি বছরে এস, এস, এল, সি (সেকণ্ডারী স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট) পাশ করত আশী হাজার ছাত্র

ছাত্রী। গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা বৃদ্ধি হত বছরে সাত থেকে আট হাজার। দশ হাজার স্কুলের মধ্যে চার হাজারটিই ছিল সরকারী আর বাকী স্কুল-গুলির মধ্যে সাড়ে চার হাজার ছিল খৃষ্টীয় সংস্থাগুলির পরিচালনাধীন।

প্রাক স্বাধীনতা যুগের ধর্মীয়, সামাজিক এবং রাজনীতিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে কেরলে অর্থনৈতিক অবস্থার আশার অনুকূল পরিবর্তন ঘটেনি। আর্থিক অবস্থার উন্নতির কথা দূরে থাক স্বাধীনতোত্তর যুগের অর্থনৈতিক অবনতিই কেরলকে আজ অবশ্যম্ভাবীর প্রাসাদের মহলের পর মহল পার করে নিয়ে চলেছে দ্রুতগতিতে। অনাহারক্লিষ্ট শিক্ষিত শ্রমিক এবং কৃষক বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হচ্ছে বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত বেকার স্ত্রী পুরুষের বিক্ষোভ। কেরলের রন্ধনশালাও আজ রাজনৈতিক আলোচনার গুঞ্জনে মুখর। গ্রামে গ্রামে নতুন নতুন কথাকল্লির গান, নিজেদের দুঃখ দুর্দশা, সংগ্রাম এবং বিজয়ের বার্তা সেই সব নৃত্যনাট্যের উপজীব্য। এই সব ঐতিহ্যসমৃদ্ধ নৃত্যনাট্য ও গীতিকলার সঙ্গে আধুনিক নাটকও দখল করেছে কেরলের জনচিত্ত। আলোড়ন তুলেছে গণমানষে। মালয়ালম ভাষার বিখ্যাত নাট্যকার তোপিল পাশী যখন তাঁর নাটক 'তুমি আমায় কম্যুনিস্ট করেছ' নিয়ে কেরলের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত গ্রামে গ্রামে অভিনয় দেখিয়ে বেড়ান বিপুল জন সমাবেশ হয় সেই সব অভিনয়ে। কেরলের জনগণ নাট্যবর্ণিত চরিত্রাবলীর মাঝে নিজেদের খুঁজে পান।

কেরলের এই গণজাগরণে নারীর স্থান নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। শিশুর জীবনের সব কিছুরই হাতে খড়ি হয় মায়ের কোলে। তাছাড়া শিক্ষিত পুরুষের পাশে অশিক্ষিতা নারী সমাজের অগ্রগতির পথে নিঃসন্দেহে জগদ্দল পাথর। শিক্ষা সংকোচনের সব রকমের ব্যবস্থাকে পায়ে দলে এগিয়ে চলেছে কেরলের জনগণ। এবং এই মালয়ালম জনগণের অধিকাংশই নারী। কেরলে প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা ১০২২। পশ্চিমবঙ্গে ৮৭৮।

ভারতের দুই 'সমস্যা সংকুল রাজ্য'—বাংলা এবং কেরল।

পৃথিবীতে যেখানেই কোন অত্যাচার, কোন উৎপীড়ন তারই প্রতিবাদে সোচ্চার কেরল, সোচ্চার বাংলা। এই দুই দুর্বিনীত কখন যে সাজানো বাগানের প্রাচীরের বেড়ায় আগুন লাগিয়ে দেয় সেই ভয়ে পরস্বাপহারীদের রাতের নিদ্রা দিনের বিশ্রাম দুঃস্বপ্নে ভরা। কারণ এই দুই অগ্নিহোত্রী যে পবিত্র আগুন জ্বালাতে ব্যস্ত তা তো তাদের ঘরের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে বেঁধে রাখবে না, ছড়িয়ে দেবে তামাম ভারতের ঘরে ঘরে, সারা বিশ্বের শোষিত নিপীড়িত প্রতিটি মানুষের আঙ্গিনায়।

বাংলা এবং বাঙ্গালীর সঙ্গে কেরলের অশনে বসনে, সাহিত্যে, ইতিহাসে, সংস্কৃতিতে যে মিল রয়েছে, যে মিল রয়েছে উভয়ের প্রজ্ঞা এবং মননে তারই আলোকে বোঝা যায় ভারতের দুই প্রান্তে থেকেও তারা কত কাছাকাছি। এই দুই অঞ্চলই নূতনকে বরণ করেছে সবার আগে। তারপর সেই নূতনকেই আপন সংস্কৃতির জারকরসে জারিত করে আপনার করে নিয়েছে যুগে যুগে।

সর্বকালে সর্বক্ষেত্রে বিপ্লবই বাংলা এবং কেরলের ধমনীশোণিতের উত্তাপ।

কেরলের চা কফি রবার বাগিচায়, বন্দরে, মাঠে, মন্দিরের গোপুরে, ভবিষ্যতের অঙ্গনে যে আকাশ প্রদীপ জ্বলছে বাংলায়ও জ্বলছে সেই একই দীপ ; একই অগ্নিহোত্রী দ্বারা প্রচলিত হয়েছে উভয়েরই যজ্ঞাগ্নি।

ঐ প্রদীপের আলোর দিকে, ঐ যজ্ঞাগ্নির শিখার দিকে পিছন ফিরে থাকলে আকাশ ভরা ধোঁয়ার নীচে নিজের কুৎসিত ছায়াটা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না।

কেরল আর বাংলা ভারতমাতার সৃষ্টি নৃত্যের দুপায়ের নূপুর নিক্কণ। একে অপরের সৌন্দর্য, সাধনা এবং সংগ্রামের শরিকদার।